বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা শহর

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

সেপ্টেম্বর ২০২২

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা শহর

(Socio-economic status of Buddhists: Aspects of Dhaka City)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

রোমানা পাপড়ি

রেজিস্ট্রেশন নং: ১৬৫

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, রোমানা পাপড়ি কর্তৃক উপস্থাপিত **"বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা শহর"** শীর্ষক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি (রেজি. নং : ১৬৫/২০১৫-২০১৬) আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ কোনো প্রকার ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য গবেষক ইতিপূর্বে কোথাও উপস্থাপন করেননি।

(ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি রোমানা পাপড়ি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা শহর"** শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণাকর্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য সকল নিয়মনীতি মেনে আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি, প্রকাশের জন্য কোথাও জমা করিনি এবং এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। গবেষণায় ব্যবহৃত মূখ্য ও গৌণ উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের উৎস সম্পর্কে তথ্যসূত্রে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

(রোমানা পাপড়ি)
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং-১৬৫/২০১৫-২০১৬
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা এবং গুরুজনদের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর অশেষ কৃপায় আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করতে পেরেছি। **"বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা শহর"** শিরোনাম শীর্ষক এম.ফিল গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা আমার কাছে খুব জটিল ছিল, তবুও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা গবেষণাটি সম্পন্ন করেছি। এ দূরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার গবেষণার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়ে সার্বিক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক-নির্দেশনা (তথ্য সংগ্রহ, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, তথ্য বিশ্লেষণে) সুচিন্তিত পরামর্শ, আন্তরিকতা ও স্নেহ দিয়ে এম.ফিল অভিসন্দর্ভ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন। ফলে আমি কাজটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি। তাই তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এরপর পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নীরু বড়ুয়ার কথাও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তিনি আমার গবেষণায় উৎসাহ, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান উপদেশ ও নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। মহৎ কাজটি করতে গিয়ে আমি অনেকের কাছেই ঋণী। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া স্যারের প্রতি তাছাড়াও বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, ড. সুকোমল বড়ুয়া, ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, ড. বেলু রানী বড়ুয়া, ড. শান্টু বড়ুয়া, মো. আশিকুজ্জামান খান কিরন, ড. শামীমা নাছরিন, জ্যোতিস্বী চাকমা ও রত্না রানী দাসের প্রতি। পাশাপাশি আমি আমার সকল শিক্ষক মহোদয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি এবং তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে চাই আমার পিতা প্রয়াত স্কুল শিক্ষক জনাব আমির হোসেন মাস্টার, মা শিরীনা বেগম, আমার একমাত্র ভাই এম. সাখাওয়াত হোসেন, বড় বোন রিফাত রোকসানা, মেঝ বোন ফাহমিদা আক্তার, আমার ভাই তুল্য বোন জামাতাগণ জনাব রুহুল আমিন ও জনাব ইফতেখার হোসাইন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি। তাঁদের কাছে এ গবেষণা কাজের জন্য অশেষ অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ এবং সহযোগিতা পেয়েছি তাই তাদের কাছে আমি চিরঋণী। তাদের সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতি আমাকে আর্থিক বৃত্তি ও অনুদান প্রদান করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করার জন্য। এছাড়াও ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকা সীমা বড়ুয়া, ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ভিক্ষু, বৌদ্ধ সংগঠন ও সংগঠক, বৌদ্ধ বিহার এবং বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী যারা আমাকে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সবার প্রতি।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকায় বৌদ্ধদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রধানদেরকেও এবং ঐসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে। এর সাথে পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার প্রধান ড. মৈত্রী তালুকদার ও অফিস কর্মকতা বিশ্বজিত বড়ুয়া, অঞ্জন বড়ুয়া ও অভি বড়ুয়াকেও অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে সহযোগিতার জন্য।

পরিশেষে, আমার অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনে যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ও যারা অসীম ধৈর্য সহকারে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর ও সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, যে সকল পুস্তক ও জার্নাল, প্রবন্ধ ও নিবন্ধের ওয়েবসাইট সহায়তা নিতে হয়েছে সে সব পুস্তক, জার্নাল প্রবন্ধ ও নিবন্ধের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক ও সত্ত্বাধিকারীদের কাছে এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অভিসন্দর্ভটি নির্ভুলভাবে রচনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, তবে অসাবধানজনিত ভুল ত্রুটি থেকে যেতে পারে। এই অসাবধানজনিত ভুলের জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

রোমানা পাপড়ি
এম.ফিল গবেষক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : ঢাকা শহরে বৌদ্ধ জনবসতির ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় : ঢাকা শহরে বৌদ্ধ জনসংখ্যার ধারণা

তৃতীয় অধ্যায় : ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষা উন্নয়নে ঢাকা শহরের বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায় : ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

প্রস্তাবনাঃ

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল এবং কালক্রমে বিভিন্ন যুগে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, শিক্ষা-সাহিত্য ও বিভিন্ন শিল্পকলার সমৃদ্ধিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড় ও ভাসু বিহার, রাজশাহীর পাহাড়পুর, সোমপুর, হলুদ বিহার, সিতাকোট বিহার, জগদ্দল বিহার, কুমিল্লার ময়নামতি, নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বর, মুন্সিগঞ্জের অতীশ দীপঙ্করের ভিটা ও বিক্রমপুরী মহাবিহার, চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার, চক্রশালা মহাবিহার, রামুর রাংকুট মহাবিহার এবং সাভারের হরিশচন্দ্রের প্রাসাদসহ আরোও অনেক স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বৌদ্ধ বিহার, প্রস্তরফলক, তাম্রফলক, প্রাচীন মূর্তি ও ধ্বাংসাবশেষ ইত্যাদি বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন নিয়ে ইতিহাসবিদ, বৌদ্ধ গবেষক ও পণ্ডিতগণের নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ করে একমতে পৌঁছানো যায় যে, বুদ্ধের জীবদ্দশাতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার শুরু হয়। কথিত আছে, বুদ্ধ বার্মা যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি চট্টগ্রামে যাত্রা বিরতি করেন। এছাড়াও চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের বর্ণনায় জানা যায়, বুদ্ধ পাঁচশত শিষ্য নিয়ে পুণ্ড্রবর্ধনে (বর্তমান উত্তরবঙ্গে) এসেছেন। পরবর্তী সময়ে সম্রাট অশোক এবং পালযুগের (অষ্টম-দ্বাদশ শতক) রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটে।[১]

বর্তমানে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে শ্রেণি ও স্থানগত অবস্থান বিবেচনায় চার ভাগে ভাগ করা যায়।[২] সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধরা কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী এবং কুমিল্লা জেলায় বাস করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বৌদ্ধ-বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়িতে (চাকমা, মগ বা মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম বা বনযুগী, চাক, মুরং, লুসাই, খুমী, কুকি, রিয়াং, পাংখো ও খিয়াংসহ তেরটি জাতিসত্তা)। সমতলীয় রাখাইন বৌদ্ধরা বৃহত্তর চট্টগ্রামের কক্সবাজার, মহেশখালী, রামু, চকরিয়া, টেকনাফ, হারবাং, হ্নীলা, চৌফলদন্ডী, বাজালিয়া, মানিকপুর এবং পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার আমতলী, গলাচিপা, কলাপাড়া। উত্তরবঙ্গের ওঁড়াও ও অন্যান্য ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী বৌদ্ধরা দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়ার চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, সিলেটের হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং গাজীপুর জেলার শ্রীপুর।[৩]

১৯৫০-১৯৬০ সালে রাজধানী ঢাকা কমলাপুরে 'মদন বাবুর বাগিছা' নামক স্থানে তৎকালীন সরকার এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করার জন্য এক খণ্ড জায়গা প্রদান করেন। এরপর ১৯৫২ সালে শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র ২১ জন ছাত্র নিয়ে বজ্রযোগিনী গ্রামে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাস্তুভিটায় পরিদর্শন করেন। ১৯৭২ সালে ঢাকা ধর্মরাজিক বিহারে 'অনাথালয়' স্থাপন করা হয়। ১৯৭২-৭৫ সালে

[১] প্রণব কুমার বড়ুয়া, বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন, (চট্টগ্রাম: ২০০৬) পৃ. ৯৩

[২] জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, আত্মঅন্বেষা ঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় (ঢাকা: ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী) পৃ. ২০৫

[৩] জগন্নাথ বড়ুয়া, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম : অতীত ও বর্তমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০৬, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ) পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

চীন থেকে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দেহভস্ম আনার প্রসঙ্গে শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭৩ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জাতীয় সংসদে *ত্রিপিটক* পাঠের জন্য আহ্বান করেন। ১৯৭৮ সালে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পবিত্র দেহভস্ম সুদূর চীন থেকে ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মরাজিক বিহারে আনা হয়।[৪] ১৯৮৭ সালে ঢাকার রাজারবাগস্থ অস্থায়ী জায়গায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের সূচনা।[৫] এভাবেই ঢাকা শহরে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর গোড়াপত্তন ঘটে। জীবন-জীবিকা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য অনেক বৌদ্ধরা রাজধানী ঢাকায় আসেন। কেউবা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন আবার কেউবা নির্দিষ্ট কয়েকদিন অবস্থান করে নিজের শিকড়ে চলে যান। বিভিন্ন ইতিহাস সূত্র থেকে জানা যায়, খ্রিস্টিয় ৭ম শতক থেকে ঢাকায় লোক বসবাস শুরু করে। এর সাথেই বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ঢাকায় বসবাস শুরু হয়। ঐতিহাসিক সূত্রমতে, ৮-১২ শতকে ঢাকা থেকে ১২ মাইল দূরে বিক্রমপুরে ঢাকার প্রশাসনিক কেন্দ্র ও রাজধানী ছিল। পাল শাসকরা সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করত। উল্লেখ্য যে, পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বাংলার তথা ঢাকার ইতিহাসে বৌদ্ধদের সেটাই নবযুগের সূচনা।[৬] ১৯৫০-১৯৫৯ সালে রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধ বিহারের স্বপ্ন দেখেন শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো। বহু বাঁধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ১৯৬১ সালের ১১ই জুলাই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মহাথেরোকে মোট সাড়ে চার একর জমির কাগজপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। ১৯৬২ সালে ২৩ শে মার্চ থাইল্যান্ডের মহামান্য রাজা আদিত্য ভূমিবল ও মহামান্য রানী সিরিকত ঢাকা শহরের এই জমির উপর স্থাপিত 'ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ও ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।[৭] এরপর ঢাকা শহরের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর হাল ধরেন শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর শিষ্য শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের। এছাড়াও ঢাকা শহর ও ঢাকা জেলায় বৌদ্ধদের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন: বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, ধামরাইয়ে ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার, নদ্দার প্রজ্ঞানন্দ বৌদ্ধ বিহার, মিরপুরে শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার, উত্তরায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার, আশুলিয়াতে বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জে শাসনরক্ষিত ধ্যান কেন্দ্র ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার, গাজীপুরে গাজীপুর কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার, সাভারে সাভার বন বিহার ও বাংলা বাজারে আন্তর্জাতিক শান্তিকুঞ্জ ভাবনা কেন্দ্র । এ বিহারগুলোর বৌদ্ধ ভিক্ষু, কর্মকর্তারা সগৌরবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অক্লান্তভাবে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ঢাকা শহরের অধিকাংশ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মূলত বৌদ্ধ বিহারের আশেপাশে বসবাস করে। যেমন: কমলাপুর, বাসাবো, খিলগাঁও, মায়াকানন, সবুজবাগ, মুগদা, বাড্ডা, মিরপুর, মগবাজার, সাভার, ধামরাই, নারায়ণগঞ্জ, ফার্মগেট, ঢাকা

[৪] সুনীথানন্দ, বাংলাদেশের বৌদ্ধবিহার ও ভিক্ষু জীবন (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী), পৃ. ২৩০ ও ২৩১
[৫] প্রাগুক্ত, প্রণব কুমার বড়ুয়া, বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন, পৃ. ৫২
[৬] মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *আবাহমান বাংলা*, (ঢাকা: ফাল্গুন ১৩৯৯) পৃ. ৪৫
[৭] প্রণব কুমার বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৫, ১৬ ও ১৮

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ফার্মগেট ও গুলশান। এ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উৎসব-সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ফলে দেশ-জাতি উন্নোয়নে তাদের ভূমিকা যথেষ্ট।

বিষয়সূচক শব্দ (Key Word):

ঢাকা শহর, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, ঢাকা শহরের বৌদ্ধ জনবসতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা:

বিশ্বে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা দীর্ঘদিনের হলেও নির্দিষ্ট করে "বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা শহর" -এ সংক্রান্ত কোন গবেষণা এখনো হয়নি। এই শিরোনামে গবেষণা ইতিহাসে নবীনতম। আর এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই গবেষক ঢাকা শহর গবেষণা এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য গবেষণা যা বিষয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মূল বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি* (কলিকাতা: ১৩৮০ বুদ্ধ-পূর্ণিমা) গ্রন্থে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার প্রভাব, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন থেকে বর্তমান , বাংলাদেশের বৌদ্ধবিহার, বাঙালী বৌদ্ধদের পালিভাষা ও বুদ্ধবাণী চর্চা, বাঙালী বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব ও পূজাপার্বণ, বাঙালী বৌদ্ধদের সমাজ-গঠন ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের জীবনযাত্রা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে সমগ্র বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তবে সুনির্দিষ্ট ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের নিয়ে আলোচনা হয়নি। কিন্তু এ গ্রন্থটিতে ঢাকা শহরের বৌদ্ধদেও তথ্য সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা থাকলেও এর মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা কিনা আলোচ্য গবেষণার জন্য পথ নির্দেশক ও তাৎপর্যপূর্ণ। দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম : ২০০৭) গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ভৌগলিক অবস্থা, বুদ্ধযুগে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও রাজন্যবর্গের ইতিহাস, বর্হিবিশ্বে বৌদ্ধধর্ম, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন, ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির কারণ, চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম ও বড়ুয়া সম্প্রদায়, বাংলাদেশে পালি চর্চা ও বাঙালি বৌদ্ধদের সামাজিক, ধর্মীয় উৎসব ও পরিশেষে বাংলাদেশে বৌদ্ধ জনসংখ্যার একটি তালিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ঢাকার বৌদ্ধ সমাজ সম্পর্কে তথ্য উত্থাপন করা না হলেও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষা ঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়* (ঢাকা : ১৯৯৯) গ্রন্থে বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচিতি, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বিকাশ, হর্ষঙ্কবংশ ও মৌর্যবংশ, গুপ্ত যুগ, গুপ্তোত্তর যুগ, পাল যুগ, চন্দ্রবংশ ও দেববংশ যুগ, বর্মণ ও সেনবংশ, সুলতানী শাসন, মোগল ও ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তান ও

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সর্বোপরি বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ না থাকলেও গবেষক এ গ্রন্থ থেকে নানা তথ্য ব্যবহার করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেন। সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর* (ঢাকা : ২০১৭) গ্রন্থে বৌদ্ধ জাতি-গোষ্ঠী : ইতিহাস-ঐতিহ্য, বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও ক্রমবিবর্তন, বৌদ্ধদের শিল্প-বাণিজ্য ও নানা পেশা, ধর্মীয়-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৌদ্ধ পরিকল্পনা ও সুপারিশ, বৌদ্ধ ঐতিহাসিক কালপঞ্জি (১৮০০-২০১৭) ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে সমগ্র বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। গবেষক এ গ্রন্থ থেকে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্যবহার করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। দিলীপ কুমার বড়ুয়া (Dilip Kumar Barua) ও মিতসুরু আন্ডো (Mitsuro Ando) রচিত *Syncretism in Bangladeshi Buddhism* (2002 : Japan) গবেষণাধর্মী বইয়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, বৌদ্ধ রাজা, বৌদ্ধধর্ম পতন, থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধার, বৌদ্ধদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে সুদীর্ঘ গবেষনা করা হয়েছে। সেখানেও সমগ্র বাংলাদেশ নিয়ে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা, জার্নাল, রিপোর্ট ও বই পুস্তকে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের (সমতলীয় বাঙালি বৌদ্ধ, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ন-ৃগোষ্ঠী, সমতলীয় রাখাইন ও উত্তরবঙ্গের ওঁড়াও) জীবনযাত্রা, ধর্মীয় ও সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বিমান চন্দ্র বড়ুয়া রচিত *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা: ২০২০) গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ বসতির পুরাবৃত্ত, ঐতিহাসিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বৌদ্ধ সংঘের স্বরূপ, প্রত্নতাত্ত্বিক বৌদ্ধ ঐতিহ্য, বাংলাদেশে বৌদ্ধ উৎসব, লোক ঐতিহ্য : বৌদ্ধ মেলা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরমধ্যে ঢাকার বৌদ্ধদের নিয়ে বিচ্ছন্ন তথ্য পাওয়া গেলেও এককভাবে এখনো ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের নিয়ে কোনো প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা হয়নি। বাংলাদেশের রাজধানীতে ঢাকা শহরে বসবাসরত বৌদ্ধদের (ইতিহাস, জনসংখ্যা, উৎসব, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা) নিয়ে গবেষণা এটি গবেষকের প্রথম একক প্রচেষ্টা।

গবেষণার পদ্ধতিঃ

গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Method) অনুসরণ করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতিতে আংশিক কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের (Structured Questionnaire) আলোকে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বস্তুগত পরিমাপ পদ্ধতি এবং পর্যবেক্ষণ, গানিতিক বা সংখ্যাগত বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যা সংগৃহীত হয় বিভিন্ন তালিকা, প্রশ্নপত্র এবং জরিপ অথবা বিদ্যমান পরিসংখ্যানিক উপাত্ত বিভিন্ন গণনা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে। পরিমাণগত পদ্ধতিতে বিভিন্ন গানিতিক ডেটা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন দলের মানুষের মতামতকে সাধারণিকরণে অথবা কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ব্যাখ্যা করাকে জোর দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে গবেষণায় গুণগত পদ্ধতির ক্ষেত্রে কে.আই.আই (Key Informant Interview) ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অসংখ্যাসূচক তথ্য যেমনঃ বিভিন্ন পাঠ্য, ফোন কলের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও ধারণাকে আরও গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের নিগূঢ় পর্যালোচনা অথবা নতুন কোনো গবেষণার ধারণা লাভ করা যায়।

পরিমাণগত পদ্ধতিতে গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা শহরে বসবাসরত ১৫০ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গবেষণার সুবিধার জন্য এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি (Purposive Sampling Method) অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে উত্তরদাতার বিশ্বাস অর্জন করা এবং সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। গুণগত পদ্ধতিতে কে.আই.আই এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিমাণগত পদ্ধতিতে গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে সাক্ষাৎকারসমূহ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে অনুসরণকৃত মিশ্র পদ্ধতির বৈধতা ও নির্ভরযোগ্যতা (Validity & Reliability) নিশ্চিত করার জন্য একত্রিকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

গবেষণা হলো সত্য অনুসন্ধানের একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এটা নির্ভর করে গবেষণার বিষয়বস্তু ও প্রকৃতির উপর। যেকোনো কাজের পিছনে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন:

১. বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি, ঢাকা শহর সম্পর্কে জানা, ঢাকা শহরে বৌদ্ধ জনবসতির ইতিহাসকথা, মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা শহরে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের অবদান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকার বৌদ্ধ সমাজ ও বিহারের ভূমিকা কতটুকু তা ধারণা লাভ করা।

২. ঢাকা বিভাগ, ঢাকা জেলা এবং ঢাকা শহরের বৌদ্ধ জনসংখ্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া।

৩. ঢাকা শহরের বৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধদের উৎসব-সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন তাদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার এলাকা:

যেকোন গবেষণার জন্য গবেষণা স্থান নির্বাচন করা জরুরী। এই গবেষণাতেও ঢাকা শহরকে বেছে নেয়া হয়েছে। কারণ ঐতিহাসিকভাবে এবং ঢাকা রাজধানী হওয়ার কারণে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের আগমন, বসবাস ও প্রসারের বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অভিসন্দর্ভের গঠন-পরিকল্পনা:

আলোচ্য বিষয়বস্তু পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত করি। নিম্নে অধ্যায়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো:

প্রথম অধ্যায়: ঢাকা শহরের বৌদ্ধ জনবসতির ইতিহাস মূলত বৌদ্ধদের উৎপত্তিস্থল নেপাল থেকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধদের আগমন বা স্থানীয়দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ঢাকা একটি নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সাপেক্ষে এখানে বৌদ্ধদের বসতি শুরু, বিবর্তন ও উন্নয়নের ইতিহাসকে পরিগ্রহ করে। প্রাচীন এ অঞ্চলে ১৬ টি জনপদের অন্যতম বঙ্গ জনপদ গড়ে উঠেছিল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সুবিধার কেন্দ্রস্থল ঢাকাকে কেন্দ্র করে। 'ঢাকা'-শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে যেমন বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে, তেমনি ঢাকা শহরে বসবাসরত মানুষের ইতিহাস নিয়েও বহুমত প্রচলিত। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের লুম্বিনী কানন হলেও ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং তাঁর সময় থেকেই দেশে হাতে গোনা বৌদ্ধদের বসবাস শুরু হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা পায় এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি শিষ্যদেরকে প্রেরণ করেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। ভারতের অন্যসব স্থানের মতো এতবেশি আধিপত্য না পেলেও বিক্রমপুরে তাঁর প্রচারকগণ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ধারণা করা হয়, আট-নয়শত বছর আগে ঢাকার মূর্তিপূজারী অধিবাসীরা মূলত বৌদ্ধ ছিল। প্রায় বারোশত বছর আগের সম্ভারে (বর্তমান সাভারে) প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করে ঢাকায় বৌদ্ধদের বসবাসের শুরু বেশ প্রাচীন। পাল বংশের রাজত্বকালে দশম শতকে বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণের ফলে কলকাতা কেন্দ্রিক বৌদ্ধ কার্যক্রম পরিচালিত হতে শুরু হয় । ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধদের কল্যাণের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা, বিহার নির্মাণ, অবহেলিত-দরিদ্র বৌদ্ধদের বসতি ও কর্মসংস্থানের চেষ্টা করেন। ১৯৬০ সালে চার একর জায়গা নিয়ে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সবুজবাগে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বিহারে বাঙালিরা আশ্রয় নেয়। মুক্তিযুদ্ধে তিনি অসমান্য অবদান রাখেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের কল্যাণে কাজ করেন। ১৯৭৮ সালে চীন থেকে অতীশ দীপঙ্করের দেহভস্ম বাংলাদেশে আনা হয়। এরপর ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিহারের নির্মাণ শুরু হয়। এছাড়াও ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার কীভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মানুষ নিরাপদে বেঁচে থাকার তাগিদ, আত্মরক্ষা ও একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতা থেকেই ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের সুবিধার ভিত্তিতে বসতি নির্মাণ করেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসতি পরিবেশগত সুবিধা, মানুষের কারিগরি কৌশল, আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বিভক্ত হয়েছে গ্রাম ও শহরে। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী দীর্ঘ রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, ঔপনিবেশক শাসনব্যবস্থা ও ভৌগোলিক খণ্ড-বিখণ্ডতার মধ্য দিয়ে আজকের বাংলাদেশে তৃতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বাংলাদেশের ০.৭ শতাংশ মানুষ বৌদ্ধ, বিশেষত থেরবাদ মতাদর্শের। ১৬১০ সালে ঢাকা প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার পর ঢাকার জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারীতে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ ছিল ৪ জন যা মোট জনসংখ্যার ০.০০৬ ভাগ। ১৯০১ সালে ঢাকা শহরে মাত্র ৩০ জন বৌদ্ধ ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব বঙ্গের বৌদ্ধদের আবাসন ও সংগঠিতকরণ শুরু হয়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারীর হিসেবে পূর্ববেঙ্গ ০.৭ শতাংশ বৌদ্ধ বাস করত যা ১৯৬১ সালে ০.৭ শতাংশ, ১৯৭৪ সালে ০.৬ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ০.৬ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। আর ঢাকা বিভাগের বৌদ্ধ জনসংখ্যা ছিল ৮৩১ জন (০.০১%), ১৯৬১ সালে ১,০৩০ জন (০.০১), স্বাধীনতার পরে ১৯৭৪ সালে ৩২২৭ জন (০.০২%), ১৯৮১ সালে ৪,৭৪৩ জন (০.০২%), ১৯৯১ সালে ২০,৪৩০ জন (০.০৬%), ২০০১ সালে ৮,২৬৪ জন (০.০২%) এবং ২০১১ সালের আদমশুমারীতে ১৫,০১৮ জন (০.০৩%) বৌদ্ধ মানুষ বসবাস করে। ২০০১ সালের আদমশুমারীর হিসেবে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলার বৌদ্ধ জনসংখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত থানাসমূহে বসবাসরত বৌদ্ধদের সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় যে বৌদ্ধ রয়েছে তা অধ্যায়ে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে বৌদ্ধ সমাজে রয়েছে আলাদা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব। জন্ম নয়, কর্ম দ্বারাই নির্বাণ লাভ সম্ভব-এ বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মূলত থেরবাদী বৌদ্ধ দর্শনে বিশ্বাসী এদেশের বৌদ্ধদের কেউ কেউ পারিবারিকভাবে সন্তান নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, কর্ণছেদন ও নাসিকা ছেদন, বিবাহ, আর্শিবাদ, তেল চড়ানি, জন্মদিন এবং বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদির অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। আবার অনেকে বিহারে গিয়ে দান অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এছাড়াও বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ফাল্গুনী পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, বর্ষসংক্রান্তি অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধ বিহারে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানগুলো ঢাকায় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীরা মহাসমারোহে আয়োজন করে থাকে। ঢাকায় বৌদ্ধ আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা ২০১১ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় জাতীয় সংসদের ক্রিসেন্ট লেকে 'ফুল বিঝুর' আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও রবীন্দ্র সরোবরে ও জগন্নাথ হলের পুকুরে ফুল বিঝুর আয়োজন করা হয়। ঢাকা

শহরে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বিবাহ ও অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠান কমিউনিটি সেন্টারে উদ্‌যাপিত হতে দেখা যায়। ঢাকা শহরে কোনো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মৃত্যু হলে বিহারে অনিত্য সভা হয় এবং শেষকৃত্যের জন্য আশুলিয়াতে বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্রের শশ্মানে নেয়া হয়। আবার কেউ প্রায় সময় মৃত্যুর পর শেষকৃত্যের জন্য শেকড়ে নিয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায়: শিক্ষা মানুষের আত্মিক উন্নয়ন, বুদ্ধিগত সমৃদ্ধি ও সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে তোলে। প্রাচীন ভারতে সনাতন ধর্মের রীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যেখানে শুধু ব্রাহ্মণগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্মের আর্বিভাব হলে বুদ্ধের প্রচারিত 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' এর মাধ্যমে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। গুরুগৃহে বা বিহারে ভিক্ষু বা আচার্যদের কাছে শিষ্যরা (শ্রমণ) আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে বিদ্যার্জন করত। আট বছর বয়সে প্রবজ্যা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ শুরু এবং বার বছর অধ্যয়ন শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তীর্ণ হয়ে উপসম্পাদা প্রাপ্তির মাধ্যমে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হতো। ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি ভাষা ব্যাকরণ, সাহিত্য, শব্দবিদ্যা, আধ্যাত্মবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি শিখানো এবং গুরুভক্তি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদির চর্চা করা হত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল বিহারের গ্রন্থাগারে। এসব উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষার জন্য ছিল নালন্দা, তক্ষশীলা, জগদ্দল বিহার, বলভী বিশ্ববিদ্যালয়, শালবন বিহার, সীতাকোট বিহার ইত্যাদি। প্রাচীন বিহারগুলো ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও প্রাচীন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তি পরীক্ষা, নবীন বরণ, পরীক্ষা পদ্ধতি, সমাবর্তন, স্নাতক, সনদ প্রদান, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ধারণা এসেছে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে। আবৃত্তি ও বির্তক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। শ্রমণদের দশশীল পালনের বাধ্যবাধকতা ছিল। বুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শিশুনাগ, মৌর্য, গুপ্ত ও পাল রাজাগণ বিহার নির্মাণ ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলার বৌদ্ধরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন পেশা ও কর্মে নিযুক্ত হলে বৌদ্ধ নেতৃত্ব তৈরি হয় ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অনেক যুগপুরুষের আবির্ভাব হয়। পাকিস্তান আমলে বৌদ্ধদের কল্যাণে বহু সমিতি, সংঘ, সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা সংস্থা, গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠে। স্বাধীন বাংলাদেশে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড হয়েছে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পালি বিষয়ে পাঠদান করা হয়। ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের শিক্ষা বিস্তারে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, শুদ্ধানন্দ মহাথের ও প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরের অবদান সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীদের জন্য জনকল্যাণমুখী কাজের জন্য বিহার ও শিক্ষায়তন নির্মাণ করেন। এসব শিক্ষায়তন শুধু ঢাকার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীরা সুবিধা ভোগ করছেন না। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সুবিধা নিচ্ছেন। এসব প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং শিক্ষা, সেবা ও গবেষণায় দেশ-বিদেশে অবদান রাখছে।

পঞ্চম অধ্যায়: এই গবেষণার জন্য মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যেখানে গুণগত পদ্ধতিতে কে.আই.আই ব্যবহার করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং পরিমাণগত পদ্ধতিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ১৫০ জন নমুনা বৌদ্ধদের বয়সের গড় ৩৯.৫ বছর, যাদের ৬৭.৩৩ শতাংশ পুরুষ, ২৬ শতাংশ

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষিত, ২৬.৬৭ শতাংশ স্নাতক। বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য না থাকলেও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে পর্যাপ্ত ছুটি ও বৌদ্ধদের আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১১.৩৩ শতাংশ সরকারী চাকুরিজীবী, ১৬ শতাংশ ব্যবসায়ী. ১৮.৬৭ শতাংশ গৃহিণী। ব্যবসায় কোনো বৈষম্য না থাকলেও চাকুরিতে কেউ কেউ কর্মের সুষম বণ্টনের অভাবে বৈষম্যের কথা বলেন। ঢাকা শহরে ১১.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধদের নিজস্ব বাড়ি এবং ৮৩.৩৩ শতাংশ ভাড়া বাড়িতে থাকে, যাদের ৯৪.৬৭ শতাংশের বাড়ি পাকা। বসবাসরত বৌদ্ধদের ১১.৩৩ শতাংশ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছে। ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ একক পরিবার। ৮৮ শতাংশ বৌদ্ধ বড়ুয়া পদবি ব্যবহার করে। বৌদ্ধ নারীরা শিক্ষায় যথেষ্ট এগিয়ে, নারীদের ১৮.৫২ শতাংশ স্নাতক এবং ২৪.০৭ শতাংশ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। তাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশই গৃহিণী এবং ১৪ শতাংশের বেশি সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীজীবী। চাকরি, ব্যবসা, সম্পত্তি ভাড়া ইত্যাদি আয়ের মধ্যে ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের গড় মাসিক আয় সবচেয়ে বেশি ব্যবসায়ীদের যা সর্বোচ্চ (২,৫৬,৯০৯ ঢাকা), আর অন্যান্য পেশায় সর্বনিম্ন আয় ১০,০০০ টাকা। ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাসিক ব্যয় খাদ্যে এবং দ্বিতীয় চিকিৎসায়। ১৫.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন মনে করে। সঞ্চয়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানীয় সমবায় বা সঞ্চয় সমিতিতে যুক্ত আছে ৩৬ শতাংশ বৌদ্ধ। যাতায়াতের জন্য মাত্র ১.২৭ শতাংশ বৌদ্ধরা প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার করে, অধিকাংশই (প্রায় ৯২ শতাংশের বেশি) গণপরিবহনে চলাচল করে। পারিবারিক সম্পত্তির মধ্যে তাদের রয়েছে ফ্ল্যাট (৯৩.৬৪ শতাংশ), জমি, গাড়ি ও ব্যবসা ইত্যাদি। নিজেদের ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচার-অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধ (৯৩.৭৪ শতাংশ) অবসরে টেলিভিশন দেখে এছাড়াও বই পড়া, খেলাধুলা ও সামাজিক গণমাধ্যমে সময় কাটায়। প্রায় সকল বৌদ্ধদের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালন করতে বিভিন্ন বিহারের মধ্যে মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে যায় সবচেয়ে বেশি (৩৫.৩৫ শতাংশ) মানুষ। পারস্পরিক ধর্মীয় আচার পালন করতে বৌদ্ধরা অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও সহযোগিতা করেন। ধর্মীয় কারণে কোনো বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়নি ৯৯.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ। তবে বৌদ্ধ গৃহিণীরা অনেক সময় মার্কেটে, বাসা ভাড়া ও বাসায় রান্নাবান্না, ধর্মীয় উৎসব পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে দূরত্বপূর্ণ আচরণের সম্মুখীন হয়। এছাড়াও মাঝেমধ্যে খাদ্যাভাস, পোশাক ইত্যাদির কারণে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। তবে ৯৭.৩৩ শতাংশ মনে করে ধর্মীয় উস্কানির কারণে তাদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটেনি। গুণগত বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, শহরের ব্যস্তময় পরিবেশের কারণে অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান চর্চা করা যায় না। বৌদ্ধদের শিক্ষা, চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা নেই, রয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের জন্য। এছাড়াও বৌদ্ধদের সম্পর্কে সবাই অবগত না থাকায় বৌদ্ধ এবং ভিক্ষুদের অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। এছাড়াও ঢাকায় বৌদ্ধদের সৎকার বা সমাহিত করার ব্যবস্থা, বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী খোঁজা, বিহারের

নিরাপত্তা, বৌদ্ধদের ধর্মান্তর, বৌদ্ধ সংগীত চর্চা এবং ঢাকা শহরের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উৎস:

অভিসন্দর্ভ রচনায় মূলত প্রাথমিক ও গৌণ উপাত্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য প্রশ্নাবলী জরিপ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)-এর আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার এলাকা থেকে ১৫০ জনের উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নিয়ে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগৃহীত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গৌণ তথ্যের উৎস হলো বই, জার্নাল, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, লাইব্রেরী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

প্রত্যাশা:

ঢাকা শহরে বসবাসরত বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে আমার জানামতে, ইতোপূর্বে গভীর বিশ্লেষণ পূর্বক কোনরূপ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ কারণে আমি "বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: পরিপ্রেক্ষিত" ঢাকা শহর শিরোনামের এম.ফিল গবেষণাকর্মটি করতে পেরে আনন্দিতবোধ করছি। গবেষণার উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য নিয়ে ঢাকার ও বৌদ্ধদের ইতিহাস ও জনসংখ্যা সংবলিত বই, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, প্রশ্নমালার মাধ্যমে ঢাকা শহরে বসবাসরত ১৫০ জন বৌদ্ধদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং সুনির্দিষ্ট সাক্ষাৎকারমালা ও টেলিফোন কলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করি। আশা করছি ইতিহাসপ্রেমী, বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সুধী সমাজের জন্য এটি মূল্যবান তথ্যের উৎস হবে বলে আমি মনে করি এবং তাদের কাজে ব্যবহৃত হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আশা করি।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

ঢাকা শহরের বৌদ্ধ জনবসতির ইতিবৃত্ত

আড়াই হাজার বছর পূর্বে (৫৬৩ খ্রি.পূ.) হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের লুম্বিনীতে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশে গৌতম বুদ্ধ জন্ম লাভ করেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে তা বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত। বুদ্ধই বৌদ্ধধর্মের প্রচারক এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম হল সার্বজনীন। মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম। 'বৌদ্ধ' শব্দটি মূলত বোধি শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'বোধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান, সর্বোচ্চ জ্ঞান, বুদ্ধজ্ঞান, জ্ঞানালোক বিতরণ, জ্ঞানালোক প্রাপ্তির অবস্থা।[১] এভাবেও বলা হয় ভগবান বুদ্ধ নির্দেশিত নীতি আদর্শের যারা অনুসারী বা যাঁরা দুঃখ মুক্তির জন্য জ্ঞানের সাধনা করেন তাঁরাই বৌদ্ধ।[২] ঋষিপতন মৃগদাবে (সারনাথ) প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা হয়। বঙ্গদেশের অতীত ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্যের যুগ। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণী ও *দিব্যবদান* গ্রন্থ থেকে বাংলায় অশোকের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া ফা-হিয়েন, ইৎসিং, শেংচি প্রমুখ চীনা পর্যটকদের বিবরণী থেকে এসময় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। এটি প্রমাণিত যে, দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহাস্থান শিলালিপি থেকে। আবার গুপ্ত শাসনামলে (খ্রিষ্টীয় ৩২০-৫৫০ অব্দ) রাজাদের উদার আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে।[৩]

ইতিহাস ও ঐতিহ্যে গৌরবমণ্ডিত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা অনেক প্রাচীন নগরী। ঢাকা শহর ও মহানগরীকে কেন্দ্র করে বাংলা, পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাস সূচিত হয়েছে। ইতিহাসের পাশাপাশি এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিংবদন্তী ও ইতিহাসের অনেক উপজীব্য কাহিনি। হাজার বছরের এই ঢাকার গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে। কেননা গুপ্ত যুগ (খ্রিষ্টীয় ৩২০-৫৫০ অব্দ) থেকে শুরু করে পাল (অষ্টম-দ্বাদশ শতক), সেন বংশীয় (আনু. ১০৯৭-১২২৫ খ্রি.) রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। তারপর সুলতানী আমল (৯১২০৪-১২২৭ খ্রি.) এবং পাকিস্তান আমলের শত শত স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই শহরটি। তাইতো এই ঢাকাকে বলা হয় তিলোত্তমা শহর। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বদ্বীপ, দক্ষিণ এশিয়ার নবীনতম স্বাধীন রাষ্ট্র, শস্য, শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। ঢাকা মধ্য বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ২৩°৪২´ থেকে ২৩°৫৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২০´ থেকে ৯০°২৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত এই শহরের মোট আয়তন ৩৬০ বর্গ কি.মি. (১৪০ বর্গ মাইল)। ঢাকা শহরের মোট ২৪টি থানা আছে এবং শহরটি মোট ১৩০টি ওয়ার্ড ও ৭২৫টি মহল্লায় বিভক্ত। ঢাকা জেলার আয়তন ১৪৬৩.৬০ বর্গ কি.মি। এ জেলাটি গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ি, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নরসিংদী জেলা দ্বারা বেষ্টিত।[৪]

ঢাকা স্থান হিসেবে পুরানো তা উল্লেখ আছে যেমন: মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান অনূদিত *জেমস্ টেলর কোম্পানি আমলে ঢাকা*, এ এম. এম. শরফুদ্দীন অনুবাদিত '*তাওয়ারিখে ঢাকা*', শ্রী কেদারনাথ মজুমদারের '*ঢাকার ইতিহাস* (১ম ও ২য় খণ্ড)', শরীফ উদ্দিন আহমদের '*ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)*', যতীন্দ্রমোহন রায়ের '*ঢাকার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)*', মুনতাসীর মামুনের '*ঢাকা সমগ্র*', এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের '*ঢাকা কোষ*' ইত্যাদী গ্রন্থসমূহে। ইতিহাসবিদ স্যার এ প্যারী রচিত '*ব্রহ্মদেশের ইতিহাস*' চতুর্থ শতাব্দীতে ঢাকার নাম উল্লেখিত হয়। প্রাকৃতিক দিক থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। কারণ বুড়িগঙ্গা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গে সংযোগ সাধন করে। ফলে বুড়িগঙ্গা বেষ্টিত যে দ্বীপ সদৃশ্য ভূ-ভাগ তার প্রায় সবটাই জনবসতি ছিল। এই জনবসতির এক অঞ্চল পরবর্তীতে ঢাকা নামে পরিচিত হয়। নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্রের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী স্থান হওয়ায় ঢাকা বেশ গুরুত্ব লাভ করে এবং পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।[৫] ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে ঢাকা নগরীর ইতিহাসে পাচঁটি যুগে চিহ্নিত করা যায়:

সাল	বিভিন্ন সময়
১৬০৮ পর্যন্ত	মোঘলদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত
১৬০৮-১৭৬৪	মোঘল শাসনামল
১৭৬৪-১৯৪৭	ইংরেজ শাসনামল
১৯৪৭-১৯৭১	পাকিস্তান শাসনামল
১৯৭১ পরবর্তী	স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী এবংব বর্তমান ঢাকা

সূত্র: সৈয়দা নওয়ারা জাহান, ঢাকা শহরের জনসংখ্যার ধরণ: একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৯৭ এম. এস থিসিস, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ) পৃ. ১৮

জন বিমস তাঁর Journal of the Royal Asiatic Society-তে (পৃ.৮৩-১৩৫) উল্লেখ করেন: 'বর্তমান ঢাকা বলতে বাংলাদেশের একটি জেলা এবং তার সদর দফতরকে বোঝায়। অথচ ঢাকা জেলার বর্তমান নাম ও অবয়ব দুটোই ব্রিটিশদের সৃষ্টি। প্রাচীন বাংলার প্রশাসনিক এককগুলোর বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায় '*আইন-ই-আকবরী*' নামক গ্রন্থে। এই তালিকা অনুসারে বাংলা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি সরকার বহু মহলি বা পরগনায় বিভক্ত ছিল। '*আইন-ই-আকবরী*' বর্ণিত দুটি সরকার হচ্ছে সরকার বাজুহা ও সরকার সোনারগাঁও।' ১৬১০ সালে মুঘল সুবেদার আমলে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানীর মর্যাদা পায় ঢাকা । পরবর্তীতে স্থায়ী মর্যাদা পায় ১৯৭২ সালে। ইতোমধ্যে ১৬১০ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর এর নামে ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর করা হয়েছিল। ১৯৮২ সালের পূর্বে 'Dhaka' এর নাম 'Dacca' ছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ঢাকা পূর্ব বঙ্গের রাজধানী হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্গত

হয়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়।[৬] সকল ঘটনা, আন্দোলন, সুখের স্মৃতি নিয়ে আছে ঢাকা। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, স্বাধীকার আন্দোলন, ১৭৬০ সালে পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সারা দিয়েই ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সূচিত হল বাঙালি বিজয়। জন্ম নিল স্বাধীন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' যার রাজধানী হল ঢাকা। এসব ইতিহাস শুধু ঢাকা নয় ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের অঙ্গও বটে।[৭] বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা তা বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ (ক) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে।[৮]

রহস্যময়ী ঢাকা নগরীর গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা, পরিবেশ ও আবহাওয়ায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। তেমনি ঢাকার নামকরণে দেখা যায় নানা মত যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল: ৭৫০ থেকে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'ঢাবাকা অর্থাৎ (ঢা+বা) + কা = ঢাকা। ৪০০ বছরের সমৃদ্ধশালী বৌদ্ধ জনপদ আজকের ঢাকা মহানগরী। সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের *ঢাক থেকে ঢাকা* বইয়ের পৃ. ১৩ এ উল্লেখ আছে, 'ঢাকা' শব্দ বা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, ঢাক বৃক্ষ থেকে ঢাকা নামের সৃষ্টি। অজানা লতাগুল্মের ছায়া ঢাকা পরিবেশ থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দেবতার নামে ঢাকা শব্দের প্রচলন রয়েছে বলে জানা যায়।[৯]

সমকালীন ইতিহাসগ্রন্থ না থাকায় ইতিহাস পুর্নগঠনের আকর সূত্র হিসেবে প্রত্নসূত্র অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে হয়। এ পথ ধরে ঢাকা নামের উৎস অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতে গুপ্ত বংশের রাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়ের (৩৩০-৩৮০ খ্রি.) একটি স্তম্ভ পাওয়া যায় এলাহাবাদে। স্তম্ভের গায়ে রাজপ্রশস্তি লেখা ছিল। এ স্তম্ভলিপিটি ইতিহাসের এলাহাবাদ প্রশস্তি নামে পরিচিত। প্রশস্তটির লিপিমালার এক জায়গায় প্রথমবারের মতো 'ডবাক' নামটি পাওয়া যায়। এখান থেকে জানা যায়, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নাম ছিল ডবাক। প্রশস্তিতে এমন কয়েকটি রাজ্যের নাম লেখা রয়েছে সেগুলো হলো-'সমতট', 'ডবাক', 'কামরূপ' ইত্যাদি।[১০]

প্রাচীন জনপদ হিসেবে সমতট ও কামরূপের অবস্থান স্পষ্ট। বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে ছিল সমতট জনপদ। কামরূপের অবস্থান ছিল আসামে। ডবাক নামটি পরবর্তীকালে উচ্চারিত 'ঢাকা' নামের সঙ্গে মিল থাকায় মি. স্টেপেলটন, মি. ফ্লিট ও জেমস টেলর মনে করেন ঢাকার আদি নাম 'ডবাক'। এরকম সিদ্ধান্তের পেছনে কিছু যুক্তি রয়েছে। মোহাম্মদ মমিনুল হকের *বাংলার ইতিবৃত্ত* পৃ. (৬৭) ও যতীন্দ্রমোহনের *'ঢাকার ইতিহাসে'* পৃ. (২৩ ও ২৪) উল্লেখ আছে যে, মি. ভিনসেন্ট স্মিথ রাজশাহীকে 'ডবাক' রাজ্য বলে নির্দেশ করেছেন। মি. স্টেপেলটনের মতে, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থান 'ডবাক' রাজ্য। কামরূপ রাজ্য ও সমতটের মধ্যবর্তী স্থানকে 'ডবাক' বলা

হতে পারে। কারণ অশোক স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিসেন বিরচিত লেখাতে 'সমতটও' কামরূপ লিখেছেন তাই 'সমতট' ও 'কামরূপের' মধ্যবর্তী স্থানে ডবাক হতে পারে। আবার মি. ফ্লিটের মতে 'ডবাক' ঢাকা শব্দের নামান্তর। ঢাকা বিভাগের কোন স্থান 'ডবাক' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই 'ডবাক' বলতে ঢাকা সহ 'কামরূপ' রাজ্যের অর্ধেককে বুঝায়।

বর্তমান ঢাকার উত্তর-পশ্চিমে সাভার উপজেলার অবস্থান। প্রাচীনকালে সাভারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক সূত্রে বলা হয়, ৭ ও ৮ শতকে 'সম্ভার' নামে এক রাজ্য ছিল।[১১] সম্ভার রাজ্যের রাজধানীর নামছিল ডবাক। পাল শাসনামলে সাভার ছিল গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ বসতি। সম্ভার রাজ্যের রাজার নাম ছিল হরিশচন্দ্র। যদিও রাজা হরিশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে বির্তক রয়েছে। গত দেড় দশক আগে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সাভার বাস স্ট্যান্ডের সামান্য পূর্ব দিকে একটি প্রাচীন স্থাপনার অংশবিশেষ পাওয়া গিয়েছে যা স্থানীয়ভাবে 'হরিশচন্দ্র রাজার বাড়ি' নামে পরিচিত। অনুমান করা হয়, সম্ভার রাজ্য আজকের ঢাকা শহর পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। ৭ ও ৮ শতকের সমৃদ্ধ জনপদ সাভারের দক্ষিণ সীমানায়, বর্তমান ঢাকা অঞ্চলে আরও প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে প্রত্নসূত্র ইঙ্গিত করেছে। সেই সূত্রে সমতটের উত্তরে এবং বর্তমান সাভারের দক্ষিণের এ অঞ্চলটি সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ডবাক হওয়া সম্ভব। ডবাক নামের সঙ্গে ঢাকা শব্দের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ডবাক যুগ পরম্পরায় মানুষের মুখে উচ্চারণের বিকৃতি ঘটে এক সময় ঢাকায় রূপান্তরিত হতে পারে। যদি এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা যায় তবে ৪-৫ শতকে ডবাক নামের অন্তরালে ঢাকাকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।[১২] এছাড়া জেমস টেলরের মতে, জনশ্রুতি এই যে, এ শহরে প্রথমে ৫২ হাজার ৫৩টি সড়ক ছিল এবং এ অবস্থা থেকে শহরটি একটি দীর্ঘ ও কিছুটা অসুবিধাজনক নাম 'বায়ান্ন হাজার তেপান্ন গলি' রূপে অভিহিত হয়।[১৩] চাইনিজ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বজরা বা তৎকালীন নৌযান ভিড়েছিল ঢাকার নদীতটে। তিনি ঢাকাকে সমুদ্র সন্নিকটস্থ এলাকা বলতে দ্বিধা করেননি। পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, পরিব্রাজক সেঙচি প্রমুখ ঢাকার ঐশ্বর্য সম্পদ ও ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন।[১৪]

মানচিত্রে[১৫] ঢাকা শহরের ভৌগলিক অবস্থান তুলে ধরা হলো: আধুনিক বিবেচনায় পাঁচ হাজার লোক অধ্যুষিত স্থানকে শহর বলা হয় । সেক্ষেত্রে বলা যায়, মোগল আমল (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রি.) থেকেই ঢাকা শহর গড়ে উঠে। আবদুল করিম তাঁর *মোগল রাজধানী ঢাকা* (পৃ. ২৩) বইয়ে এ তথ্য তুলে ধরেন।

উৎস: বাংলাপিডিয়া

মানচিত্রে ঢাকা শহরের অধিভূক্ত এলাকার মধ্যে তুরাগ, উত্তরখান, উত্তরা, দক্ষিণখান, বিমানবন্দর, খিলক্ষেত, পল্লবী, শাহ আলী, মিরপুর, কাফরুল, ক্যান্টনমেন্ট, গুলশান, বাড্ডা, দারুস সালাম, আদাবর, শের-ই-বাংলা, তেজগাঁও, রামপুরা, মোহাম্মদপুর, রমনা, ধানমন্ডি, কলাবাগান, খিলগাও, মতিঝিল, সবুজবাগ, পল্টন, হাজারীবাগ, নিউমার্কেট, শাহবাগ, লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, সুত্রাপুর, কোতায়ালি, গেন্ডারিয়া, যাত্রাবাড়ি, ডেমরা, শ্যামপুর ও কদমতলীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সাথে ঢাকা জেলা হলো ধামরাই, ঢাকা মহানগর, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ ও দোহারের অধিভুক্ত।

ঢাকা শহরের সাথে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের দূতাবাস এবং বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বাণিজ্যিক ও কারিগরি সম্পর্ক রয়েছে । ফলে ঢাকায় বাংলাভাষী মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাংলাদেশী আদিবাসীসহ প্রায় সকল ধর্ম, বর্ণ এবং সকল দেশের জনগোষ্ঠীর লোক দেখা যায়। তাঁদের কেউ কেউ সাময়িকভাবে আবার কেউ কেউ স্থায়ীভাবে কিংবা দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য ঢাকায় অবস্থান করছেন। প্রশাসনিক কার্যবিগ্রহ, ধর্মীয় প্রচার, বাণিজ্যিক লেনদেন ও জীবন জীবিকার কারণে যুগে যুগে বহু জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে মায়াবী নগরী ঢাকায়। সময়ের বিবর্তনে আর সামাজিক সংমিশ্রণে আদি ঢাকাইয়া সম্প্রদায়সহ ঢাকার সমাজ জীবনে এ সংকর জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাভাষীর এ শংকর জনগোষ্ঠী বাঙালী জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১৬] বর্তমান বাংলাদেশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলোর নাম যথাক্রমে বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ় নামে আখ্যায়িত হত। ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *মহাভারত*, আদিপর্ব প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি হলো[১৭]:

"অঙ্গো বঙ্গ: কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্র: সুহ্মাশ্চতে সুতা:
তেষাং দেশা সমাখ্যাতা: স্বনামকথিতা ভুবি।" ১০৪। ৫০

প্রাচীন ভারতবর্ষে সে সময় ১৬ টি জনপদ অন্তর্ভূক্ত ছিল। সেই *মহাভারতে* 'বঙ্গের' কথা উল্লেখ রয়েছে। এখানে তৎকালীন 'বঙ্গ' বলতে বর্তমান ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশালকে বোঝানো হত।[১৮] খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশের এ বিক্রমপুর অঞ্চল সমতট নামে পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এ তত্ত্বকে সমর্থন করেন।[১৯] বর্তমান সময়ে বঙ্গ বলতে আমরা সমগ্র বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালাদেশকে বুঝে থাকি এবং তা সমগ্র বিভাগকে বুঝে থাকি। কিন্তু প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ বলতে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে বুঝাত।[২০] বঙ্গ সম্পর্কে R.C Mojumder বলেন, "Vanga in a list of maritime countries where ships congregated for purposes of trade".[২১] এছাড়া *'নার্গাজুনকোণ্ড শিলালেখ'* (৩য় শতক), সিংহল বা আধুনিক শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যের ধারক *'দীপবংশ'* (৮র্থ শতক), *'মহাবংশ'* (৫ম ও ষষ্ঠ শতক), *'অঙ্গুত্তরনিকায়', 'মহানিদ্দেস'* (আনু. ২য় শতক বা তৎপূর্বে রচিত), অষ্টম শতাব্দীর *'আর্য মঞ্জুশ্রীকল্প', 'ললিতবিস্তর'* ও *'মহাবস্তু'* নামীয় প্রাচীন পালি সাহিত্য ইত্যাকার নানা সূত্রে প্রাচীন ভূখণ্ডের অস্তিত্বের কথা অবহিত হওয়া যায়। বঙ্গের সীমানা নির্ধারণ করার পর বঙ্গে তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যে কথা উল্লেখ রয়েছে, পালি ভাষায় রচিত *'অঙ্গুত্তরনিকায়', 'সংযুক্তনিকায়' 'থেরগাথা'*, *'অপদান'* বা *'অবদানশতক'* প্রভৃতি গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, মহামতি গৌতমবুদ্ধের ৮০ জন সাক্ষাৎ মহাশ্রাবকদের মধ্যে একজন ছিলেন 'বঙ্গীস'। উনি ছিলেন স্বভাব কবি এবং প্রায়শই তিনি বুদ্ধের যশগাঁথা সম্বলিত কবিতা লিখে তাঁকে (বুদ্ধ) শুনাতেন। আত্মপরিচয় দান করতে গিয়ে এই কবি যা লিখেছেন[২২]। প্রকৌশলী অনুপম বড়ুয়া সম্পাদিত *পবিত্র ত্রিপিটকের সুত্তপিটকের* অন্তর্গত *খুদ্দক নিকায়ের অপাদানের* ২য় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ(চট্টগ্রাম: ২০২১) পৃ. ১৬০ নিম্মোক্ত গাথাটি উল্লেখ আছে,

"বঙ্গে জাতোতি বঙ্গীসো, বচনে ইস্সরোতি বা।
বঙ্গীসো ইতি মে নামং অভবী লোকসম্মতং।"

অর্থাৎ, আমার পূর্ব জন্ম হয় (গৃহকূলে) বঙ্গদেশে। তাই বঙ্গীশ নামেই আমাকে জনগণে জানেন। *'থেরগাথা'* গ্রন্থে স্থবির বঙ্গীসকে শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণকূলে জন্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটি যে ঠিক নয় তার যথার্থ কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ড. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া। তাঁর ভাষায়, 'বঙ্গীস' নামকরণ হওয়ার কথা নয়। শ্রাবস্তীতে গিয়ে 'বঙ্গীস' গৌতম বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন বিধায় এবং সেখানে অবস্থান করেছিলেন বলে হয়ত তাঁকে শ্রাবস্তীর লোক মনে করা হয়েছে। তবে যেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন না কেন বাংলাদেশের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল...তা এ ধরনের নামকরণ থেকে আন্দাজ করা যায়।[২৩] প্রাচীনকালে ঢাকা শহরে যে এলাকার যে গোত্র বসবাস করত

তাদের নামানুসারে এলাকার নামকরণ করা হতো।[২৪] নানা ধর্মের লোক যেমন-হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ নিয়ে ঢাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছিল।

ঢাকা শহরের উৎপত্তি নিয়ে যেমন অনেক গল্প কাহিনী রয়েছে তেমন রয়েছে ঢাকার বসবাসরত মানুষের আদি ইতিহাস নিয়ে। বহু জনগোষ্ঠী যেমন: মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের নিয়ে এই ঢাকা। তবে বহু জনতার বসবাস কবে থেকে এ তা নিয়েও রয়েছে সন্দেহ। খ্রিস্টীয় ৭ম শতক থেকে ঢাকায় লোক বসবাস শুরু করছে। বৌদ্ধ মতাবলম্বীরাও ঠিক তখন থেকেই বসবাস করে আসছে। তাছাড়া ঢাকা শহরের আট-নয়শ বছর আগে ঢাকার বাসিন্দারা মূর্তিপূজা করত। সেই মূর্তি পূজারীরাই ছিল বৌদ্ধ। তাছাড়া ঢাকা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত যখন হয় তখন উত্তর পশ্চিমে 'সর্বেশ্বর' নামে একটি রাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে যে রাজ্যের রাজধানী সাভার (সম্ভার)। আর সে স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ১টি বৌদ্ধবিহার ও ধ্বংসস্তূপ এবং ধর্মকেন্দ্র রয়েছে। এ থেকে বলা যায় ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধদের অস্তিত্ব খুব পুরান। অষ্টম-দ্বাদশ শতকে ঢাকা থেকে ১২ মাইল দূরে বিক্রমপুরে ঢাকার প্রশাসনিক কেন্দ্র ও রাজধানী ছিল।[২৫] ইংরেজ আমলে গ্রীক ও ফরাসীদের নামে ঢাকায় যেমন রাস্তাঘাট রয়েছে তেমনি বিভিন্ন বিদেশী ব্যক্তি ও গোত্রের নামেও ঢাকায় কতিপয় রাস্তা রয়েছে। যেমন: বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে মগদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় যারা মোঘল শাসকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৬] কোম্পানি আমলে ঢাকার আলোচনা করতে গিয়ে মগদের কথা উঠে এসেছে। মগদের প্রতিরোধকল্পে নৌকা ও লোক সরবরাহ শর্তে অনেক ভূমির কর দেওয়া হত না। অনেক জমিদারকে প্রারম্ভে নিষ্কর ভূমি মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই শর্তে যে, তারা এ জেলার মগদের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে নৌকা ও লোক সরবরাহ করবেন এবং এভাবে যে ভূমি তাদের দখলে ছিল তাদেরকে নওয়াবাহ বলা হত।[২৭] একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, মগ রাজাদের অনেকেই দেশীয় নাম ছাড়া মুসলিম নাম গ্রহণ করেন। ১৬১০ সালে রাজা হোসেন শাহের সৈন্যাপত্যে তাঁরা ঢাকা নগরীতে প্রবশ করেন। পরে সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ তাদের বিতাড়িত করে এবং মগদের যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রায় ৪ হাজার নৌযান দখল করে নেন।[২৮] পুরাকালে রাজা বিক্রমাদিত্য এ অঞ্চলে প্রথম রাজধানী পত্তন করেছিলেন যাতে আজও তাঁর স্মৃতি ভাস্বর হয়ে আছে। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রথম বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিক্রমপুরের চতুর্দিক ঘিরে সংস্কৃতি ও সভ্যতা দানা বেঁধে উঠেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে একটি বৌদ্ধ রাজবংশ অপ্রতিহত শক্তি ও প্রতিপত্তির সাথে রাজ্য শাসন করে যান। তাছাড়া, বংশাই নদীর পূর্বতীরে প্রায় বারো'শ বছর আগে সর্বেশ্বর নামে একটি নগর ছিল। সে সময়ের 'সর্বেশ্বর' নামের অপভ্রংশ আজকের আধুনিক সাভার। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশীয় রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানী সম্ভার নগরী হতেই সাভার নামের উৎপত্তি আর সাভার সংলগ্নে রাজাসনে পাল রাজাগণ এক মহাবোধি বিহার স্থাপন করেছিলেন। এখানে দেশ-দেশান্তর থেকে বহু বৌদ্ধ পড়াশুনার জন্য আসতেন। শাসক হিসেবে বৌদ্ধ রাজাদের দক্ষতা যেমন প্রবল ছিল তেমনি শিক্ষার প্রসারে তাঁদের প্রচেষ্টা কোন

অংশে কম ছিল না। সম্ভার বা সাভার নগরীর কিছু উত্তরেই ছিল সুপ্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম। সম্রাট অশোকের সময় স্থাপিত ধর্মরাজিকা হতে উদ্ভূত হয়েছে এ নাম। এখানে ছিল বৌদ্ধদের অপরিমেয় বিক্রম।[২৯] পাল শাসকরা এসমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করত। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাই তাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নানা স্থাপনায় সে সময়ে বিক্রমপুরী মহাবিহার, সাভারের ধর্মরাজিকা স্তম্ভ, নরসিংদীর উয়ারী বটেশ্বরের পদ্মমন্দির প্রভৃতি থেকে ঢাকায় বৌদ্ধদের বসবাসের আদি ইতিহাসের প্রমাণ মেলে। তৎকালীন সময়ের বিহারগুলো কেন্দ্র করে বৌদ্ধবিদ্যার পঠন-পাঠন এবং যাবতীয় ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদিত হত।[৩০]

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বৌদ্ধধর্মে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তা ধীরে ধীরে সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাতে থাকে। তখন মহানগরী কলকাতাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধদের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল অঞ্চলে বৌদ্ধরা কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুরু হয় নতুন অধ্যায়, নতুন ইতিহাস। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম নতুন মোড় নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি নতুন পথে যাত্রা আয়োজন করে।

মগবাজার প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আজিমুশশনের হায়দারের মতে, এ স্থানটির সাথে চাঁটগার মগদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মগ তথা বর্মী বংশোদ্ভূতদের নাম হতে মগবাজার নামকরণ করা হয়েছে। মগরা বারবার বাংলা আক্রমণ করে। তৎকালীন মুগল সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেজঙ্গা মগ যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে চার হাজার নৌকা দখল করেছিলেন। দ্বিতীয় সুবাদার ইসলাম খাঁর (১৬৩৫-৩৯ খ্রি.) চট্টগ্রামে নিযুক্ত আরাকান রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র ও গভর্নর মুকুট রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে সুবেদারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ইসলাম খাঁ ঢাকায় যে স্থানে তাদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন সে এলাকা মগবাজার নামে পরিচিতি লাভ করে।[৩১]

ভিন্নমতে, উনিশ শতকে আরাকান থেকে অনেক মগ ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাঁদের একজন ছিলেন মগ সর্দার কিং ব্রিং। তাদের সঙ্গে ছিল প্রায় পঞ্চাশ জন মগ আশ্রয় প্রার্থী। মগ আশ্রয় প্রার্থীরা ঢাকার যে স্থানে এসে বসবাস শুরু করে তা মগবাজার নামে পরিচিত হয়ে উঠে। ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে মগরা মাসে বারো টাকা হারে ভাতা পেত, উনিশ শতকের শেষ ভাগে ঢাকার মগবাজার ছিল নিবিড় অরণ্য, হিংস্র প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র।[৩২] মগদের বসতি ছিল মগবাজারে এ বিষয়ে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, দেড় হাজার বছর আগে ছিল এক প্রহরা চৌকি। স্থানীয়রা তাকে বলত ঢক্কা। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল 'বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলির' এক শহর। মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১২ সালে সেই শহরকে করলেন তার রাজধানী। সেই থেকে যাত্রা শুরু হল নগরী ঢাকার। শ'খানেক বছর আগে মগবাজার ছিল ঢাকা শহর থেকে দুই মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে। নাজির হোসেনের *'কিংবদন্তি ঢাকা'* বইতে একই ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ১৬৩৫-৩৯ সালে চট্টগ্রামে আরাকান রাজ্যের মগ গভর্নর ছিলেন মুকুট রায় যিনি ছিলেন আরাকান রাজার ভাইপো। মুকুট রায় এই সময়ে এসে ধর্ম গ্রহণ করেন

এবং পরিবার-পরিজন ও অনুগতদের নিয়ে সুবেদার ইসলাম খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণকারী মগদের এই দলটিকে ঢাকা শহরের কাছে বসতি স্থাপন করতে দেয়া হয়। এই কারণে জায়গাটির নাম মগবাজর। নাজির হোসের তার বইয়ে মগবাজারের নাম এক সময় মগরাপাড়া ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩]

মগ (মঘ) নামের উৎপত্তি নিয়ে নানাজনের নানামত পরিলক্ষিত হয়। বর্মী (মঙ) Maung থেকে মগ শব্দের উৎপত্তি অনুমান করা হয়ে থাকে। মঙ হচ্ছে বর্মীদের ধর্মীয় উপাদি। কেউ কেউ মনে করেন, ফরাসি 'মুঘ' (অগ্নি উপাসক) শব্দ থেকে মঘ নামের উদ্ভব। কেউ বলেন, সংস্কৃত 'মদগু' জেলের পাখি, জলদস্যু থেকে মগগু, মগ বা মঘ নামের উদ্ভব। মগ শব্দটির উপর শ্রেষ্ঠার্থে আরোপের পক্ষপাতি। প্রাচীনকালে (২২০০ খ্রিঃপূঃ-২০০ খ্রিঃ) মগধ থেকে অনেক হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন বঙ্গ, আরাকান ও বার্মায় আসে। যেখান থেকে কেবল বৌদ্ধ ধর্ম টিকে যায়, অন্যগুলো লোপ পায়।[৩৪] ঢাকা অঞ্চলে মগের অত্যাচার প্রসঙ্গে তালিশ বলেছেন[৩৫]:

> "দীর্ঘদিন দস্যুতার ফলে মগদের দেশ হয়েছে ক্রমশঃই জনশূন্য এবং প্রতিরোধ শক্তিতে ক্ষীণ। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত যাতায়াতের পথে নদীর উভয় পার্শ্বে একজন গৃহস্থ থাকেন না। এই মগের ধ্বংস ক্রিয়ার ফলে বাকলার মত সমৃদ্ধশালী জনবসতি পূর্ণ জেলায় এমন একটি গৃহ ছিলনা যার মানুষ একটি প্রদীপ জ্বালাতে পারে।"

ঢাকা শহরে জীবিকার তাগিদে অনেক বৌদ্ধ বাস করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ সরকারি-বেসরকারী চাকুরিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী । এছাড়া ধর্মীয় গুরু অর্থাৎ বিহারের অধ্যক্ষ, উপাধ্যাক্ষ, সেবক, শিক্ষার্থীরাও বসবাস করে।[৩৬]

বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে বৌদ্ধ। মহামানব মানবতার প্রতীক ভগবান গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের সমতলে বসবাসরত বৌদ্ধদের 'বড়ুয়া' বলা হয়।[৩৭] পেশাগত উপাধি যেমন: সিকদার, তালুকদার, চৌধুরী, মহাজন ও মুৎসুদ্দি ইত্যাদি ব্যবহার করেন। তবে কুমিল্লা এবং নোয়াখালীর বৌদ্ধরা সিংহ উপাধি ব্যবহার করেন।[৩৮] তাছাড়া চাকমা, মগ, মারমা, রাখাইন, তচঙ্গ্যা, চাক, ম্রো, খ্রিংয়ারা, ওড়াঁও মূলত চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট, ঢাকা, কক্সবাজার, রংপুর, বরগুনা, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ আদি উৎপত্তির জীবন জীবিকার তাগিদে বা লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সর্বত্র তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে ঢাকা শহরের বসবাসরত বৌদ্ধদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষের মত। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সূত্রমতে, বৌদ্ধদের বসবাস ঢাকাতে এদের মধ্যে ১০% রয়েছে নারী এবং ৩০% কমলাপুর ও বাসাবোর আশেপাশে থাকেন। অন্যান্যরা সেনপাড়া, পর্বত, শেওড়াপাড়া, মণিপুরীপাড়া, মহাখালী, ফরিদাবাদ, সাভার, ধামরাই, উত্তরা, পরীবাগ, নর্দা, কালাচাঁদপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকা,

বাংলাবাজার ও ধানমন্ডিতে থাকেন। কেউ নিজের বাড়ি, নিজের ফ্ল্যাট আবার কেউ কেউ ভাড়ায় থাকেন।[৩৯] এদের ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকা শহরে নির্মিত হয়েছে বিহার। নিম্নে ঢাকা শহরের বিভিন্ন বিহারের অবস্থান ও পরিচয় তুলে ধরা হল:

বিহারের নাম	বিহারধ্যক্ষ	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার	ভদন্ত বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরো (প্রতিষ্ঠাকালীন বিহারধ্যক্ষ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো এরপর শুদ্ধানন্দ মহাথের)	অতীশ দীপংকর সড়ক, সবুজবাগ, কমলাপুর, ঢাকা	১৯৬০
আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার	অধ্যক্ষ ভদন্ত ধর্মমিত্র মহাথেরো	রাজউক পূর্ণবাসন সড়ক, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২	১৯৮১
শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার	ভেন. প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো	প্লট নং-৪, ব্লক-এ, মেইন রোড-১, মিরপুর-১৩, ঢাকা	১৯৮৩
বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র	আসিন জিন রক্ষিত থেরো	আশুলিয়া, বঙ্গবন্ধু সড়ক, সাভার, ঢাকা	২০০৭
বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহার	প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির	প্লট-আর-২, সেক্টর-১৬ বি, উত্তরা ৩য় প্রকল্প, ঢাকা	২০১৫
আন্তর্জাতিক শান্তিকুঞ্জ ভাবনা কেন্দ্র (বাংলা বাজার বৌদ্ধ বিহার)	ড. জিনবোধি ভিক্ষু	১৭/৮, কে.জি. গুপ্ত লেন, লক্ষীবাজার, সূত্রাবাজার, ঢাকা-১১০০।	২০১৭
প্রজ্ঞানন্দ বৌদ্ধ বিহার	করুণানন্দ ভিক্ষু (প্রতিষ্ঠাকালীন প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো)	৫৬/১, প্রগতি স্মরণি, নর্দা বাসস্ট্যান্ড, গুলশান, ঢাকা	২০১৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগন্নাথ হলে বুদ্ধ মূর্তি	অর্থায়নে: স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী।	জগন্নাথ হল প্রাঙ্গন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২০১৫

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ

ঢাকা বিভাগ ও ঢাকা জেলার অধিভুক্ত বিহরের অবস্থন ও পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বিহারের নাম	বিহারধ্যক্ষ	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
অতীশ দীপংকর মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স	অধ্যক্ষ করুণানন্দ থেরো	বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর (মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা)	২০১৩
নারায়নগঞ্জ কেন্দ্রিয় বৌদ্ধ বিহার ও শাসন রক্ষিত ধ্যান কেন্দ্র	ভদন্ত চন্দ্র বংশ ভিক্ষু, (প্রতিষ্ঠাকালীন ভিক্ষু ড. শাসন রক্ষিত ভিক্ষু)	গ্রাম: দাপা, ইদ্রাকপুর, ডাকঘর-ফতুল্লা, থানা-ফতুল্লা, জেলা-নারায়নগঞ্জ	২০১২
গাজীপুর কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার	ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়,পরিচালনায়: বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন	ডি-৯০, জয়দেবপুর, মধ্যপাড়া, ওয়ার্ড নং-২৮, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর মহানগর, ঢাকা	২০০৪
সাভার বন বিহার	অধ্যক্ষ ধর্মানন্দ ভিক্ষু	গাজীরচট, লাল পাহাড়, সাভার	২০১৫
ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার	পইঞা চ্য ভান্তে	মৌজা দক্ষিণ পাড়া, ধামরাই, সাভার	২০০১
ক্ষীরপোতা আনন্দ বৌদ্ধ বিহার	পরিচালক জ্ঞানেন্দ্র মোহন কর্মকার	তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	২০১৪
সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল বৌদ্ধ মহাবিহার	ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় ও শীলভদ্র মহাথেরো	কেরানীগঞ্জ, ঝিলমিল প্রকল্প	প্রস্তাবিত
সি এইচটি বুডিস্ট মনাস্ট্রি এন্ড মেডিটেশন সেন্টার	কল্যান জ্যোতি থের	সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ	প্রস্তাবিত

সূত্র: মাঠ পর্যায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ

কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারটি ঢাকা শহরের প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার। এ বিহারটিকে বাসাবো বৌদ্ধ মন্দির নামে পরিচিত আবার কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দির নামে পরিচিত। ২০০০ সালে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে উন্নীত হয়। এ বিহারে ঢাকা শহরের বৌদ্ধরা (আদিবাসী, সমতলীয় ও বিদেশি) ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্ম

পালন করে থাকে। রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত (১৯৫০-১৯৫১) সালে গ্রহণ করে।

ছবি: ঢাকা শহরে অবস্থিত ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের প্রধান ফটক।

মহাবিহারের নিকটস্থ মুগদাপাড়ার পশ্চিমে দিগন্ত সড়কটি পূর্বে প্যারিফিরিয়াল রোড নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তুষিতের মহাপ্রয়াণে বহু শতাব্দী পর মহাজ্ঞানী পরম পুরুষ অতীশ দীপঙ্করের দেহভস্ম সুদূর চীন থেকে নিয়ে এসে ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত হয়। এই মহান জ্ঞান তাপস দীপঙ্কর অতীশ এর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের নিকটস্থ প্যারিফিরিয়াল রোডটির নামকরণ করা হয়েছে অতীশ দীপঙ্কর সড়ক। কমলাপুর বৌদ্ধবিহারে শুধু শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের দেহভস্ম রক্ষিত করা হয়নি। এখানে সুদূর চীন থেকে অতীশের নিজের নাকের রক্ত দিয়ে আঁকা আত্ম প্রতিকৃতি ও ব্রোঞ্জ মূর্তি রক্ষিত আছে।[৪০] ১৩ ফাল্গুন ১৩৮৯/২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩/২৫২৬ বঙ্গাব্দ মাঘী পূর্ণিমা, শনিবার, ঢাকার ধর্মীয় ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি লোহিতবর্ণ দিবস। এদিন দীপঙ্করের সহস্রতম জন্মজয়ন্তী উৎসব ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদযাপিত হয়।[৪১] বাংলাদেশের মানুষ শুধু অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থানকে আবিষ্কার করেননি, তাদের এই মহান সন্তানকে সম্মান প্রদানের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০০৪ সালে অতীশ দীপংকরের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়, অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। যা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদানে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে এবং দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য

বিখ্যাত ব্যক্তিদের 'অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়। 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' অতীশ দীপঙ্করের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য দেশী-বিদেশী যারা ধর্ম বিস্তার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবদান রাখছেন তাঁদেরকে প্রতি বছর 'অতীশ দীপঙ্কর শান্তি স্বর্ণপদক' দ্বারা ভূষিত করেন।[৪২]

ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার নামকরণে রয়েছে ঐতিহাসিক যোগসসূত্রতা। যা জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়ার বই *মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরঃ জীবন ও কর্ম* (পৃ. ৪০) উল্লেখ আছে: সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য বুদ্ধের বাণী সংবলিত ৮৪ হাজার স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। তন্মোধ্যে একটি নির্মিত হয়েছে ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ে এবং তার নাম ছিল ধর্মরাজিকা স্তম্ভ। এর নামানুসারে এলাকার নাম হয় ধামরাই। এই স্তম্ভটি ধামরাইয়ে মোকামতলা মাজারের গেটের দু'পাশে ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। সম্রাট অশোকের সে স্মৃতিস্তম্ভকে পুনরুজ্জীবিত করতেই ঢাকার এ বৌদ্ধ বিহারটির নামকরণ করা হয় ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার।

ছবি: ধামরাইয়ের ধর্মরাজিক স্তম্ভের খণ্ডিত অংশ

১৯২১ সালে ব্রিটিশ নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সে অসহযোগ আন্দোলনে অন্যান্যদের মতো বৌদ্ধরা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে অংশ নিয়েছিলেন। প্রণব কুমার বড়ুয়া রচিত *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়* (পৃ. ১৮) উল্লেখ আছে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ছতরপুটিয়া গ্রামের অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ বড়ুয়া একটি বলিষ্ঠ নাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে তিনি কলকাতায় আন্দোলনে অংশ নেন এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি ঢাকায় জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে থাকে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে এই প্রথমই পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদে জনগণের ভোটের দ্বারা দু'জন বৌদ্ধ জনপ্রতিনিধি

নির্বাচিত হন। বৌদ্ধরা সংখ্যাগুরু জনগণের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করে এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম ও সংস্কৃতিকে লালন-পালন করে। এ সময়ে প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদে বৌদ্ধরা স্থান পায়। বৌদ্ধরা শিক্ষা, ব্যবসা, চাকুরীতে এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হলে মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাথের স্বজন স্বজাতি নিয়ে কোন অংশে স্থায়ীভাবে থাকবেন এ চিন্তায় যখন ব্যাতিব্যস্ত তখন ড. বি. এম বড়ুয়া তাঁকে যা বলেছিলেন তা ভিক্ষু সুনীথানন্দ রচিত *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন* বইয়ের (পৃ.৩২৫) উল্লেখ আছেঃ

> "বিশুদ্ধানন্দ, আমরা সবাইতো এ পারে পড়ে গেলাম, তুমি চেষ্টা করো রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র স্বজাতির জন্য কিছু করতে পার কিনা, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যে কর্মশক্তি আছে, তাতে তুমি পারবে অবহেলিত, অপরিচিত বাঙালি বৌদ্ধ সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, তুমিই হবে তাদের আলোর দিশারী।"

ড. বড়ুয়ার এ শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি আশায় বুক বাঁধলেন, মনস্থির করলেন স্বজন, স্বজাতি নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে থাকবেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে, বাঙালি বৌদ্ধদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করতে হলে প্রথমে চাই সংগঠন এবং নিজেদের অধিকার ও দাবি দাওয়া আদায়ে অধিকতর সচেতনতা এবং সৎ সাহস। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে মহাথের ঢাকায় আসেন। সরকারের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে অসহায়, অবহেলিত বাঙালি বৌদ্ধদের জন্য একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে। তিনি অনাহার অনিদ্রায় থেকে টাকা পয়সার অভাবে ঢাকা শহরে পদব্রজে ঘুরে ঘুরে কখনো ছাত্রাবাসে ছাত্রদের সাথে, কখনো মেসে, কখনো পরিচিত কারো বাসার বারান্দায় আবার কখনো পরিত্যক্ত জীর্ণ কুঠিরে অবস্থান করেছেন। এত অভাব অনটনে তিনি কখনো লক্ষ্যচ্যুত হননি, দেখা যায়নি তাঁর শুভ উদ্যমে এতটুকু ঘাটতি। এর মধ্যে দিয়ে তিনি সরকার ও বর্হিবিশ্বের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষা করে সুদীর্ঘ ১০ বৎসর একক সংগ্রামের ফলে ১৯৬০ সালে ঢাকার বুকে বৌদ্ধ বিহার নির্মানের জন্য সরকার থেকে সাড়ে চার একর জমি লাভ করেন। বৌদ্ধ বিহার ও ধর্মরাজিক মহাপ্রকল্প তাঁর ব্যক্তিগত কর্ম প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল।[৪৩]

১৯৪৯ সালে বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধদের আরও অনুপ্রাণিত করে। এই সংঘ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশে মহান অবদান রাখতে সমর্থ হয়। ১৯৫০ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব বৌদ্ধদের এক সম্মেলন এবং ঐ সম্মেলনেই গঠিত হয় বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ (World Buddhist Fedaration)[৪৪] এবং বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ। উক্ত সম্মেলনে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের অনুমোদন লাভ করে। এই সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে পাকিস্তানের বৌদ্ধরা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৌদ্ধদের সংস্পর্শে আসে এবং তাঁদের জাতীয় জীবনে নতুন গতিবেগের সঞ্চার হয়। এ সময় সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদর্শন করেন। একদা যে পাকিস্তানের বৌদ্ধরা অপরিচিত ছিল তাঁরা বৌদ্ধ বিশ্বে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হয়। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু ও

উকিল উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি সে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে সারাবিশ্বে বুদ্ধের জন্মের ২৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করা হয়। এর সাথে সঙ্গতি রেখে পাকিস্তানের বুদ্ধজয়ন্তী পালনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ সম্মেলনে বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, নেপাল, ভিয়েতনাম, ইতালি ও শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশ থেকে বহু পণ্ডিত ও কৃতি ভিক্ষুরা যোগদান করেন। এভাবে সাংস্কৃতিক সঙ্গমে বৌদ্ধধর্ম ও কৃষ্টির নবজন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার বুকে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশে আর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার পর বুড়িগঙ্গার তীরে বৌদ্ধধর্মের যে সীমা ছিল তা রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত হয়ে নতুন প্রেরণায় অভিষিক্ত হয়েছে। ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের তথ্য সংগ্রহ করার সময় তখন বিহারের অধ্যক্ষ শুদ্ধানন্দ মহাথেরোর কাছ থেকে জানা যায়, ১৯৬০ সালে এই বিহার নির্মাণ করা হয়। তিনি জানালেন সরকার এর জন্য জমি দান করেছেন। ১৯৫১ সালে ঢাকায় প্রথম অস্থায়ী বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তি সংগ্রামের পর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় এক নতুন দেশ নাম যার 'বাংলাদেশ'। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানই বাংলাদেশ নাম ধারণ করে সে সুবাদে এ দেশের অধিবাসীরা বাংলাদেশের অধিবাসী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকাগুলি বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বাধীন বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় হিসেবে মর্যাদা পায়। বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ তিথি শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তথা বুদ্ধ পূর্ণিমা জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষিত হয়। তাছাড়া গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত আষাঢ়ী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের জন্য ঐচ্ছিক ছুটি হিসেবে নির্দিষ্ট হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমাকে জাতীয় ছুটি ঘোষণার মাধ্যমে মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। বেতারে *'ত্রিপিটক'* পাঠ ছাড়াও প্রতিটি অনুষ্ঠানে বেতারে দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়। এছাড়া, বিশেষ সভা, সেমিনার, সম্প্রীতির র‍্যালী হয়ে থাকে। বিভিন্ন সভা সেমিনারে সকল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া দেশের মন্ত্রী, এমপি, সরকারী কর্মকর্তা, বরেণ্য সুধীজনরা আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এছাড়া বৌদ্ধ নেতাকর্মী, ভিক্ষু ও সাধারণ বৌদ্ধদের পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক খুবই আনন্দের সাথে অনুষ্ঠানে মিলিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ বেতারে ঢাকা কেন্দ্র থেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান দৈনিক ৫ মিনিট সপ্তাহে একদিন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে পবিত্র *'ত্রিপিটক'* পাঠ হয়। আবার বিশেষ দিনে সরকারী বেসরকারী টেলিভিশন, রেডিওতে বৌদ্ধদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান করে থাকে।[৪৫]

ঢাকা শহরের ইতিহাসে প্রথম বৌদ্ধদের নাম ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেয়া হলো:

প্রতিষ্ঠান/পদবী	নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি	ড. কনক কান্তি বড়ুয়া
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার পরিচালক	ডি.পি বড়ুয়া
রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব	ড. সম্পদ বড়ুয়া
প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও দপ্তর সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া
ব্রাইট গ্রীন এনার্জি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও সভাপতি	দীপাল চন্দ্র বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষক	ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের নীলদলের যুগ্ম আহ্বায়ক	ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের নীল দলের আহ্বায়ক	”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালনা পরিষদের সদস্য	”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বোর্ড অব স্পোর্টস কমিটির সদস্য	”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম একাডেমি কাউন্সিলর	”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল কমিটির প্রথম সভাপতি	”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল কমিটির প্রথম (তিনবার) সদস্য	”
সিন্ডিকেট সদস্য, বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়	”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে International Conference on Buddhism and Civilization এর প্রথম প্রধান সমন্বয়ক	”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রথম প্রতিনিধি	ড. সুকোমল বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শিক্ষক পি.এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন	ড. সাগরময় বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম মহিলা শিক্ষক	ড. বেলু রানী বড়ুয়া
ঢাকায় বৌদ্ধ বিহার	ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার
প্রথম ভিক্ষু	বিশুদ্ধানন্দ মহাথের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক	ডি.পি বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স হলের (বর্তমান রোকেয়া হল) প্রথম ভিপি ও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন	প্রতিভা মুৎসুদ্দি
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	চট্টল বেকারী (সত্ত্বাধিকারী-লায়ন মনোরঞ্জন বড়ুয়া)
প্রথম দায়ক	অতীন্দ্র লাল বড়ুয়া
প্রথম স্কুল	ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়
প্রথম কলেজ	আদিবাসী গ্রীনহার্ট স্কুল এন্ড কলেজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক	ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষু
ফুটবলার	সুহাস কান্তি বড়ুয়া
চারুশিল্প	কনক চাঁপা (চাকমা)
সাংবাদিক	ডি.পি বড়ুয়া
কৃষিবিজ্ঞানে প্রথম পি.এইচডি ডিগ্রী লাভ করেন	সুবর্ণ বড়ুয়া (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন	ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
সিভিল সার্ভিসে	মনুলাল বড়ুয়া
পুলিশ বাহিনী	ডিআইজি শৈলেন্দ্র কিশোর বড়ুয়া
এফসিপিএস এবং শল্য চিকিৎসক	ডা. সীতাংশু বিকাশ বড়ুয়া (পিজি হাসপাতাল)
বৌদ্ধ নারীদের মধ্যে প্রথম এফসিপিএস ডিগ্রি নেন	ড. শিউলী চৌধুরী (পিজি হাসপাতাল)
প্রথম প্রকৌশলী	অনিল কুমার বড়ুয়া (আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র	তড়িৎ কান্তি মুৎসুদ্দী
নাটক ও চলচ্চিত্রে	অমলেশ বড়ুয়া
প্রথম সংগঠন ও পত্রিকা	কৃষ্টি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রী (শিল্প মন্ত্রী)	দিলীপ বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা শিক্ষক এম.ফিল ও পি.এইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন	ড. নীরু বড়ুয়া
সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের পরিচালক	ড. উত্তম কুমার বড়ুয়া

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের পরিষদের মহাসচিব (স্বাচিপ)	ড. উত্তম কুমার বড়ুয়া
বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনের সভাপতি	ড. কনক কান্তি বড়ুয়া
আদিবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়ে সরকারী চাকুরী এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অতিরিক্ত সচিব হন	শরদিন্দু শেখর চাকমা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আদিবাসী বৌদ্ধ শিক্ষক'	নীরু কুমার চাকমা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৌদ্ধ ভাস্কর্য	জগন্নাথ হল বুদ্ধ মূর্তি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৌদ্ধ ইতহাস ও ঐতিহ্য গবেষণা সেন্টার	সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রথম পুরুষ শিক্ষার্থী	অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রথম মহিলা শিক্ষার্থী	অধ্যাপক ড. সুনন্দা বড়ুয়া
ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের ডেপুটি ডিরেক্টর	মিসেস মিনতি চৌধুরী
শিশু একাডেমীর পরিচালক	বিপ্রদাশ বড়ুয়া
বাংলা একাডেমীর পরিচালক	সুব্রত বড়ুয়া
ডাকসুর প্রথম ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা	প্রতিভা মুৎসুদ্দি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৌদ্ধ শিক্ষার্থী (পূর্বে আহসাস উল্যাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)	অশোক কুমার বড়ুয়া ও অনিল কুমার বড়ুয়া
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৌদ্ধ শিক্ষক	তিনকড়ি বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী	ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া
সুমিতো কর্পোরেশন লিমিটেডের উপমহাব্যবস্থাপক	সুষেন চন্দ্র বড়ুয়া
জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের দুই বার অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক	প্রভাস চন্দ্র বড়ুয়া
বিকেএমইর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	সুলভ চৌধুরী
ঢাকায় রেডিও প্রথম ত্রিপিটক পাঠ করেন	শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় বৌদ্ধ সমাজের সুধিজন থেকে সংগৃহীত

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ সৃষ্টির গৌরবের অধিকারী যে বীর বাঙালি, সমতল এলাকায় বৌদ্ধরা তার একটি অংশ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কর্মধারাকে অব্যাহত রেখে ১৯৭১ সালে নয় মাসব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।[৪৬] সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত পাকিস্তানি বাহিনীর কামান, মর্টারের শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার চারেক মানুষ একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরকে বেছে নিয়েছিল। সে সময় ২৬ শে মার্চ এবং ২ মে সেক্রেটারিয়েট ভবনে চীফ সেক্রেটারি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ লোকদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু (পরে মহাথেরো ও বর্তমান সংঘনায়ক) ও জ্ঞানদা রঞ্জন বড়ুয়া। অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে তিনি ঢাকা ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন। তিনি বিল্লাহ পরিবারের নুহেল আলম বিল্লাহ, খনু, দিদু ও লিনুকে পাকিস্তানি বাহিনী থেকে রক্ষা করেন কিন্তু বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদ ও দানবীর আর.পি সাহাকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান নিয়ে মুক্তি বাহিনী ও মিত্র বাহিনী ঢাকা শহরের একাধিক অপারেশন চালিয়েছেন।[৪৭]

মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো বৌদ্ধদের জানমাল রক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালান। তিনি শুধু বৌদ্ধদের রক্ষার্থে কাজে যাননি। তিনি হিন্দু পরিবারকে ধর্মান্তর করে রক্ষা করেন। জনৈক কমান্ডারসহ পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঢাকার কমলাপুর, সবুজবাগ, ঠাকুরপাড়া, আহমদবাগ এলাকার জনগণকে পাক সেনাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন।[৪৮]

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার বিভিন্নভাবে কাজ করছে। প্রথমত: ২০১৩ সাল থেকে সম্প্রীতির ইফতার বিতরণের মাধ্যমে। সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী ভিক্টর লি প্রায় ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে আসতেন। তিনি বিহার ও আশেপাশের অনাথ বাচ্চাদের খাবার কিনে দিতেন। আনুমানিক ২০১৩ সালে তখন রোজা চলছিল। বিহারের আশেপাশের মানুষগুলো রোজা রাখলেও তাদের ইফতারের ব্যবস্থা ছিল না। বিষয়টি অনুধাবন করলেন ভিক্টও লি। তখন এ দানশীল মানুষটি পুরো রমজান মাসের ইফতারের ব্যবস্থা করেন।

ছবি: বিহার অধ্যক্ষ বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরো ইফতার বিতরণ করছেন।

সে অব্দি বর্তমান পর্যন্ত ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় ৫০০ জনকে প্রতিদিন পুরো রমজান জুরে ইফতার বিতরণ করা হয়। এ সম্পর্কে শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথেরোর কাছে জানতে চাইলে কালের কণ্ঠ পত্রিকার প্রতিবেদক হোসাইন জামালকে বলেন, "আমরা সবাই বাংলাদেশী, আমাদের সবার একই রাষ্ট্র। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও প্রীতি বাড়াতে সহযোগিতা প্রয়োজন। ফলে এক ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মের শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়তে থাকে যার বিনিময়ে সমাজে শান্তি আসে।" [৪৯] দ্বিতীয়ত: আশির দশকের জাপানের আর্থিক সহায়তায় বিশুদ্ধ পানির নলকূপ স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে নলকূপটি নষ্ট হয়ে গেলে বিহারের নিজস্ব তহবিল থেকে নলকূপটি পুন:স্থাপন করা হয়। প্রতিদিন বিহারে অসংখ্য মানুষ পানি সংগ্রহ করতে আসে। বন্যার সময় যখন ওয়াসার পানি ব্যবস্থা অচল হয়ে যায় তখন একমাত্র ভরসা হলো বৌদ্ধ বিহারের বিশুদ্ধ পানি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য।[৫০] শুধু ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার নয় ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত বিহারসমূহ সমাজের উন্নয়নের জন্য নানা মানবিক কর্ম সম্পাদন করে। যেমন: শীত বস্ত্র দান, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি।

খ্রিস্টিয় ৭ম শতক থেকে ঢাকায় লোকজন বসবাস শুরু করেন এবং তখন থেকেই থেরবাদ বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা বসবাস করে আসছে। ধারণা করা হয়, ঢাকা শহরের আট-নয়শ বছর আগে ঢাকায় যে বাসিন্দারা মূর্তিপূজা করত তারাই বৌদ্ধ ছিল। এ সকল বর্ণনার পরও মূলত পূর্ব বঙ্গের এ অঞ্চলে পাল রাজাগণ রাজত্ব করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর কলকাতা থেকে বৌদ্ধরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি নতুন পথে যাত্রা আয়োজন করে। জীবন-জীবিকার তাগিদে বা লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সর্বত্র বৌদ্ধরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও ঢাকা শহরে বসবাসরত বৌদ্ধদের সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষের মত। মূলত বিভিন্ন আদমশুমারীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৯০১ সালের পূর্বে ঢাকা শহরের বৌদ্ধ অনুসারীরা হিন্দুদের সাথে গণনা করা হয়। মূলত ১৯৭১ সালের পরবর্তী সময় থেকে ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের ব্যাপ্তি, সম্পৃক্ততা এবং গুরুত্ব বেড়ে যায়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, *পালি-বাংলা অভিধান দ্বিতীয় খণ্ড, (প থেকে হ পর্যন্ত)*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৮, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ১১৬৫

২. প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, *বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: ২০০৮), পৃ. ২

৩. মতিউর রহমান, প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশ: একটি পর্যালোচনা, http://index.org.bd/index/printarticle/evolution-of-buddhism-in-ancient-bengal:-a-historical-review, ৮ মে, ২০১৮

৪. 'ঢাকা জেলা', http://www.dhaka.gov.bd, ১৪.১২.১৮

৫. মোঃ খালেকুজ্জামান, *বিজন জনপদ থেকে রাজধানী ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০২, দিব্য প্রকাশ), পৃ. ২৭

৬. আবদুল করিম, অনুবাদক মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, *মোগল রাজধানী ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি), পৃ. ২

৭. আমাতুল খালেক বেগম, *আমার দেখা ঢাকা শহর*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১১, জোৎস্না পাবলিশার্স), পৃ. ১১ ও ১৩

৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, লেজিসটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১, পৃ. ২

৯. আহমেদ মীর্জা খবীর, *শতবর্ষের ঢাকা*, প্রথম সংকলন (ঢাকা: ১৯৯৫, কমন পাবলিকেসন্স), পৃ. ৪

১০. মোহাম্মদ মুমিনুল হক, *বাংলার ইতিবৃত্ত*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৬, গতিধারা প্রকাশনী), পৃ. ৬৭

১১. যতীন্দ্রমোহন রায় ও কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, প্রথম দে'জ সংস্করণ (কলকাতা: ১৯১২, দে'জ পাবলিশিং), পৃ. ২৩ ও ২৪

১২. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ঢাক থেকে ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৩, উত্তরণ), পৃ. ১৫

১৩. মাহবুবুর রহমান, *বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৩, মেরিট ফেয়ার), পৃ. ১৩৪

১৪. প্রাগুক্ত, *শতবর্ষের ঢাকা*, পৃ. ২২

১৫. আবদুল মমিন চৌধুরী, 'ঢাকা', মানচিত্র ৫, https://bnbanglapedia.org, ডিসেম্বর ২৪, ২০১৪

১৬. প্রাগুক্ত, *শতবর্ষের ঢাকা*, পৃ. ১৯

১৭. Full text of " Mahabharat"-Internet Archivehttps://archive.org>stream>2015

১৮. এস.এম রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, *সেন যুগ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০১, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৮

১৯. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বিজন জনপদ থেকে রাজধানী*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০২, দিব্য প্রকাশ), পৃ. ৩২ ও ৩৩

২০. অম্বিকাচরণ ঘোষ ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ (২০১৮: ঢাকা, বইপত্র প্রকাশনী), পৃ. ৭২

২১. R.C.Mojumder, *The History of Bengal, Vol.1*, 1st edition, 1943, পৃ. ১২

২২. প্রাগুক্ত, *বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস*, পৃ. ৩৬, উদ্ধৃত, জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৪ ও ৫

২৩. কাবেদুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠী*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৪, উত্তরণ), পৃ. ২৯

২৪. নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ (ঢাকা: ১৯৯৫, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র), পৃ. ৪৪

২৫. মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *আবাহমান বাংলা*, (ঢাকা: ফাল্গুন ১৩৯৯) পৃ. ৪৫

২৬. মোঃ মোশারফ হোসেন, ড. নীরু শামসুন্নাহার, *সেই ঢাকা এই ঢাকা শহর ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৯, র‍্যমন পাবলিশার্স), পৃ. মুখবন্ধ

২৭. মো. আজহারুল ইসলাম, *বিক্রমপুর: ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব (৩য় খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৫, সুলেখা প্রকাশনী), পৃ. ১১৫

২৮. প্রাগুক্ত, *কিংবদন্তী ঢাকা*, পৃ. ৫২

২৯. প্রাগুক্ত, *কিংবদন্তী ঢাকা*, পৃ.২

৩০. হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৪৫

৩১. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, *অখণ্ড*, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৩, অন্যান্য), পৃ. ৩৮৩

৩২. 'মগদের বসতি ছিল মগবাজারে', https://archive1.ittefaq.com.bd, ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬

৩৩. রক্তিম বড়ুয়া, *বড়ুয়া জাতির আত্মপরিচয়* (চট্টগ্রাম: ২০১৯), পৃ. ১০৩ ও ১০৪

৩৪. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা: ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি) পৃ. ২৪

৩৫. প্রাগুক্ত, *বঙ্গে মগ ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার*, পৃ. ৩৪

৩৬. জগন্নাথ বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা* (খুলনা: ২০১৭, গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট), পৃ. ৪৮

৩৭. চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ বড়ুয়া নামে পরিচিত। মগধ ও বজ্জি থেকে আগত শরণার্থী বৌদ্ধরা দীর্ঘ পথযাত্রায় চট্টগ্রামসহ পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলার আদি বাঙালি বৌদ্ধদের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে একাত্ম হয়ে যায় এবং ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বড়ুয়া বৌদ্ধদের সাথে আত্মীকরণ হয়। বৌদ্ধ গবেষক প্রফেসর ড. আবদুল মাবুদ খান বলেন, "বড়ুয়া বৌদ্ধদের সাথে সন্নিহিত আরাকানী বৌদ্ধদের বৈবাহিক ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন এবং উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে প্রধান ধর্মীয় গুরু সংঘরাজ সারমেধ বা সারমিত্রের থেরবাদী সংস্কার আন্দোলনের ও প্রচারের ফলে বাংলার তান্ত্রিক বা মহাযানী ধারায় লালিত বৌদ্ধরা থেরবাদী দীক্ষা গ্রহণ করেন।" নতুন চন্দ্র বড়ুয়া, *চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ (চট্টগ্রাম: ১৯৮৬), পৃ. ৩৫

৩৮. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০২০, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন), পৃ. ২৩ ও ২৪

৩৯. KAMAL SIDDIQUI, JAMSHED AHMED, KANIZ SIDDIQUE, SAYEEDUL HUQ, ABUL HOSSAIN, SHAH NAZIMUD-DOULA AND NAHID REZAWANA, *Social Formation in Dhaka,* 1985-2005*, A Longitudinal Study of Society in a Third World Megacity* (Routledge Taylor & francis Group LONDON AND NEW YORK: 2010), Pg. 315-316.

৪০. প্রাগুক্ত, *কিংবদন্তী ঢাকা*, পৃ. ২৮৩ ও ২৮৪

৪১. তোফায়েল, *বরেণ্য বাঙ্গালী*, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা: ১৯৮৯, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র), পৃ. ৭

৪২. দীপানন্দ ভিক্ষু, 'আলো পাচ্ছে অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান', http://www.thebuddhisttimes.com/. ১৮-১২-২০১৮

৪৩. ইফতিখার-উল-আউয়াল সম্পাদিত, *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৩, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর), পৃ. ৪৪১

৪৪. প্রাগুক্ত, *মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম*, পৃ. ৯২

৪৫. জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৫২

৪৬. সুনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৩২৫

৪৭. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৫, ১৬ ও ১৮

৪৮. প্রাগুক্ত, জগন্নাথ বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা* (খুলনা: ২০১৭, গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট), পৃ. ৪৮

৪৯. হোসাইন জামাল, একজন ভিক্টর লি ও বৌদ্ধ মহাবিহার, http://www.kalerkantho.com/print-edition., ১৩ জুলাই ২০১৫

৫০. সাম্যের প্রতিক ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, মাসিক কৃষ্টিতে প্রকাশিত। http://www.amader-kotha.com, ১৫ জানু., ২০১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢাকা শহরের বৌদ্ধ জনসংখ্যার ধারণা

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনের একান্ত প্রয়োজনেই বসতির সৃষ্টি। সম্ভবত, বেঁচে থাকার তাগিদে,আত্মরক্ষা বা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই বসতির সূচনা হয়েছিল। তাই দেখা যায়, পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ বসতি স্থাপন, পথ-ঘাটের অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন গৃহে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনমণ্ডলীর যে সমাবেশ গড়ে ওঠে তাকে বসতি বলা হয়। আবদুল বাকী তাঁর *গ্রামীন বসতি* (ঢাকা: ২০১১) বইয়ে এভাবেই জনবসতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন: কোন একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তাকেই বলে জনবসতি। এ জনবসতি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে ওঠে এবংবিভিন্ন উপাদানের ওপর ভিত্তি করে এ বসতিগুলো গড়ে উঠে। এদের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি ও স্থানীয় মানুষের কারিগরি উন্নতি অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। আবার লোক বসতির চাপ ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে জনবসতির আকার পরিবর্তিত হয়। সকল ক্ষেত্রেই বসতি একটি যাতায়াত ও বাসস্থানের সুবিধা বিশিষ্ট মনুষ্য উপনিবেশ।

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার জনবসতি দেখা গেলেও আকৃতির জটিলতা, গঠন ও কার্যাবলির উপর নির্ভর করে জনবসতিগুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ পাই আরিফুর রহমানের *গ্রামীন ভূগোল* (ঢাকা: ২০১৫) বইয়ের পৃ. ৭২:

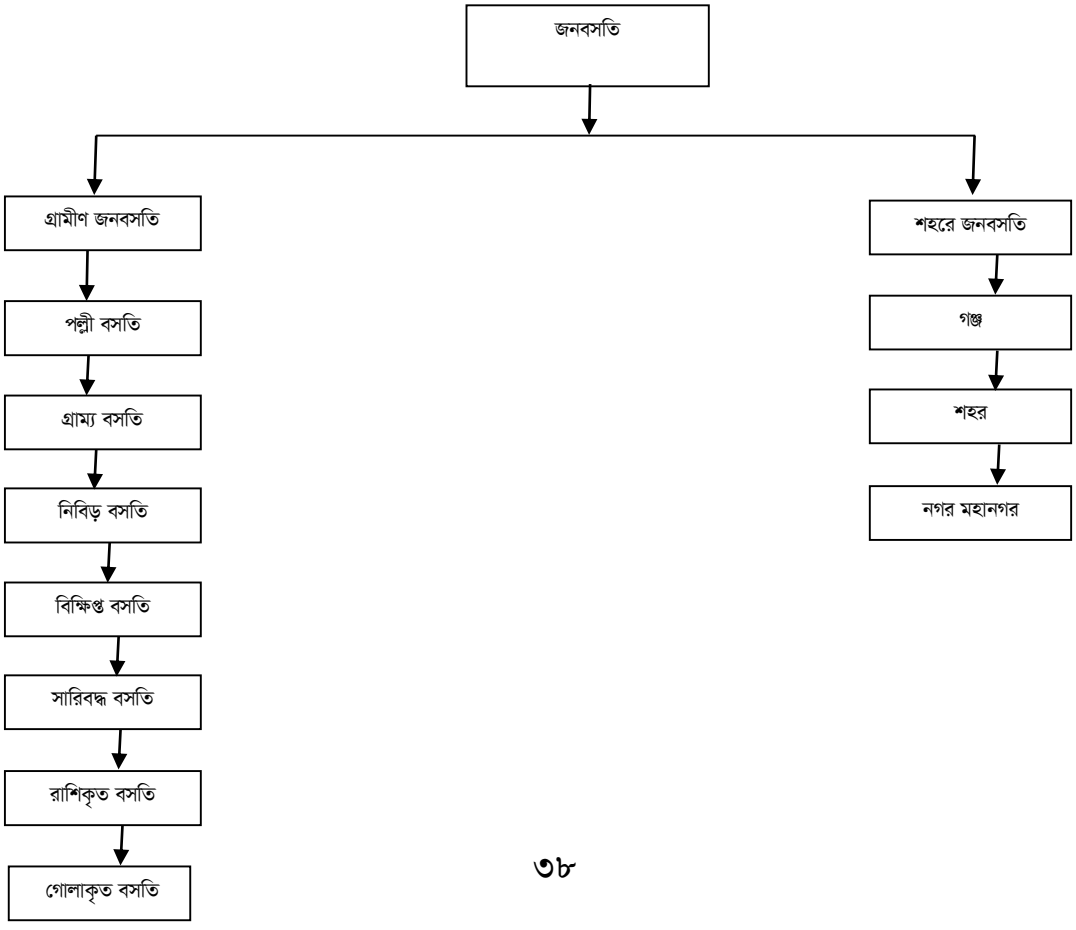

সাধারণত প্রাথমিক উপজীবিকার উপর নির্ভরশীল কোন জনগোষ্ঠীর বসতিকে গ্রামীণ জনবসতি বলা হয়। এক্ষেত্রে গ্রামীণ বসতির অধিবাসীরা প্রধানত কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য শিকার, মৎস্য চাষ প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত থাকে অর্থাৎ তাদের জীবিকা নিতান্তই ভূমি নির্ভর। পানির প্রাচুর্য, কৃষিযোগ্য ভূমি, গো-চারণভূমি, জ্বালানি, বাড়ি নির্মাণের উপকরণ প্রভৃতির প্রভাবে গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠে। অপরদিকে যদি কোন বিশাল জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এলাকায় নানা প্রকার অকৃষি পেশায় অর্থাৎ চাকুরি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট বসতি গড়ে তোলে তবে তাকে শহরে বসতি বলা হয়। এ বসতি অঞ্চলে বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে।

উল্লেখ্য যে, যখন ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে ওঠে এবং ক্রমেই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে তখন সে বসতিকে গঞ্জ বলা হয়। অর্থাৎ শহর গড়ে উঠার প্রাথমিক অবস্থা হল গঞ্জ। শিল্পকর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য, বিপণি কেন্দ্র, শিক্ষা, প্রশাসন প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে শহর বসতি গড়ে ওঠে। তাই শহর বসতির মানুষের পেশা বহু বৈচিত্রময়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শহর বসতিকে নগর বসতি বলা হয় যেখানে বিভিন্ন ধরনের উপ-জীবিকা ও প্রচুর কর্মসংস্থানের ফলে শহর প্রসারিত হয়ে নগরে পরিণত হয়।[১] যেহেতু মানুষ নানা বিষয়ে একে অপরের উপর নির্ভরশীল সেহেতু এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মানব সমাজ গড়ে উঠেছে। জনসমষ্টি যখন তাদের সভ্য জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয় তখন সামাজিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সামাজিক জীবন মানুষকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণের কোনো রকম লিখিত আইন-কানুনের প্রয়োজন হয় না; বরং প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার, রীতিনীতি নিজ থেকেই গড়ে ওঠে। মানুষকে বহুমুখী জীবনযাপন করতে হয় এবং এই বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মানুষ সমাজ দেহের মধ্যে ছোট-বড় অনেক প্রকার সংঘ বা সংগঠন গড়ে তোলে।[২]

মানুষকে কেন্দ্র করে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র গঠিত হয়। সুতরাং একটি রাষ্ট্রের বা মানবীয় ভূগোলের অপরিহার্য বিষয় হল জনসংখ্যা। সেক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট এলাকার একক জনগোষ্ঠীকে সে এলাকার জনসংখ্যা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো দেশের ছেলে-মেয়ে ও পুরুষ-মহিলা মিলে যত লোক বাস করে তাদের সমষ্টি হল ঐ দেশের জনসংখ্যা। আবার, জনসংখ্যা বলতে একই স্থানে একসাথে বসবাসকারী জীবিত সংখ্যাকে বোঝায়। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বলতে আমরা বুঝি, ঢাকা শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা। এই মানুষদের আবার বাসিন্দা বা অধিবাসীও বলা হয়। ঢাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সৈনিক, কারখানা মালিক, বণিক এবং বিভিন্ন শ্রেণির চাকুরিজীবীরা এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ।[৩]

জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একদল মানব বা মনুষ্য সত্ত্বাকে জনসংখ্যা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া একটি অঞ্চলের সকল অধিবাসী বা কোন অঞ্চলের বিশেষ শ্রেণিভুক্ত অধিবাসী অথবা একটি এলাকায় বসবাসকারীদের সংখ্যা এর অন্তর্ভুক্ত।[৪] *The Social Work Dictionary* তে বলা হয়, জনসংখ্যা হল- The Social Work nation or other specified geographic region; also the number of people of a specified class or group (such as women, Roman Catholics, black people and disabled people) is a specified place or geaographical region).[৫] অর্থাৎ, কোনো একটি জাতির অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মোট জনসংখ্যা যা একটি বিশেষ শ্রেণির বা দলের, যেমন- নারী, রোমান ক্যাথলিক, কৃষ্ণাঙ্গ, পঙ্গুদের চিহ্নিত করে এমন একটি বিশেষ এলাকা।[৬] অন্যভাবে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পর সম্পর্কিত ও সংঘবদ্ধভাবে বসবাসরত বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের সমষ্টিকে জনসংখ্যা বা জনসমষ্টি বলা হয়। এ জনসংখ্যা নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের প্রাকৃতিক প্রতিবেশ, সমাজ ব্যবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা, জন্ম-মৃত্যু, স্থানান্তর, গমনাগমন এবং ইত্যাকার অন্যবিধ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৭]

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৯ শতাংশ সুন্নি মুসলমান এবং ১০ শতাংশ হিন্দু। জনসংখ্যার বাকি অংশ মূলত খ্রিস্টান, বেশিরভাগ রোমান ক্যাথলিক এবং হীনযান- থেরবাদী বৌদ্ধ। অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলমান, বাহাই, সর্বপ্রাণবাদী, আহমদিয়া মুসলিম, অজ্ঞেয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদী রয়েছেন। এসব সম্প্রদায়ের অনেকে অনুমান করে থাকেন, তাদের স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের অনুসারীর সংখ্যা কয়েক হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে। জাতিগত সংখ্যালঘুর অনেকে সংখ্যালঘুদের ধর্ম চর্চা করেন এবং প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এদের সংখ্যা বেশি। যেমন, ময়মনসিংহের গারোরা মূলত খ্রিস্টান, গাইবান্ধার সাঁওতালরাও তাই। আবার বেশির ভাগ বৌদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য। সুতরাং, বাঙালি ও জাতিগত সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায় সারাদেশে বাস করছে। তবে বরিশাল, গৌরনদী, বানিয়াচর, মনিপুরি পাড়া, খ্রিস্টানপাড়া, গাজীপুর এবং খুলনায় এদের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।[৮]

১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে বাংলাদেশের তৃতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম এবং এদেশের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মাঝে থেরবাদ প্রচলিত। বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ০.৭ শতাংশ বৌদ্ধ।[৯] এদের ৬৫ শতাংশের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, যেখানে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গা ও আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মবিশ্বাস ও চট্টগ্রামে ৩৫ শতাংশ আদি বাঙালি বড়ুয়াদের বসবাস। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকা, বরগুনা ও পটুয়াখালীতে বৌদ্ধদের বসবাস রয়েছে।[১০] চাকমা (৪ লাখ ৪৪ হাজার ৭৪৮ জন), মারমা (২ লাখ ২ হাজার জন), রাখাইন (১৩ হাজার ২৫৪ জন), তঞ্চঙ্গা (৪৪ হাজার ২৫৪ জন), চাক (দুই হাজার ৮৯৯ জন), খুঁমি (তিন হাজার ৩৬৯

জন), খ্যাং (তিন হাজার ৮৯৯ জন), ওঁড়াও (৮০ হাজার ৩৮৬ জন) এবং মুরংয়ের সংখ্যার নির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই।[১১] তবে ঢাকা সদরে বসবাসরত বৌদ্ধদের সংখ্যা ১৫,০০০ (আনুমানিক)।[১২]

মানুষের গতিশীলতা বিভিন্ন কারণে অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত ও চিহ্নিত এবং বিভিন্ন স্বার্থে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমন করে। মানুষের এই গমনাগমন প্রক্রিয়াকেই সাধারণত স্থানান্তর বলে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান যুগে নগরায়ণ[১৩] প্রবণতা খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে মানুষ ক্রমশঃ নগরমুখী হচ্ছে।[১৪] সেরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী মন্ত্রাণালয়, অধিদপ্তর, বেসরকারী কোম্পানী, হাসপাতাল, ব্যাংক-বীমা অফিসের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সব ঢাকা কেন্দ্রিক। এছাড়াও বহু বিদেশী দূতাবাসও রয়েছে এখানে। অন্যদিকে শহরের মধ্যে এবং এর আশেপাশে গড়ে উঠা শিল্প-কারখানা, একে বাণিজ্যিক শহরের চেহারা দিয়েছে যা বৌদ্ধ তথা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ঢাকা শহরমুখী হওয়ার অন্যতম কারণ।

ঢাকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঢাকার জনসংখ্যা বাড়তে থাকে ১৬১০ সালে সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী ঘোষণার পর। মোঘল আমলে ঢাকার নাটকীয় উত্থান ও উন্নয়ন হয়েছিল বেশ কিছু কারণে। বিশেষভাবে, ঢাকার সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান, রাজধানী হিসেবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব, সমৃদ্ধ অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্য এবং এর বিখ্যাত উৎপাদন দ্রব্য বিশেষত মসলিনের জন্য। ঢাকার সমৃদ্ধির শীর্ষ সময়ে অর্থাৎ শহরতলিসহ ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা ধরা হয় প্রায় ৯ লাখ। এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সৈনিক, কারখানার মালিক, বণিক এবং বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমজীবী ও চাকুরিজীবী মানুষ। অধিবাসীদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ। মূল নগরী বিস্তৃত ছিল বুড়িগঙ্গা বরাবর ৭-১০ মাইল এবং অভ্যন্তরীণ ভাগে আড়াই মাইল দক্ষিণে অন্যদিকে পশ্চিমে মিরপুর-জাফরাবাদ থকে ১০ মাইল এবং পূর্বে পোস্তগোলা পর্যন্ত। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ আমলে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারিয়ে একটা সাধারণ জেলায় পরিণত হয় এবং নগরের এলাকা ও জনসংখ্যা উভয়ই কমতে থাকে। ১৮৩৭ সালে সরকারী বিবরণ মতে, ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৬০,৬১৭ জন, তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ১৫,৭৩৫ জন ও মহিলা ১২,৪১৯ জন এবং মুসলমান পুরুষ ১৫, ৬৮৭ ও মহিলা ১৬,৭৭৬ জন।[১৫] ঢাকা শহরের কিছু কিছু এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের প্রাধান্য দেখা যায়। কারণ যে সমস্ত জায়গায় অধিক বৌদ্ধ জনসংখ্যা দেখা যায় সেখানেই আশে-পাশে বৌদ্ধ বিহার রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ১৮০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ঢাকা শহরের জনসংখ্যা সারণির মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হল[১৬]:

সারণি-২.১

সাল	জনসংখ্যা
১৮০১	২ লাখ
১৮৪০	৫১ হাজার ছয়শ ৩৬ জন
১৯৭০	১৮ লাখ
১৯৮১	৪০ লাখ ২৩ হাজার ৮৮৩ জন
১৯৯১	৬৮ লাখ ১১ হাজার
২০০১	৮৩ লাখ ৭৮ হাজার ৫৯
২০১১	এক কোটি ৩০ লাখ

১৮০১ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে ঢাকার নিকটবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ বহু এলাকা যেমন: নারিন্দা, ফরিদাবাদ, উয়ারী ও আলমগঞ্জ অনেকাংশেই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কিন্তু ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে ঢাকার প্রশাসনিক গুরুত্ব নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন একটি প্রদেশের রাজধানী করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এটির জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর থেকেই মূলত ঢাকার জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকে এবং এখন পর্যন্ত কাজের জন্য, শিক্ষার প্রয়োজনে ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ ঢাকায় আসে। আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কারণে আমাদের অর্থনীতি, বাণিজ্য ঢাকাকেন্দ্রিক। এছাড়া আমাদের সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঢাকা কেন্দ্রিক এমনকি রাজনীতিও ঢাকা কেন্দ্রিক।

শ্রী কেদারনাথ মজুমদার উল্লেখ করেছেন,[১৭] ১৯০১ সালে ঢাকা জেলার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মোট জনসংখ্যা সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২.২

ধর্মাবলম্বী	মোট	পুরুষ	নারী
হিন্দু	৯৮৮০৭৫	৪৮৭২৭৪	৫০০৮০১
ব্রাহ্মণ	২২১	১১০	১১১
মুসলমান	১৬৪৯৬৩৯	৮১৯৫৮৭	৮৩০০৫২
খ্রিস্টান	১১৫৬৬	৫৪১৯	৬১৩৭
বৌদ্ধ	৩০	২৬	৪
প্রতোপাসক	১	১	--

উপরের সারণিতে লক্ষ করলে দেখা যায়, ১৯০১ সালে ঢাকা জেলায় বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল মোট ৩০ জন। তন্মধ্যে ২৬ জন ছিল পুরুষ এবং ৪ জন নারী।

১৮০১ খ্রি. ঢাকা জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৯,৩৮,৭৪২ জন যদিও তখন বাকরগঞ্জ এবং ফরিদপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২৪ খ্রি. পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট গণনা করেন তখন ছিল ৫,১২,৩৮৫ জন, ১৮৫১ সালে হয় ৬০,০০০ জন এবং ১৮৬৮-৬৯ খ্রি. রেভিনিউ বোর্ডের লোকসংখ্যা ১০,১৯,৯২৮ জন ধার্য হয়। পরবর্তীতে ১৮৭২ সালে গর্ভমেন্ট থেকে ১৮,৫২,৯৯৩ জন নির্ধারিত হয়। এরপর ১০ বছর অন্তর অন্তর জনসংখ্যা গণনা করা হয়। ১৮৮১ খ্রি. ২১,১৬,৩৫০ জন, ১৮৯১ সালে ২৩,৯৫,৪৩০ জন ও ১৯০১ সালে ২৬,৪৯,৫২২ জন ছিল।

১৯০১ সালে ঢাকা জেলার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মাত্র ৩০ জন ছিল। এদের মধ্যে মগ ১৫ জন, ব্রহ্ম দেশীয় ১২ জন ও চীন দেশীয় ৪ জন।[১৮] এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৯০১ সালে ঢাকায় বৌদ্ধরা ও আদিবাসী বৌদ্ধ মগরা ছিলেন। এমনকি ১৮৭২ সালে ঢাকায় ওঁড়াও সম্প্রদায়ের ২ জন ছিল।[১৯]

ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ঢাকার জনসংখ্যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল সারণির মাধ্যমে[২০]:

সারণি-২.৩

বৎসর	ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা	উৎস
১৭০০	৯০০	জেমস টেইলর
১৮০০	২০,০০০	ঐ
১৮১৪	২০০,০০০	ডয়লী
১৮২৪	৩০০,০০০	বিশপ হেবার
১৮৩৮	৬৮, ৩৩৮	ঐ
১৮৬৭	৫১, ৬৩৫	রেনেল
১৮৭২	৬৯, ২১২	সেন্সাস অব পাকিস্তান
১৮৮১	৮০,৩৫৮	ঐ
১৯৯১	৮৩, ৩৫৮	ঐ
১৯০১	১০৪, ৩৮৫	ঐ
১৯১১	১২৫১, ৭৩৩	ঐ
১৯২১	১৩৭, ৯০৮	ঐ
১৯৩১	১৬১, ৯২২	ঐ
১৯৪১	২৩৯, ৭২৮	ঐ
১৯৫১	৩৩৫, ৯২৮	ঐ
১৯৬১	৫৬০, ১৪৩	সেন্সাস অব পাকিস্তান, ১৯৬১

উপরের সারণি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১৭০০ খ্রি. ৯০০ জন ছিল। সারণিতে সর্বশেষ ১৯৬১ সালের মোট জনসংখ্যা ৫,৬০,১৪৩ জন ছিল। উল্লেখ্য বছরের সাথে তাল মিলিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পেয়েছে। সারণির তথ্যগুলো জেমস টেলর, ডয়লী, বিশপ হেবার, রেনেল এবং সেন্সাস অব পাকিস্তান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ধর্ম অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাত (শতকরায়), ১৯০১-২০০১ নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো[২১]:

সারণি-২.৪

শুমারী বছর	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
১৯০১	১০০.০	৬৬.১	৩৩.০	----	-----	০.৯
১৯১১	১০০.০	৬৭.২	৩১.৫	-----	-----	১.৩
১৯২১	১০০.০	৬৮.১	৩০.৬	-----	-----	১.৩
১৯৩১	১০০.০	৬৯.৫	২৯.৪	-----	০.২	১.০
১৯৪১	১০০.০	৭০.৩	২৮.০	-----	০.১	১.৬
১৯৫১	১০০.০	৭৬.৯	২২.০	০.৭	০.৩	০.১
১৯৬১	১০০.০	৮০.৪	১৮.৫	০.৭	০.৩	০.১
১৯৭৪	১০০.০	৮৫.৪	১৩.৫	০.৬	০.৩	০.৩
১৯৮১	১০০.০	৮৬.৭	১২.১	০.৬	০.৩	০.৩
১৯৯১	১০০.০	৮৮.৩	১০.৫	০.৬	০.৩	০.৩
২০০১	১০০.০	৮৯.৭	৯.২	০.৭	০.৩	০.২

বাংলাপিডিয়া থেকে নেয়া উপযুক্ত সারণি থেকে বোঝা যায়, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১, ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালে ঢাকায় শতকরায় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যণীয় ভাবে দেখা যায়নি। ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে ০.৭ শতাংশ ছিল। ১৯৬১, ১৯৭৪, ১৯৮১ এবং ১৯৯১ সালে বৌদ্ধ জনসংখ্যা ০.১ শতাংশ কমে গিয়ে ০.৬ শতাংশ হয়। ২০০১ সালে আবারও ০.৭ শতাংশ হয়।

জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ১৯০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর ধর্মভিত্তিক জরিপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ১৯৭১ সালে যে জরিপ করা সম্ভব হয়নি সেটা ১৯৭৪ সালে সম্পন্ন করা হয়।[২২]

১৮৭২-১৯৫১ সময় পর্বে ঢাকায় হিন্দু ও মুসলমানরাই ছিল প্রধান ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় এবং তারা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৯%। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, ইহুদি ইত্যাদির অনুসারী পাওয়া যায়। হেনরি ওয়ালটারস ও জেমস টেইলরের শুমারিতে মুসলমানদের শতকরা হার হিন্দুদের তুলনায় বেশি ছিল। ১৮৩০

সালে মুসলমানদের শতকরা হার ৫২.৬০ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৩৮ সালে হয় ৫৩.৫৫ এবং হিন্দুদের শতকরা হার ১৮৩০ সালের ৪৬.৯২ থেকে সামান্য কমে ১৮৩৮ সালে হয় ৪৬.৪৪।

ঢাকা শহরের ধর্মভিত্তিক মানুষের সংখ্যা ও শতকরা হার নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ১৮৭২-১৯৫১[২৩]:

সারণি-২.৫

বছর	হিন্দু		মুসলমান		বৌদ্ধ		খ্রিস্টান		শিখ		জৈন		ইহুদি		অন্যান্য	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৮৭২	৩৪,৪৩৩	৪৯.৭৫	৩৪,২৭০	৪৯.৫২	৪	.০০৬	৪৭৯	.৬৯	--	--	--	--	--	--	২১	.০৩
১৮৮১	৩৯,৬৩৫	৫০.১২	৩৮,৯১৩	৪৯.২০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	৫২৮	.৬৮
১৮৯১	৪২,০৩৩	৫০.৪৪	৪০,৮২৭	৪৯.০০	--	--	৪৬৭	.৫৬	--	--	--	--	--	--	--	--
১৯০১	৪৮,৬৬৮	৫৩.৭৫	৪১,৩৬১	৪৫.৬৮	২৮	.০৩	৪৮৪	.৫৩	--	--	--	--	--	--	--	--
১৯১১	৫৯,৯৯৪	৫৫.২৬	৪৭,২৯৫	৪৩.৫৭	৮৫	.০৮	৮৯৮	.৮৩	১৬	.০১	--	--	--	--	২৫৪	.২৩
১৯২১	৬৯,১৪৫	৫৭.৮৯	৪৯,৩২৫	৪১.২৯	১২	.০১	৭১০	.৫৯	৫৭	.০৪	৫	.০০৪	৯	.০০৩	১৯২	.১৬
১৯৩১	৮০,০২৪	৫৭.৭৭	৫৭,৭৬৪	৪১.৭০	২৬	.০১	৬৮৩	.৪৯	১৬	.০১	৫	.০০৪	৪	.০০৩	--	--
১৯৪১	১,২৯,২৩৩	৬০.৬১	৮২,৬৯৩	৩৮.৭৮	--	--	৩৪৯	.১৬	৫৩	.০২	--	--	--	--	৮৯০	.৪২
১৯৫১	৬৩,০৫৮	১৫.৬০	৩,৩৯,৯৬৮	৮৪.০৯	--	--	--	--	--	.০২	--	--	--	--	১১২৭৫	৩৩.১

উপরের সারণি থেকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, ১৮৭২-১৮৯১ খ্রি. পর্যন্ত শতকরায় বৌদ্ধদের পাওয়া যায়নি। সে সময় যারা ঢাকায় ছিলেন তাদেরকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সাথে হিসাবে যুক্ত করা হতো। ১৯০১ সালে ২৮ জনের কথা উল্লেখ আছে, যা শতকরায় .০৩%, ১৯১১ সালে ৮৫ জন শতকরায় .০৮%, ১৯২১ সালে ১২ জন শতকরায় .০১%, ১৯৩১ সালে ২৬ জন শতকরায় .০১%। সারণিতে দেখা যায়, ১৯৪১ ও ১৯৫১ সালে বৌদ্ধদের সংখ্যার উল্লেখ নেই।

১৯৫১ সালের বিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও শতকরা নিচের সারণিতে দেখানো হলো[২৪]:

সারণি-২.৬

বিভাগের নাম	সংখ্যা						শতকরা					
	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৪১৯৩২৩২৯	৩২২২৬৬৩৯	৯২৩৯৬০৩	৩১৮৯৫১	১০৬৫০৭	৪০৬২৯	১০০.০০	৭৬.৮৫	২২.৩৪	০.৭৬	০.২৫	০.১০
বরিশাল	৩৬৪২১৮৫	২৮৯৭৭৬৯	৭১৬৫৪৩	১৬৩৯৪	১১৩৪৫	১৩৪	১০০.০০	৭৯.৫৬	১৯.৬৭	০.৪৫	০.৩১	০.০১
চট্টগ্রাম	১১৭২১৭৭০	৮৮৭৯০৯৪	২৪৯৯৪১২	৩০১৩৯৭	১২৩৫৫	২৯৫১২	১০০.০০	৭৫.৭৫	২১.৩২	২.৫৭	০.১১	০.২৫
ঢাকা	১২৬৩১৮৭১	৯৯৭৬১৪২	২৫৮৪২৭৪	৮৩১	৬১৪৯৭	৯১২৭	১০০.০০	৭৮.৯৭	২০.৪৬	০.০১	০.৪৯	০.০৭
খুলনা	৪৫৯৮০৫০	৩০৬০৫৪০	১৫২৭৪২৮	৮১	৯৬৬৫	৩৩৬	১০০.০০	৬৬.৫৬	৩৩.২২	০.০০	০.২১	০.০১
রাজশাহী	৯৩৩৮৪৫৩	৭৪১৩০৯৪	১৯১১৯৪৬	২৪৮	১১৬৪৫	১৫২০	১০০.০০	৭৯.৩৮	২০.৪৭	০.০০	০.১৩	০.০২

উপরের সারণিতে ১৯৫১ সালের বিভাগ ভিত্তিক ধর্মাবলম্বীর কথা উল্লেখ রয়েছে। এখানে আমি বিভাগ ভিত্তিক মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ও শতকরা নিয়ে আলোচনা করব। তখন বাংলাদেশে মোট ৩,১৮,৯৫১ জন বৌদ্ধ ছিল, যা শতকরা মোট জনসংখ্যার ০.৭৬% ছিল। বরিশালে মোট বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল ১৬,৩৯৪ জন যা শতকরা ০.৪৫%। চট্টগ্রামে ৩,০১৩৯৭ জন, শতকরায় ২.৫৭%। ঢাকায় মোট জনসংখ্যার বৌদ্ধ ছিল ৮৩১ জন, শতকরায় ০.০১%। খুলনায় ৮১ জন, শতকরায় ০.০০%। রাজশাহীতে২৪৮ জন বৌদ্ধ ছিল যা শতকরায় ০.০০%। সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধ চট্টগ্রাম বিভাগে এবং পরের স্থান বরিশাল বিভাগে, ঢাকা বিভাগে এবং সর্বশেষ রাজশাহী বিভাগে।

১৯৬১ সালের বিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মালম্বীর জনসংখ্যা ও শতকরা নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো[২৫]:

সারণি-২.৭

বিভাগের নাম	সংখ্যা						শতকরা					
	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৫০৮৪০২৩৫	৪০৮৯০৪৮১	৯৩৭৯৬৬৯	৩৭৩৮৬৭	১৪৮৯০৩	৪৭৩১৫	১০০.০০	৮০.৪৩	১৮.৪৫	০.৭৪	০.২৯	০.০৯
বরিশাল	৪২৬১৭৬৭	৩৪৯৬৫২৮	৭৪০৫৮৩	১২২৭৮	১২৩৭৮	-	১০০.০০	৮২.০৪	১৭.৩৮	০.২৯	০.২৯	-
চট্টগ্রাম	১৩৬২৯৬৫০	১০৮৪৮৬০৩	২৩৯২৭৫৭	৩৫৮৪৬৯	২০৪৭৭	৯৩৪৪	১০০.০০	৭৯.৬০	১৭.৫৫	২.৬৩	০.১৫	০.০৭
ঢাকা	১৫২৮৩৫৯৬	১২৬৬৯৭৪৬	২৫২৯৭৫১	১০৩০	৭৭৬৪৯	১৫৪২০	১০০.০০	৮২.৮৪	১৬.৫৪	০.০১	০.৪১	০.১০
খুলনা	৫৮০০৫১	৪১২০৭৭১	১৬৬৭৪৩৭	৩৪৫	১৫২৫৮	১৩২২	১০০.০০	৭০.৯৯	২৮.৭২	০.০১	০.২৬	০.০২
রাজশাহী	১১৮৫০০৮৯	৯৭৫৪৮৩৩	২০৪৯১৪১	১৭৪৫	২৩১৪১	২১২২৯	১০০.০০	৮২.৩২	১৭.২৯	০.০১	০.২০	০.১৮

১৯৬১ সালে বিভাগ ভিত্তিক ধর্মাবলম্বীর পর্যায় সারণি আলোচনা করলে পাওয়া যায়, বাংলাদেশে তখন মোট বৌদ্ধ ছিলেন ৩,৭৩,৮৬৭ জন শতকরায় ০.৭৪%। বরিশাল বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিলেন ১২,২৭৮ জন, শতকরায় ০.২৯%। চট্টগ্রামে বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিলেন ৩৫৮৪৬৯ জন, শতকরা ২.৬৩%। ঢাকা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ১০৩০ জন, শতকরা ০.০১%। খুলনা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৩৪৫ জন, শতকরা ০.০১%। রাজশাহী বিভাগে ১৭৪৫ জন, শতকরায় ০.০১%। ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছে প্রতিটি বিভাগে। বৌদ্ধ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে, সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে।

১৯৭৪ সালের বিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও শতকরা সারণি নিম্নে তুলে ধরা হলো[২৬]:

সারণি-২.৮

বিভাগের নাম	সংখ্যা						শতকরা					
	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৭১৪৭৭৭৪৮	৬১০৩৮৯২৯	৯৬৭৩০৪৮	৪৩৮৯১৭	২১৫৯১৯	১১০৯৩৫	১০০.০০	৮৫.৪০	১৩.৫৩	০.৬১	০,৩০	০.১৬
বরিশাল	৫৪২৭১৩২	৪৫৮৫৯৭৭	৮২৮৭৭৮	৪৪৭১	৫৩২৬	২৫৮০	১০০.০০	৮৪.৫০	১৫.২৭	০.০৮	০.১০	০.০৫
চট্টগ্রাম	১৮৬৩৫৯০২	১৫৮৯৪২২৩	২২৬২২০৭	৬২৭০৪২	২৮৮৯৮	২৩৫৩২	১০০.০০	৮৫.২৯	১২.১৪	২.২৯	০.১৫	০.১৩
ঢাকা	২১৩১৫৬৩০	১৮৬৬৬০৩৫	২৫১৭১৩৫	৩২২৭	১১৩৫৬৮	১৫৬৬৫	১০০.০০	৮৭.৫৭	১১.৮১	০.০২	০.৫৩	০.০৭
খুলনা	৪৭৬৭৪১৬	৬৯২০৮২৫	১৮২৩১৮৯	৫৪২	১৭৬৩৯	৫৬২১	১০০.০০	৭৮.৯৪	২০.৭৯	০.০১	০.২০	০.০৬
রাজশাহী	১৭৩৩১২৬৮	১৪৯৭১৮৭	২২৪১৭৩৮	৩৬৩৫	৫০৪৮৮	৬৩৫৩৭	১০০.০০	৮৬.৩৯	১২.৯৩	০.০২	০.২৯	০.৩৭

১৯৭৪ সালের বিভাগ ভিত্তিক ধর্মাবলম্বীর পর্যায় সারণি আলোচনা করলে পাওয়া যায় বাংলাদেশে তখন মোট বৌদ্ধ ছিলেন ৪,৩৮,৯১৭ জন, শতকরায় ০.৬১%। বরিশাল বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিলেন ৪,৪৭১ জন শতকরায় ০.০৮%। চট্টগ্রাম বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিলেন ৬,২৭,০৪২ জন, শতকরা ২.২৯%। ঢাকা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৩,২২৭ জন, শতকরা ০.০২%। খুলনা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৫৪২ জন, শতকরা ০.০১%। রাজশাহী বিভাগে ৩,৬৩৫ জন, শতকরায় ০.০২%। ১৯৭৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৬১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছে প্রতিটি বিভাগে। বৌদ্ধ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে, সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে।

১৯৮১ সালের বিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা ও শতকরা নিম্নে সারণিতে দেখানো হল[২৭]:

সারণি-২.৯

বিভাগের নাম	সংখ্যা						শতকরা					
	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৮৭১১৯৯৬৫	৭৫৪৮৬৯৮০	১০৫৭০২৪৫	৫৩৮৩৩১	২৭৪৪৮১	২৪৯৯২৮	১০০.০০	৮৬.৬৫	১২.১৩	০.৬২	০.৩১	০.২৯
বরিশাল	৬৫০৯৫৮১	৫৬০৮৬৫৭	৮৭৮৫০৩	৪১৫৮	১৫৮২৪	২৪৩৯	১০০.০০	৮৬.১৬	১৩.৫০	০.০৬	০.২৪	০.০৪
চট্টগ্রাম	২২৫৯৫৫৮৮	১৯৩৫২৮৪৮	২৬৩১০৪১	৫২৪৬১০	৪০৬৯৯	৪৬৩৯০	১০০.০০	৮৫.৬৫	১১.৬৪	২.৩২	০.১৮	০.২১
ঢাকা	২৬২৩১৭৪২	২৩৫২২৩৮৯৪	২৫৫৪৪২৬	৪৭৪৩	১২০৯২৩	২৭৭৫৬	১০০.০০	৮৯.৬৮	৯.৭৪	০.০২	০.৪৬	০.১০
খুলনা	১০৬৪৩৫২৩	২০৬৭৫১৬	২০৬৭৫১৬	১২০৪	৪৬৩৪৬	৮৩৫০	১০০.০০	৮০.০৫	১৯.৪২	০.০১	০.৪৪	০.০৮
রাজশাহী	২১১৩৯৫৩১	২৪৩৮৭৫৯	২৪৩৮৭৫৯	৩৬০১	৫০৬৮৯	১৬৪৯৯৩	১০০.০০	৮৭.৪২	১১.৫৪	০.০২	০.২৪	০.৭৮

১৯৮১ সালের বিভাগ ভিত্তিক ধর্মাবলম্বীর পর্যায় সারণি আলোচনা করলে পাওয়া যায়, বাংলাদেশে তখন মোট বৌদ্ধ ছিল ৫,৩৮,৩৩১ জন, শতকরায় ০.৬২%। বরিশাল বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিল ৪,১৫৮ জন, শতকরায় ০.০৬%। চট্টগ্রাম বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিল ৫,২৪,৬১০ জন, শতকরা ২.৩২%। ঢাকা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ছিল ৪,৭৪৩ জন, শতকরা ০.০২%। খুলনা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ১,২০৪ জন, শতকরা ০.০১%। রাজশাহী বিভাগে ৩,৬০১ জন, শতকরায় ০.০২%। ১৯৭৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছে প্রতিটি বিভাগে। বৌদ্ধ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে, সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে।

১৯৯১ সালের বিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা ও শতকরা নিম্নে সারণিতে দেখানো হল[২৮]:

সারণি-২.১০

বিভাগের নাম	সংখ্যা						শতকরা					
	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	মোট	এুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	অন্যান্য
বাংলাদেশ	১০৬৩১৪৯৯২	৯৩৮৮১০২৯	১১১৭৮৮৬৬	৬২৩৪১০	৩৪৬০৬২	২৮৫৬২৫	১০০.০০	৮৮.৩০	১০.৫১	০.৫৯	০.৩৩	০.২৭
বরিশাল	৭৪৬২৬৪৩	৬৫৭৪৫২৫	৮৬৬০৩৯	৪৬৫৭	১৪৯৯৬	২৪২৬	১০০.০০	৮৮.১০	১১.৬০	০.০৬	০.২০	০.০৩
চট্টগ্রাম	২৭২৮৭৯৪৭	২৩৭৩৬০০২	২৮৭৭৭৪৫	৫৭৪৫২৮	৫৫৩৫০	৪৪৩২২	১০০.০০	৮৬.৯৮	১০.৫৫	২.১১	০.২০	০.১৬
ঢাকা	৩২৬৬৫৯৭৫	২৯৭৮৬১০৬	২৬৫৬৭০৮	২০৪৩০	১৫৪৫১৪	৪৮২১৭	১০০.০০	৯১.১৯	৮.১৩	০.০৬	০.৪৭	০.১৫
খুলনা	১২৬৮৪৩৮৩	১০৬০৮৩৫৮	২০২৯৮৫৭	২৪৯২	৩৮২৬২	৯৪১৪	১০০.০০	৮৩.৬১	১৬.০০	০.০২	০.৩০	০.০৭
রাজশাহী	২৬২১০০৪৪	২৩১৭৬০৩৮	২৭৪৮৫১৭	২১৩০৩	৮২৯৪০	১৮১২৪৬	১০০.০০	৮৮.৪২	১০.৪৯	০.০৮	০.৩২	০.৬৯

১৯৯১ সালের বিভাগ ভিত্তিক ধর্মাবলম্বীর পর্যায় সারণি আলোচনা করলে পাওয়া যায়, বাংলাদেশে তখন মোট বৌদ্ধ ছিল ৬২৩৪১০ জন, শতকরায় ০.৫৯%। বরিশাল বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিল ৪,৬৫৭ জন, শতকরায় ০.০৬%। চট্টগ্রাম বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিল ৩৫,৮৪৬ জন, শতকরা ২.১১%। ঢাকা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ২০,৪৩০ জন, শতকরা ০.০৬%। খুলনা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ২,৪৯২ জন, শতকরা ০.০২%। রাজশাহী বিভাগে ২১,৩০৩ জন, শতকরা ০.০৮%। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছে প্রতিটি বিভাগে। বৌদ্ধ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে, সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে।

২০০১ সালের বিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা ও শতকরা নিম্নে সারণিতে দেখানো হল[২৯]:

সারণি-২.১১

বিভাগের নাম	সংখ্যা						শতকরা					
	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	অন্যান্য
বাংলাদেশ	১২৪৩৫৫২৬৩	১১১৩৯৩২৫০	১১৬০৪২৬৮	৭৭৩৯৪৯	৩৮৮৫৫	১৯০৯৪১	১০০.০০	৮৯.৫৮	৯.৩৩	০.৬২	০.৩১	০.১৫
বরিশাল	৮১৭৩৭১৮	৭৩৩৮০৮৯	৮১৬০৫১	৩৪৯২	১৪৩৪৮	১৭৩৮	১০০.০০	৮৯.৭৮	৯.৯৮	০.০৪	০.১৮	০.০২
চট্টগ্রাম	২৪২৯০৩৮৪	২১৫৭১৩৩৮	১৮৯১৯১২	৭৫৪৫৭৫	৫৩০৮৬	১৯৪৭৩	১০০.০০	৮৮.৮০	৭.৭৯	৩.১১	০.২২	০.০৮
ঢাকা	৩৯০৪৪৭১৬	৩৬১৪৬৩৭৮	২৭২৯০৭০	৮২৬৪	১৫১০৭৭	১৫৯২৭	১০০.০০	৯২.৫৮	৬.৯৭	০.০২	০.৩৯	০.০৪
খুলনা	১৪৭০৫২২৯	১২৫৯৩৯১৯	২০৫৯০৩৬	৯৯৩	৪৪৩১৫	৬৯৬৬	১০০.০০	৮৫.৬৪	১৪.০০	০.০১	০.৩০	০.০৫
রাজশাহী	৩০২০১৮৭৩	২৭০৬০৮২৫	২৮৮৮৯৪১	৫৭০২	১০৫৬৬৬	১৪০৭৩৯	১০০.০০	৮৯.৬০	৯.৫৭	০.০২	০.৩৫	০.৪৬
সিলেট	৭৯৩৯৩৪৩	৬৬৮২৭০১	১২২৯২৫৮	৯২৩	২০৩৬৩	৬০৯৮	১০০.০০	৮৪.১৭	১৫.৪৮	০.০১	০.২৬	০.০৮

২০০১ সালের বিভাগ ভিত্তিক ধর্মাবলম্বীর পর্যায় সারণি আলোচনা করলে পাওয়া যায়, বাংলাদেশে তখন মোট বৌদ্ধ ছিল ৭,৭৩,৯৪৯ জন শতকরায় ০.৬২%। বরিশাল বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিল ৩,৪৯২ জন, শতকরায় ০.০৪%। চট্টগ্রাম বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিল ৭,৫৪,৫৭৫ জন, শতকরা ৩.১১%। ঢাকা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৮,২৬৪ জন, শতকরা ০.০২%। খুলনা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৯৯৩ জন, শতকরা ০.০১%। রাজশাহী বিভাগে ৫,৭০২ জন, শতকরায় ০.০২%। সিলেটে বৌদ্ধ মোট জনসংখ্যা ৯২৩ জন, শতকরা ০.০১%। ২০০১ সালে নতুনভাবে সিলেট বিভাগ যুক্ত হয়। ২০০১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছে প্রতিটি বিভাগে। বৌদ্ধ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে, সবচেয়ে কম সিলেট বিভাগে।

২০১১ সালের বিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা ও শতকরা নিম্নে সারণিতে দেখানো হল[৩০]:

সারণি-২.১২

বিভাগের নাম	সংখ্যা						শতকরা					
	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	অন্যান্য
বাংলাদেশ	১৪৪০৪৩৬৯৭	১৩০২০৪৮৬০	১২২৯৯৪০	৮৮৯৭২১	৪৪৭০০৯	২০২১৬৭	১০০.০০	৯০.৩৯	৮.৫৪	০.৬২	০.৩১	০.১৪
বরিশাল	৮৩২৫৬৬৬	৭৫৪৬৪৮৩	৭৬২৪৭৯	৩১১৭	১৩২৪৭	৩৪০	১০০.০০	৯০.৬৪	৯.১৬	০.০৪	০.১৬	০.০০
চট্টগ্রাম	২৮৪২০১৯	২৫৪৬০২০২	২০০৫০০৪	৮৬৬৬৩৮	৬৩৫৩১	২৭৬৪৪	১০০.০০	৮৯.৫৮	৭.০৫	৩.০৫	০.২২	০.১০
ঢাকা	৪৭৪২৪৪১৮	৪৪২৬৭০০৮	২৯৫০১৪২	১৫০১৮	১৭৫৪৯৩	১৬৭৫৭	১০০.০০	৯৩.৩৪	৬.২২	০.০৩	০.৩৭	০.০৪
খুলনা	১৫৬৮৭৭৫৯	১৩৬১৭৯৮৪	২০১৬৫৬৪	৪১৭	৪৩১৫৯	৯৬৩৫	১০০.০০	৮৬.৮১	১২.৮৫	০.০০	০.২৮	০.০৬
রাজশাহী	১৮৪৮৪৮৫৮	১৭২৪৮৮৬১	১০৮৭৬৯২	৫৫৯	৬৯৩৩৮	৭৮৪০৮	১০০.০০	৯৩.৩১	৫.৮৮	০.০০	০.৩৮	০.৪২
রংপুর	১৫৭৮৭৭৫৮	১৩৫৮২০৬৭	২০৮৬১৪৮	২৭৭৬	৫৯২৪৫	৫৭৫২২	১০০.০০	৮৬.০৩	১৩.২১	০.০২	০.৩৮	০.৩৬
সিলেট	৯৯১০২১৯	১৩৯১৯১১	১৩৯১৯১১	১১৯৬	২২৯৯৬	১১৮৬১	১০০.০	৮৫.৫৯	১৪.০৫	০.০১	০.২৩	১.১২

২০১১ সালের বিভাগ ভিত্তিক ধর্মাবলম্বীর পর্যায় সারণি আলোচনা করলে পাওয়া যায়, বাংলাদেশে তখন মোট বৌদ্ধ ছিল ৮,৮৯,৭২১ জন, শতকরায় ০.৬২%। বরিশাল বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিল ৩,১১৭ জন শতকরায় ০.০৪%। চট্টগ্রাম বিভাগে মোট বৌদ্ধ ছিল ৮,৬৬,৬৩৮ জন, শতকরা ৩.০৫%। ঢাকা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ১৫,০১৮ জন, শতকরা ০.০৩%। খুলনা বিভাগে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৪১৭ জন, শতকরা ০.০০%। রাজশাহী বিভাগে ৫৫৯ জন, শতকরায় ০.০০%। রংপুরে মোট বৌদ্ধ ছিল ২,৭৭৬ জন, শতকরা ০.০২%। সিলেটে বৌদ্ধ মোট জনসংখ্যা ১,১৯৬ জন, শতকরা ০.০১%। ২০১১ সালে নতুনভাবে রংপুর বিভাগ যুক্ত হয়। ২০১১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০১ সালের তুলনায় জনসংখ্যা বেড়েছে প্রতিটি বিভাগে। বৌদ্ধ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে, সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে ধর্মভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল। এখানে ঢাকা জেলার ৪৬টি থানার ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা উল্লেখ করে ছকের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে দেখা গেছে, ঢাকা জেলার প্রতিটি থানায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করেন। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ওয়েবসাইট), আদমশুমারি[৩১] রিপোর্ট ২০০১। ব্যাখ্যা করা হয়েছে নগর জেলার অঞ্চল পরিসংস্থানের ভূ-সংস্থানিক তথ্য থেকে।[৩২]

সারণি-২.১৩

ধর্ম	জনসংখ্যা- আদাবর	জনসংখ্যা-বাড্ডা	জনসংখ্যা-বন্দর উপজেলা	জনসংখ্যা-বংশাল	জনসংখ্যা-বিমান বন্দর থানা
মুসলিম	৩৬২,৪৯৯	১১২,১২২	৪০৭,৭৭৮	৩২০,৮৬৯	১২৪,৭৫৭
হিন্দু	৮,১৭৪	৫,৭৪০	৪৭,৭৪৩	৬,৬৭৯	৪,৬৭৪
খ্রিস্টান	১৮০	৫৫৪	১৩৩	৫৬	৪৬১
বৌদ্ধ	২৭	১৮৪	৬	৯৩	১৪৬
অন্যান্য	১৫	৬০	২৭২	২০	১৫

তথ্যসূত্র: 'Bangladesh: Administrative Division', https://www.citypopulation.de

আদাবর: বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি থানা। এর আয়তন প্রায় ২.০৭ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, আদাবর থানায় মুসলিম জনসংখ্যা, ৩,৬২,৪৯৯ জন, হিন্দু ৮,১৭৪ জন, খ্রিস্টান ১৮০ জন, বৌদ্ধ ২৭ জন এবং অন্যান্য ১৫ জন।

বাড্ডা: ঢাকা জেলায় অবস্থিত একটি থানা। এ থানার আয়তন ১৬.৭৮ বর্গ কিমি.। নিম্নের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, বাড্ডা থানায় মুসলিম জনসংখ্যা, ১,১২,১২২ জন, হিন্দু ৫,৭৪০ জন, খ্রিস্টান ৫৫৪ জন, বৌদ্ধ ১৮৪ জন এবং অন্যান্য ৬০ জন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাড্ডাতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। বিহারের আশেপাশের এলাকাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ জনসংখ্যা বেশি থাকা স্বাভাবিক।

বন্দর উপজেলা: বন্দর বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। এ উপজেলার আয়তন ৫৪.৩৯ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, বন্দর উপজেলায় মুসলিম জনসংখ্যা, ৪০৭,৭৭৮ জন, হিন্দু ৪৭,৭৪৩ জন, খ্রিস্টান ১৩৩ জন, বৌদ্ধ ৬ জন এবং অন্যান্য ২৭২ জন।

বংশাল: ঢাকা জেলার একটি থানা বংশাল। এর আয়তন ১.২ বর্গ কি.মি। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, বংশাল থানায় মুসলিম জনসংখ্যা, ৩,২০,৮৬৯ জন, হিন্দু ৬,৬৭৯ জন, খ্রিস্টান ৫৬ জন, বৌদ্ধ ৯৩ জন এবং অন্যান্য ২০ জন। ব্যবসায়িক কেন্দ্রস্থল বংশাল। অনেক বৌদ্ধ এখানে ব্যবসা করেন এবং বসবাস করেন। তাই তাদের ধর্মীয় কাজের জন্য বংলাবাজারে আন্তর্জাতিক শান্তিকুঞ্জ ভাবনা কেন্দ্র (বাংলা বাজার বৌদ্ধ বিহার) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা শহরের বাংলা বাজারস্থ বড়ুয়া ব্যবসায়ী ও কর্মজীবীদের নিয়ে প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো উল্লেখ করেন[৩৩]:

"বোধি-নামে গৃহী জীবনে সমধিক পরিচিত আজকের দিকপাল মহাথেরো স্বগ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের একক দায়িত্ব গ্রহণ করে, একে একে অনেকজনকে রাউজানের মদুনাখীল গ্রাম হতে ঢাকার বাংলা বাজারে নিয়ে এসেছিলেন; এবং স্ব জীবিকাস্থল মটর পার্টস এর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের চাকুরি পাওয়ার যাবতীয় দায়-

দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্ব-রক্ত দরদী বোধি চৌধুরীর সেদিনের সেই মাঙ্গলিক উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য পীড়িত রাউজান থানার এই ক্ষুদ্র বৌদ্ধ পল্লীর সন্তানেরা আজ বাংলাদেশের রাজধানী এই ঢাকা মহানগরীর বুকে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বৌদ্ধ জনবসতির জন্ম দিল, চট্টগ্রামের আছদগঞ্জ বড়ুয়া ব্যবসায়ীদের ন্যায়। মটর পার্টস-এর ব্যবসা বৌদ্ধিক আদর্শের অনুকূল এবং দ্রুত অগ্রসর মান আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের অন্যতম লাভজনক একটি জীবিকা। অতি স্বল্প পুঁজি নিয়ে শুরু করে বিশাল অংকের পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সদা বিদ্যমান এই ব্যবসাটি শুরু করা তুলনামূলক নিরাপদ ও সহজ। তাই চট্টগ্রামের আছদগঞ্জের ব্যবসায়ীদের ন্যায় যুগ যুগ ধরে একই স্থানে সীমাবদ্ধ না থেকে ঢাকার বাংলা বাজারস্থ এই বড়ুয়া ব্যবসায়ীরা যদি সংঘবদ্ধ ভাবে তাঁদের শাখা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন; সেই উদ্যোগে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। বিশ্বের খ্যাতিমান ব্যবসায়ী আগাখান সম্প্রদায় এবং মারোয়ারী সম্প্রদায়দ্বয় স্ব সমাজের যুবক-যুবতীদেরকে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগদানের মাধ্যমে সাংঘিক উদ্যোগেই সারা বিশ্বে পুনর্বাসন করে যাচ্ছেন শতাব্দী ধরে। তাই এ সম্প্রদায়ের লোকেরা জনসংখ্যায় বড়ুয়াদের ন্যায় স্বল্প হলেও শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ বিত্ত ও একতা শৃঙ্খলায় অতিশয় সম্মানিত সম্প্রদায় রূপেই বিশ্বের বুকে টিকে আছে। ঢাকার বাংলা বাজারস্থ এই বড়ুয়া ব্যবসায়ীরা এমন একটি আদর্শ সাংঘিক উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি বিশ্বের ধনী দেশ-সমূহে অবস্থানরত বড়ুয়াদের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্যোগটাও যদি গ্রহণ করে তাহলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁদের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতে খুব সহজেই 'বুড্ডিস্ট ব্যাংক' প্রতিষ্ঠায় সক্ষম যে হবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"

বিমান বন্দর থানা: ঢাকা মেট্রোপলিটনের একটি থানা। যার আয়তন ৮.০২ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, বিমান বন্দর থানায় মুসলিম জনসংখ্যা, ১,২৪,৭৫৭ জন, হিন্দু ৪,৬৭৪ জন, খ্রিস্টান ৪৬১ জন, বৌদ্ধ ১৪৬ জন এবং অন্যান্য ১৫ জন।

সারণি-২.১৪

ধর্ম	জনসংখ্যা-ক্যান্টনমেন্ট থানা	জনসংখ্যা-চকবাজার	জনসংখ্যা-দক্ষিণখান	জনসংখ্যা-দারুস সালাম	জনসংখ্যা-ডেমরা	জনসংখ্যা-ধানমন্ডি	জনসংখ্যা-গাজিপুর সদর
মুসলিম	৭৩৭,৪৮৫	৪১,১৩৬	৩৬০,১৬৫	৪৮০,৩২৬	৩৪০,১৪০	৪৭,০৪৮	১৫৬,৭৩২
হিন্দু	৫৬,৭৫৭	২০,৬৯৫	৯,৫৭১	১৩,৯৬৬	১৩,১৫৭	২,৩১৮	১৪,৭২৭
খ্রিস্টান	৯৪	২৩০	৮৯	৫,৪১৭	১,৮৬৮	৫৫	২৫
বৌদ্ধ	১১	২১	৮৮	৫৩৬	৫৪১	৮৫	৪
অন্যান্য	১৩	৫	২০	১২৮	১৩৭	১৭	৬

তথ্যসূত্র: 'Bangladesh: Administrative Division', https://www.citypopulation.de

ক্যান্টনমেন্ট থানা: ঢাকা বিভাগের অধীনে ঢাকা জেলার থানা। এর আয়তন ১৪.৪৭ বর্গ কি.মি। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ক্যান্টনমেন্ট থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ৭,৩৭,৪৮৫ জন, হিন্দু ৫৬,৭৫৭ জন, খ্রিস্টান ৯৪ জন, বৌদ্ধ ১১ জন এবং অন্যান্য ১৩ জন।

চকবাজার: পুরান ঢাকার অন্যতম একটি থানা চকবাজার এবং এর আয়তন ৬ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, চকবাজার থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ৪১,১৩৬ জন, হিন্দু ২০,৬৯৫ জন, খ্রিস্টান ২৩০ জন, বৌদ্ধ ২১ জন এবং অন্যান্য ৫ জন।

দক্ষিণখান: বাংলাদেশের ঢাকা মেট্রোপলিটন উত্তরের অধীন একটি থানা, আয়তন ১১.০৮ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৩,৬০,১৬৫ জন, হিন্দু ৯,৫৭১ জন, খ্রিস্টান ৮৯ জন, বৌদ্ধ ৮৮ জন, অন্যান্য ২০ জন।

দারুস সালাম: ঢাকা মেট্রোপলিটন একটি থানা দারুস সালাম, আয়তন ৪.৯৮ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, দারুস সালাম থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ৪,৮০,৩২৬ জন, হিন্দু ১৩,৯৬৬ জন, খ্রিস্টান ৫,৪১৭ জন, বৌদ্ধ ৫৩৬ জন, অন্যান্য ১২৮ জন। এ থানায় বৌদ্ধ জনসংখ্যা অন্যান্য থানা তুলনায় বেশি রয়েছে।

ডেমরা: ঢাকা বিভাগ ও ঢাকা জেলার একটি থানা হলো ডেমরা, আয়তন ১৯.৩৬ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ডেমরা থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ৩,৪০,১৪০ জন, হিন্দু ১৩,১৫৭ জন, খ্রিস্টান ১,৮৬৮ জন, বৌদ্ধ ৫৪১ জন, অন্যান্য ১৩৭ জন। উল্লেখ্য যে, ডেমরা থানায় বৌদ্ধ জনসংখ্যা বেশি।

ধানমন্ডি: ঢাকা মেট্রোপলিটনের অন্যতম একটি থানা ধানমন্ডি, আয়তন ৪.৩৪ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ধানমন্ডি মুসলিম জনসংখ্যা ৪৭,০৪৮ জন, হিন্দু ২,৩১৮ জন, খ্রিস্টান ৫৫ জন, বৌদ্ধ ৮৫ জন, অন্যান্য ১৭ জন।

গাজীপুর সদর: ঢাকার উত্তর পাশের জেলা, আয়তন ১৪১.১৯ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, গাজীপুর সদরে মুসলিম জনসংখ্যা ১,৫৬,৭৩২ জন, হিন্দু ১৪,৭২৭ জন, খ্রিস্টান ২৫ জন, বৌদ্ধ ৪ জন, অন্যান্য ৬ জন। তবে সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেখানে অনেক বৌদ্ধ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে এবং বৌদ্ধ

পেশাজীবীরা সরকারী, বেসরকারী ও কোম্পানিতে চাকুরী করছেন। ধর্মীয় কার্য পালনের জন্য রয়েছে গাজীপুর কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার।

সারণি-২.১৫

ধর্ম	জনসংখ্যা- গেন্ডারিয়া	জনসংখ্যা- গুলশান	জনসংখ্যা- হাজারীবাগ	জনসংখ্যা- যাত্রাবাড়ি	জনসংখ্যা- কদমতলী	জনসংখ্যা- কাফরুল	জনসংখ্যা- কলাবাগান
মুসলিম	৫৬,৬৬৬	১৯১,০৮২	২১৬,৫৯০	৩৫৬,১৭৬	১১৩,৫৯৫	১,৩০০,৭৯৮	৬২,৭৯৬
হিন্দু	২,৮৮০	৭,৭২৫	৭,০৩২	১৭,৮৭৩	১,৭৫৪	৭৪,০৮০	৪,৮৪৪
খ্রিস্টান	৩৪	১,৮৪১	৩০৪	২০৭	১১৩	৭,৯৭৬	৩৩৬
বৌদ্ধ	৪৬	২৯৭	১২৫	২,০৮৫	২৩	২,৭০৮	১৪৬
অন্যান্য	১৩	২৮	২৮	৮০	৪	৩৪৮	১৮

তথ্যসূত্র: 'Bangladesh: Administrative Division', https://www.citypopulation.de

গেন্ডারিয়া: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি থানা। এর আয়তন ১.৮৩ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, গেন্ডারিয়ায় থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ৫৬,৬৬৬ জন, হিন্দু ২,৮৮০ জন, খ্রিস্টান ৩৪ জন, বৌদ্ধ ৪৬ জন, অন্যান্য ১৩ জন।

গুলশান: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি অভিজাত এলাকা, আয়তন ১৭ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, গুলশান থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ১,৯১,০৮২ জন, হিন্দু ৭,৭২৫ জন, খ্রিস্টান ১,৮৪১ জন, বৌদ্ধ ২৯৭ জন, অন্যান্য ২৮ জন।

হাজারীবাগ: হাজারীবাগ (ঢাকা মেট্রোপলিটন) থানার আয়তন ৩.৯৪ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, হাজারীবাগ থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ২,১৬,৫৯০ জন, হিন্দু ৭,০৩২ জন, খ্রিস্টান ৩০৪ জন, বৌদ্ধ ১২৫ জন, অন্যান্য ২৮ জন।

যাত্রাবাড়ি: ঢাকা বিভাগের ও ঢাকা জেলার একটি থানা যাত্রাবাড়ি, আয়তন ১৩.১৯ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, যাত্রাবাড়ি থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ৩,৫৬,১৭৬ জন, হিন্দু ১৭,৮৭৩ জন, খ্রিস্টান ২০৭ জন, বৌদ্ধ ২,০৮৫ জন, অন্যান্য ৮০ জন। উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এ থানায়।

কদমতলী: ঢাকা মেট্রোপলিটন থানা কদমতলী, আয়তন ১০.১৬ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, কদমতলী থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ১,১৩,৫৯৫ জন, হিন্দু ১,৭৫৪ জন, খ্রিস্টান ১১৩ জন, বৌদ্ধ ২৩ জন, অন্যান্য ৪ জন।

কাফরুল: কাফরুল থানা ঢাকা মেট্রোপলিটনের মধ্যে অবস্থিত, আয়তন ৭.৮৯ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, কাফরুল মুসলিম জনসংখ্যা ১,৩০০,৭৮৯ জন, হিন্দু ৭৪,০৮০ জন, খ্রিস্টান ৭,৯৭৬ জন, বৌদ্ধ ২,৭০৮ জন, অন্যান্য ৩৪৮ জন। এ থানায় অধির্ভুক্ত এলাকায় বেশ বৌদ্ধ জনসংখ্যার বসবাস লক্ষ করা যায়।

কলাবাগান: ঢাকা মেট্রোপলিটনের একটি থানা, আয়তন ১.২৬ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, কলাবাগানে মুসলিম জনসংখ্যা ৬২,৭৯৬ জন, হিন্দু ৪,৮৪৪ জন, খ্রিস্টান ৩৩৬ জন, বৌদ্ধ ১৪৬ জন, অন্যান্য ১৮ জন।

সারণি-২.১৬

ধর্ম	জনসংখ্যা-কামরাঙ্গীরচর	জনসংখ্যা-খিলগাঁও	জনসংখ্যা-কেরানীগঞ্জ উপজেলা	জনসংখ্যা-খিলক্ষেত	জনসংখ্যা-কোতায়ালী	জনসংখ্যা-লালবাগ	জনসংখ্যা-মিরপুর
মুসলিম	১,৭৮,৬১৩	১,২৫,৯২৩	১,৩২,০৫৬	১,৮২,৪২১	১৪২,৫৭৬	১৫২,১৪৬	১,৭৩,৪৯০
হিন্দু	৫,৩৭৫	৬,৬০২	৮,১৩৯	২৭,৬৫৮	৩,৭১৪	৪,৭৮৪	৪,৯৩৯
খ্রিস্টান	৩০	৪,৫১০	৭,৬৯৯	৯৮৭	২৯৩	৩৩৩	৯৭৩
বৌদ্ধ	৩৪	৪৫৩	২৯১	১৩৯	১১৯	৫২	৪৪৯
অন্যান্য	১০	৮৫	৭০	৫	৩০	১	৫৬

তথ্যসূত্র: 'Bangladesh: Administrative Division', https://www.citypopulation.de

কামরাঙ্গীরচর: ঢাকা মেট্রোপলিটন থানা কামরাঙ্গীরচর, আয়তন ৩.৬৩ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, কামরাঙ্গীরচরে মুসলিম জনসংখ্যা ১,৭৮,৬১৩ জন, হিন্দু ৫,৩৭৫ জন, খ্রিস্টান ৩০ জন, বৌদ্ধ ৩৪ জন, অন্যান্য ১০ জন।

খিলগাঁও: বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ঢাকা জেলার একটি থানা। আয়তন ১৪.০২ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, খিলগাঁও থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১,২৫,৯২৩ জন, হিন্দু ৬,৬০২ জন, খ্রিস্টান ৪,৫১০ জন, বৌদ্ধ ৪৫৩ জন, অন্যান্য ৮৫ জন। এ থানায় বৌদ্ধ জনসংখ্যা বেশি রয়েছে।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা: রাজধানী ঢাকার একটি উপজেলা, আয়তন ১৬৬.৮৭ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, কেরানীগঞ্জ থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১৩২,০৫৬ জন, হিন্দু ৮,১৩৯ জন, খ্রিস্টান ৭,৬৯৯ জন, বৌদ্ধ ২৯১ জন, অন্যান্য ৭০ জন। এ থানায় বৌদ্ধ জনসংখ্যা বেশি রয়েছে।

খিলক্ষেত: ঢাকা মেট্রোপলিটন থানার খিলক্ষেত, আয়তন ১৫.৮৮ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, খিলক্ষেত থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১,৮২,৪২১ জন, হিন্দু ২৭,৬৫৮ জন, খ্রিস্টান ৯৮৭ জন, বৌদ্ধ ১৩৯ জন, অন্যান্য ৫ জন।

কোতায়ালী: ঢাকা মেট্রোপলিটনের একটি থানা কোতায়াালী। আয়তন ০.৬৭ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, কোতায়ালী থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১,৪২,৫৭৬ জন, হিন্দু ৩,৭১৪ জন, খ্রিস্টান ২৯৩ জন, বৌদ্ধ ১১৯ জন, অন্যান্য ৩০ জন।

লালবাগ: ঢাকা মেট্রোপলিটন থানার একটি লালবাগ। আয়তন ২.০৪ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, লালবাগ থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১,৫২,১৪৬ জন, হিন্দু ৪,৭৮৪ জন, খ্রিস্টান ৩৩৩ জন, বৌদ্ধ ৫২ জন, অন্যান্য ১ জন।

মিরপুর: ঢাকা মেট্রোপলিটনের মিরপুর মডেল থানা একটি। আয়তন ৪.৭১ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, মিরপুর থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১,৭৩,৪৯০ জন, হিন্দু ৪,৯৩৯ জন, খ্রিস্টান ৯৭৩ জন, বৌদ্ধ ৪৪৯ জন, অন্যান্য ৫৬ জন। এ থানায় বৌদ্ধ জনসংখ্যা বেশি রয়েছে। মিরপুরে শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার রয়েছে।

সারণি-২.১৭

ধর্ম	জনসংখ্যা- মোহাম্মদপুর	জনসংখ্যা- মতিঝিল	জনসংখ্যা- নারায়ণগঞ্জ সদর	জনসংখ্যা- নিউমার্কেট	জনসংখ্যা- পল্লবী	জনসংখ্যা- পল্টন	জনসংখ্যা-রমনা
মুসলিম	৭৫,৮৮৪	২,২৬,৭১৬	৩,১৯,৫৭৬	১,৭২,০৩০	১,৭৪৩,৯৯৪	৪৩৭,৩৯৬	২২০,২৭০
হিন্দু	২,৫৬৫	২৯,৭৮২	১২,৭৫৯	৩২,২৩২	৭০,৩৮২	৬৪৩,৫৮৮	২৮,৬৬৪
খ্রিস্টান	৪৬২	২৫	৬৪	৩৫	৫,১০৮	১,৩৭৯	১৬,২৯৪
বৌদ্ধ	২১	২৫	২	২	৫৫৬	৭৭	১৩
অন্যান্য	১১০	১১০	১১৩	১৯৩	৩৩৪	৮৬৮	৩৫

তথ্যসূত্র: 'Bangladesh: Administrative Division', https://www.citypopulation.de

মোহাম্মদপুর: ঢাকা মেট্রোপলিটনের আওতাধীন মোহাম্মদপুর থানা। আয়তন ৭.৪৪ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, মোহাম্মদপুর থানার মুসলিম জনসংখ্যা ৭৫,৮৮৪ জন, হিন্দু ২,৫৬৫ জন, খ্রিস্টান ৪৬২ জন, বৌদ্ধ ২১ জন, অন্যান্য ১১০ জন।

মতিঝিল: ঢাকা শহরের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা। আয়তন ৩.৭ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, মতিঝিল থানার মুসলিম জনসংখ্যা ২,২৬,৭১৬ জন, হিন্দু ২৯,৭৮২ জন, খ্রিস্টান ২৫ জন, বৌদ্ধ ২৫ জন, অন্যান্য ১১০ জন।

নারায়ণগঞ্জ সদর: নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার আয়তন ১০০.৭৪ বর্গ কি.মি। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, নারায়ণগঞ্জ সদরের মুসলিম জনসংখ্যা ৩,১৯,৫৭৬ জন, হিন্দু ১২,৭৫৯ জন, খ্রিস্টান ৬৪ জন, বৌদ্ধ ২ জন, অন্যান্য ১১৩ জন।

নিউমার্কেট: ঢাকা মেট্রোপলিটন থানার অন্তর্ভুক্ত থানা হলো নিউমার্কেট। আয়তন ১.৬৭ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, নিউমার্কেট থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১,৭২,০৩০ জন, হিন্দু ৩২,২৩২ জন, খ্রিস্টান ৩৫ জন, বৌদ্ধ ২ জন, অন্যান্য ১৯৩ জন।

পল্লবী: ঢাকা মেট্রোপলিটনের একটি থানা পল্লবী। আয়তন ২৫.২৮ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, পল্লবী থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১,৭৩,৯৯৪ জন, হিন্দু ৭০,৩৮২ জন, খ্রিস্টান ৫,১০৮ জন, বৌদ্ধ ৫৫৬ জন, অন্যান্য ৩৩৪ জন। উল্লেখ যে, ৫৫৬ জন বৌদ্ধ জনসংখ্যা রয়েছে।

পল্টন: ঢাকা মেট্রোপলিটন থানার একটি থানা পল্টন। আয়তন ১.৪২ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, পল্টন থানার মুসলিম জনসংখ্যা ৪৩,৫৮৮ জন, হিন্দু ৪৩,৫৮৮ জন, খ্রিষ্টান ১,৩৭৯ জন, বৌদ্ধ ৭৭ জন, অন্যান্য ৮৬৮ জন।

রমনা: ঢাকা মেট্রোপলিটনের থানা রমনা। আয়তন ৩.৮৪ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, রমনা থানার মুসলিম জনসংখ্যা ২,২০,২৭০ জন, হিন্দু ২৮,৬৬৪ জন, খ্রিস্টান ১৬,২৯৪ জন, বৌদ্ধ ১৩ জন, অন্যান্য ৩৫ জন।

সারণি-২.১৭

ধর্ম	জনসংখ্যা- রামপুরা	জনসংখ্যা- সবুজবাগ	জনসংখ্যা- সাভার উপজেলা	জনসংখ্যা- শাহ আলী	জনসংখ্যা- শাহবাগ	জনসংখ্যা- শেরে-বাংলা নগর	জনসংখ্যা- শ্যামপুর
মুসলিম	৩,২২,৭২৫	৪,৭৫,৯৯৮	২,৫১,৪০৬	১,৬৩,৪৮৭	১০৯,৩৪৪	৭১,৩৭০	২০৯,৫০৮
হিন্দু	১৮,৬০৯	১৫,৩৩৯	৯০,৬৮৫	৪৪,০০০	১১৫,১২৫	২৯,৪২৭	৭৪,৫৫৭
খ্রিস্টান	৫৭৪	৪৮৮	১,৫৩২	১২০	৫,৯৬২	৮৬	৫,২৫১
বৌদ্ধ	৩	৫২	১৯	৩	৯	১	৪৮
অন্যান্য	২৫১	৯১৫	৩৬৬	৫	৫৩	৯	৪২

তথ্যসূত্র: 'Bangladesh: Administrative Division', https://www.citypopulation.de

রামপুরা: ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত একটি উপজেলা বা থানা। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, রামপুরা থানার মুসলিম জনসংখ্যা ৩,২২,৭২৫ জন, হিন্দু ১৮,৬০৯ জন, খ্রিষ্টান ৫৭৪ জন, বৌদ্ধ ৩ জন, অন্যান্য ২৫১ জন।

সবুজবাগ: সবুজবাগ থানা বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের আওতাভুক্ত, আয়তন ৬.৬২ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, সবুজবাগ থানার মুসলিম জনসংখ্যা ৪,৭৫,৯৯৮ জন, হিন্দু ১৫,৩৩৯ জন, খ্রিস্টান ৪৮৮ জন, বৌদ্ধ ৫২ জন, অন্যান্য ৯১৫ জন।

সাভার উপজেলা: সাভার ঢাকা জেলার অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ উপজেলা গুলোর মধ্যে একটি, আয়তন ২৮০.১২ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, সাভার উপজেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ২,৫১,৪০৬ জন, হিন্দু ৯০,৬৮৫ জন, খ্রিষ্টান ১,৫৩২ জন, বৌদ্ধ ১৯ জন, অন্যান্য ৩৬৬ জন। সাভারে বন বিহার রয়েছে সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা ও সমতলীয় বৌদ্ধরা ধর্মীয় কার্য সাধন করে। সেখানে অনেক বৌদ্ধরা পোষাক শ্রমিক বাস করেন।

শাহ আলী: ঢাকা মেট্রোপলিটনের একটি থানা, আয়তন ৫.১৫ বর্গ কিমি.। উপরের সরণিতে দেখা যাচ্ছে, শাহ আলী থানার মুসলিম জনসংখ্যা ১,৬৩,৪৮৭ জন, হিন্দু ৪৪,০০০ জন, খ্রিস্টান ১২০ জন, বৌদ্ধ ৩ জন, অন্যান্য ৫ জন।

শাহবাগ: ঢাকা মেট্রোপলিটনের একটি থানা শাহবাগ, আয়তন ৩.৪৯ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, শাহবাগ থানায় মুসলিম জনসংখ্যা ১০৯,৩৪৪ জন, হিন্দু ১,১৫,১২৫ জন, খ্রিস্টান ৫,৯৬২ জন, বৌদ্ধ ৯ জন, অন্যান্য ৫৩ জন।

শেরে-বাংলা নগর: ঢাকা জেলার একটি থানা, আয়তন ৫.২৫ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, শেরে-বাংলা নগর থানার মুসলিম জনসংখ্যা ৭১,৩৭০ জন, হিন্দু ২৯,৪২৭ জন, খ্রিস্টান ৮৬ জন, বৌদ্ধ ১ জন, অন্যান্য ৯ জন।

শ্যামপুর: শ্যামপুর ঢাকা জেলার একটি প্রশাসনিক এলাকা। আয়তন ২.৩১ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, শ্যামপুর থানার মুসলিম জনসংখ্যা ২০৯,৫০৮ জন, হিন্দু ৭৪,৫৫৭ জন, খ্রিস্টান ৫,২৫১ জন, বৌদ্ধ ৪৮ জন, অন্যান্য ৪২ জন।

সারণি-২.১৮

ধর্ম	জনসংখ্যা- সূত্রাপুর	জনসংখ্যা- তেজগাঁও	জনসংখ্যা- তেঁজগাও বাণিজ্যিক এলাকা	জনসংখ্যা- তুরাগ	জনসংখ্যা- উত্তরখান
মুসলিম	২,১৫,৭৮০	২,৫৩,৯২৭	৬০৩,২৩০	৩০৯,২১৯	৩,১৬,৭৭৪
হিন্দু	২,৫২৫	৪,০৬৪	১১,৩৩৬	৩,৮৭২	৮,৪০৮
খ্রিস্টান	৫৭৬	৩	২৯৪	১১	৯০
বৌদ্ধ	২	২	২	১	৫
অন্যান্য	৪৭	১৩৭	২১০	৭৯	৪৩

তথ্যসূত্র: 'Bangladesh: Administrative Division', https://www.citypopulation.de

সূত্রাপুর: সূত্রাপুর ঢাকা জেলার একটি থানা, যা বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত। আয়তন ২.০৮ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, সূত্রাপুর থানার মুসলিম জনসংখ্যা ২১৫,৭৮০ জন, হিন্দু ২,৫২৫ জন, খ্রিস্টান ৫৭৬ জন, বৌদ্ধ ২ জন, অন্যান্য ৪৭ জন।

তেজগাঁও: তেজগাঁও মেট্রোপলিটন থানা আয়তন ৮.৭৫ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, তেজগাঁও থানার মুসলিম জনসংখ্যা ২,৫৩,৯২৭ জন, হিন্দু ৪,০৬৪ জন, খ্রিস্টান ৩ জন, বৌদ্ধ ২ জন, অন্যান্য ১৩৭ জন।

তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা: তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাভুক্ত। আয়তন ৪.৩৮ বর্গ কিমি.। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা মুসলিম জনসংখ্যা ৬০৩,২৩০ জন, হিন্দু ১১,৩৩৬ জন, খ্রিস্টান ৩২৯৪ জন, বৌদ্ধ ২ জন, অন্যান্য ২১০ জন।

তুরাগ: ঢাকা মেট্রোপলিটনের অন্তর্গত থানা তুরাগ, আয়তন ১২.১৭ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, তুরাগ থানার মুসলিম জনসংখ্যা ৩০৯,২১৯ জন, হিন্দু ৩,৮৭২ জন, খ্রিস্টান ১১ জন, বৌদ্ধ ১ জন, অন্যান্য ৭৯ জন।

উত্তরখান: উত্তরখান থানাটি ঢাকা মেট্রোপলিটনের আওতায়। আয়তন ২০.০৯ বর্গ কিমি.। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, উত্তরখান থানার মুসলিম জনসংখ্যা ৩,১৬,৭৭৪ জন, হিন্দু ৮,৪০৮ জন, খ্রিষ্টান ৯০ জন, বৌদ্ধ ৫ জন, অন্যান্য ৪৩ জন

ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলার বৌদ্ধ জনসংখ্যা নিচের সারণিতে[৩৪] উল্লেখ করা হল:

সারণি-২.১৯

জেলা	বৌদ্ধ জনসংখ্যা
ঢাকা	৪১,৩৯৫
ফরিদপুর	১,০৭৩
গাজীপুর	২০,১২৪
গোপালগঞ্জ	১৩,৪০১
কিশোরগঞ্জ	২৫৬
মাদারিপুর	১,৭২৯
মানিকগঞ্জ	২১৪
মুন্সিগঞ্জ	১,৯২২
নারায়ণগঞ্জ	৬৯৫
নরসিংদী	১৪৯
রাজবাড়ী	১৭৩
শরিয়তপুর	৬০
টাঙ্গাইল	১২,৮২০

উপরের সারণিতে ঢাকা বিভাগের প্রতিটি জেলার শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মোট জনসংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১১ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যানে ব্যুরোর তথ্যমতে, ঢাকায় জেলায় মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা ১৩,২৬৭ জন।[৩৫] ঢাকায় জেলায় চাকমা আদিবাসীর সংখ্যা ৫,৩৭১ জন এবং মারমা সম্প্রদায়ের ১,০১৯ জন।[৩৬] বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশেরই বাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সাল থেকে পাশ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে যে বিরাট বাঙালি জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে, তাতে উপজাতীয়দের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশ-বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৯৭.৫০ ভাগ এবং বাঙালি জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২.৫০ ভাগ। এই ক্ষুদ্রতম বাঙালি জনসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত তা ছিল খুবই নগণ্য। ১৯৫১ সালে এই জনসংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ৯ ভাগ এবং ১৯৬১ সালে মাত্র ১২ ভাগ। কিন্তু ১৯৮১ সালে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪০ ভাগ।

অসমর্থিত সূত্র থেকে জানা যায়, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রমে বহিরাগত অ-উপজাতীয় নতুন বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা ৪ লক্ষাধিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের জনসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।[৩৭]

ক্রমবর্ধমান বসতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো একটি এলাকার জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষকে একত্র করে। তখন কোনো একটি দেশের বা নির্দিষ্ট একটি জায়গার একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য বিষয়। উপরিউক্ত আলোচনায় তেমনই একটি বিষয় দেখানো হয়েছে। ঢাকা জেলায় ১৯০১-২০১৫ পর্যন্ত যে সকল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল তা এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের সকল বিভাগের পর্যালোচনায় উঠে এসেছে চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা বাস করে। অন্যদিকে আদমশুমারি বছরে দেখা যায়, ১৯০১-২১ সাল পর্যন্ত ঢাকাতে বৌদ্ধ বসবাসের কোনো শতকরা পাওয়া না গেলেও তা ২০০১ সালে ০.৭ এ পৌঁছায়। তবে বাংলাদেশে বসবাসরত মোট বৌদ্ধদের মধ্যে বাঙালি বৌদ্ধ পরিবারের সংখ্যা ২৯,০০২ এবং মোট জনসংখ্যা ১,৯০,১১১ জন। তাছাড়া ঢাকা, গাজীপুর, সাভার এলাকায় ২৫,০০০ জন এবং চট্টগ্রাম সদর চাঁন্দগাও (চট্টগ্রাম) এলাকায় ৮০,০০০ জন বাঙালি বৌদ্ধ বসবাস করে। তাছাড়া বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে প্রায় ১,১৮৬ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রামণ রয়েছে। সুতরাং এদেশে মোট বাঙালি বৌদ্ধের সংখ্যা ২,৯৬,২৯৭।[৩৮] মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে দেখা যায়, ঢাকা শহরের বিহারগুলোর আশে-পাশে অধিকাংশ বৌদ্ধরা বসবাস করেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আবদুল বাকী, গ্রামীণ বসতি, ষষ্ঠ প্রকাশ (ঢাকা: ২০১১, সুজনেষু প্রকাশনী), পৃ. ৩২ ও ৩৪

২. খুরশীদ আলম, *সমাজ ও সম্প্রদায় পরিচিতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ (ঢাকা: ২০০৩, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স), পৃ. ১৩-১৪

৩. মনোয়ার আহমেদ, *ঢাকার পুরনো কথা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৩, মাওলা ব্রাদার্স), পৃ. ১৭

৪. কে. মউদুধ ইলাহী ও মো: কামরুজ্জামান, *জনসংখ্যা শব্দকোষ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী), পৃ. ৩৯

৫. Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary* (1995: NASW Press, Washington DC), P. 287

৬. মো. নুরুল ইসলাম, *জনবিজ্ঞান ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা*, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা: ২০০৯, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স), পৃ. ৪

৭. মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার, *জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা অধ্যয়ন* (ঢাকা: ২০০৩, ইসলাম পাবলিকেশন্স), পৃ. ১০

৮. https://bd.usembassy.gov>sites, Bangladesh *2017 international religious freedom report*

৯. https://web.archive.org/web/20110706132048/http://www.banbeis.gov.bd/bd_pro.htm

১০. *Buddhist Studies: Theravada Buddhism*, Bangladesh, http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/bangladesh-txt.htm.

১১. আনিসুর রহমান, '*আমাদের আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্য*', https://banglatribune.com, আগস্ট ৩০, ২০১৮

১২. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম: ২০০৭, বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি), পৃ. ২৭৩

১৩. নগরায়ন (বা শহরায়ন) বলতে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে জনসংখ্যার স্থানান্তর, গ্রামের তুলনায় নগর অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি এবং কোনো সমাজ যেভাবে এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া তা বোঝায়। কাজী মারুফা, নগর ভূগোল, পুর্নমুদ্রণ (ঢাকা: ২০১৫, সুজনেষু প্রকাশনী), পৃ. ৯

১৪. মোঃ শের আলী, *"শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণমূলক একটি সমীক্ষা ফেনী জেলা শহর প্রেক্ষিত"* (ঢাকা: ২০১৩, অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ২৭

১৫. নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ (ঢাকা: ১৯৯৫, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র), পৃ. ২৪

১৬. 'ঢাকার জনসংখ্যা: ভাবনা ও দুর্ভাবনা', https://www.kalerkantho.com, ১১ জুলাই, ২০১৮

১৭. কেদারনাথ মজুমদার, *বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণ*, প্রথম দে'জ সংস্করণ (কলকাতা: ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং), পৃ. ৫৭৭ ও ৫৭৮

১৮. প্রাগুক্ত, *বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণ*, পৃ. ৫৮৪ ও ৫৮৫

১৯. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০২, আফসার ব্রাদার্স), পৃ. ৮২

২০. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০১, অন্যান্য প্রকাশনী), পৃ. ৩৩ ও ৩৪

২১. আতাহারুল ইসলাম এবং শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, 'জনসংখ্যা', bn.banglapedia.org

২২. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা* (ঢাকা: ২০১৬, আবিষ্কার প্রকাশনী), পৃ.৪৪

২৩. শরীফ উদ্দিন (প্রধান সম্পাদক), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল, নগরায়ন ও নগর উন্নয়ন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১২, এশিয়াটিক সোসাইটি), পৃ. ৩০১

২৪. Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, p. 106. উদ্ধৃত, বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৬, আবিষ্কার প্রকাশনী), পৃ. ৪৭

২৫. প্রাগুক্ত, Bangladesh Bureau of Statistics, p. 99. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা*, পৃ. ৪৮

২৬. প্রাগুক্ত, Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, p. 99. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা*, পৃ. ৪৯

২৭. প্রাগুক্ত, Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, p. 99. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা*, পৃ. ৫০

২৮. প্রাগুক্ত, Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, p. 100. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা*, পৃ. ৫১

২৯. প্রাগুক্ত, Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, p. 100. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা*, পৃ. ৫২

৩০. প্রাগুক্ত, Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, p. 88. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা*, পৃ. ৫৩

৩১. একটি দেশের জনসংখ্যার সরকারী গণনা হিসেবে গণ্য করা হয়। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে আদমশুমারি একটি জনগোষ্ঠীর বা দেশের জনসংখ্যা গণনার সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ। তথ্য একত্রীকরণ এবং জনমিতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্যাদি প্রকাশ করা বোঝায়। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী আদমশুমারিতে বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন (১) প্রতিটি ব্যক্তির তথ্য গণনা, (২) একটি চিহ্নিত এলাকার সামষ্টিক গণনা, (৩) একই সঙ্গে সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা এবং (৪) নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠান। কোন দেশের বা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ গণনাকেই মূলত জনশুমারি বলা হয়। পৃথিবীর প্রায়

সবদেশেই নিজস্ব জনশুমারির ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর জনশুমারি করা হয়। পূর্বে জনশুমারিকে আদমশুমারি বলা হত। জাতীয় সংসদে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ পাস হওয়া আইন অনুসারে আদমশুমারিকে 'জনশুমারি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *সমাজ ও জনসংখ্যা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৮৮, বাংলা একাডেমী), পৃ. ২৪

৩২. 'Bangladesh: Administrative Division', https://www.citypopulation.de

৩৩. ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, *বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস* (২০০৮: চট্টগ্রাম), পৃ. ৩, ৪

৩৪. 'বাংলাদেশ আদমশুমারি রিপোর্ট', বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০১, http://bn.banglapedia.org

৩৫. Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, p. 1137

৩৬. Bangladesh Bureau of Statistics, 1991, p. 1127

৩৭. নীরু কুমার চাকমা, *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন*, প্রথম অবসর প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৭, অবসর প্রকাশনা সংস্থা), পৃ. ১০১

৩৮. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধ লোকসংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংস্থা), পৃ. ২৩৩ ও ২৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

পূজা[১]-পার্বন[২] ও উৎসবের[৩] মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক রীতি-নীতির একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম, সমাজ ও ভৌগোলিক অবস্থানভেদে এই উৎসব অনুষ্ঠান বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।[৪] এগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালি বৌদ্ধদেরও নিজস্ব উৎসব ও পূজা পার্বণ রয়েছে, যেগুলো পরবর্তীতে নানা কাল অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। এ সমস্ত উৎসবের মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বকীয়তা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[৫]

বাঙালি বৌদ্ধরা সবাই থেরবাদ[৬] ধর্ম-দর্শনে বিশ্বাসী। তাদের জাতকর্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[৭] বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা সারা বছরে অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। সেগুলোর প্রতিটিই সাধারণত গৌতম বুদ্ধ ও তার শিষ্যদের জীবন ও শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের দেশে প্রচলিত বাংলা ক্যালেন্ডারের হিসাব অনুসারে পূর্ণিমা বা পূর্ণচন্দ্র দিবসে এসব অনুষ্ঠান পালিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ধার্মিক ব্যক্তিগণ প্রতি পূর্ণিমাতেই বিহারে গিয়ে ভিক্ষু ও শ্রমণদের সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকেন। আর সাধারণ বৌদ্ধরা প্রধান প্রধান পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।[৮] ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধরা বিহারে এবং নিজেদের আবাসনে ঘরোয়াভাবে নানা অনুষ্ঠান করে থাকেন। বিহারে যে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয় যেমন পূর্ণিমাগুলো, ফানুস উড্ডয়ন, ভাবনা (মৈত্রী ও বিদর্শন) অনুশীলন, দান অনুষ্ঠান (সংঘদান, কঠিন চীবর দান, অষ্ট পরিষ্কার দান, প্রবজ্যা দান, বর্ষাবাসের সময় বর্ষাসাটিকা দান, আবার কোন কোন বিহারে বৈকালিক সংঘদান বা পানীয় সংঘদান) করা হয়ে থাকে। পরলোকগত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে পূণ্যদান করা, বিহার ও বিহারের বিভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য অর্থ দান করা ইত্যাদি। দান বিহারে হয়ে থাকে। উপাসক ও উপাসিকাদের, কেউ কেউ ত্রিশিরণ পঞ্চশীল, কেউ বা দশশীল, শ্রমণদের দশশীল প্রদান করা হয়। ভিক্ষুরা শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা অনুশীলন করেন; বিহারের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যা সমবেত প্রার্থনা তথা সূত্রপাঠ করেন। ভিক্ষু, শ্রমণরা *ত্রিপিটক* অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন, ভিক্ষুরা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করেন। বিহারের যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানাদি যেমন বিয়ের মন্ত্র, মানুষ মারা গেলে অনিত্য সভা হয়; ঢাকা শহরে অনেকের নিজস্ব জায়গা না থাকার কারণে সামাজিক কাজগুলো বিহারে করে থাকেন। বৌদ্ধরা পারিবারিক যে'সকল উৎসব আয়োজন করে থাকে তা হলো– সাধভক্ষণ, সন্তান নামকরণ, অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, কর্ণছেদন ও নাসিকা ছেদন, বিবাহ, আর্শিবাদ, তেল চড়ানি, জন্মদিন, এবং বিবাহবার্ষিকী।[৯] ধার্মিক পরিবারের অনেক অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধরা বিহারে গিয়ে ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে পালন করেন আবার ভিক্ষুসংঘকে বাসায় আমন্ত্রণ জানান।

ধর্ম মানবজীবনে অপরিহার্য ও অপরিত্যাজ্য বিষয়। ধর্মীয় আচার-সংস্কার-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিটি জাতির যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি গড়ে উঠে। ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার জন্য একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাসকারী একই জাতির জীবনাচরণে ভিন্নতা দেখা যায়।[১০] বৌদ্ধ সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনজাতির সাথে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। বৌদ্ধ গবেষক ডি. পি বড়ুয়া তার মানবাধিকার: বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী প্রবন্ধে (এটি ১৯৯৯ সালের ১২ মার্চ চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলায়তনে বাংলাদেশ বৌদ্ধ একাডেমী ও অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন) উল্লেখ করেছেন,

> "ঐতিহাসিক কারণে বড়ুয়া এবং সমপর্যায়ের সমতলে বসবাসকারি বৌদ্ধরা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বৃহত্তর বাঙালি জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার বছরব্যাপী বিবর্তনে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটেছে, বাঙালি বৌদ্ধরা সে জনগোষ্ঠীরই অংশ। ধর্মগত ভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বাদ দিলে জীবনাচরণে, ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে তারা বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের সাথে একই বাঙালি জাতীয়তার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত"

সমতলে বসবাসকারি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্য বাঙালির মূলধারার সাথে জড়িত। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে গৌড়, পুণ্ড্রবর্ধনের সভ্যতা, সমতট অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে পর পর কয়েকটি বৌদ্ধ রাজবংশের শাসন, চারশত বছরব্যাপী বৌদ্ধ পাল রাজত্বকালীন বাংলার ভাষা, কাব্য, ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে বাঙালির ভিত রচিত হয়েছিল। সিদ্ধাচার্যরা বাঙালি জাতিসত্তার জনক ছিলেন। বর্তমানের সমতলীয় বৌদ্ধরা সেই অতীত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। বৌদ্ধদের নিজস্ব উৎসব, পূজাপার্বণ আছে, যাদের প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত। গবেষক ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর *'মনীষা-মঞ্জুষা'*, ৩য় খণ্ডে (ঢাকা: ১৯৮৪, মুক্তধারা) পৃ. ৯৬ উল্লেখ করেন:

> "আমাদের বাংলাদেশে সহস্রাধিক বছর আগেও বৈশাখী পূর্ণিমা মহাসমারোহে পালিত হতো বলে অনুমান করার পক্ষে সঙ্গত কারণ রয়েছে, ধর্মের 'গাজন' পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হতো। মালদহ ও রাজশাহীর গম্ভীরার সাথে ধর্মের গাজন-এর যোগ কতটুকু আছে, বা নেই, তা এই সূত্রে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখার একটি চমৎকার বিষয়। বলাবাহুল্য, ধর্মদেবতা যে বৌদ্ধ দেবতা তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভালভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছেন।"

তবে পাল রাজত্বের সময়ে বৌদ্ধদের উৎসব আয়োজন কিছুটা কম হয়। আবার বৌদ্ধধর্মে মহাযানের উৎপত্তিতে এবং হিন্দুধর্মের প্রভাবে বুদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করতে থাকে। এ সময়ে বাংলায় শুধুমাত্র চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্মের ও সংস্কৃতির ক্ষীণ শিখাটি প্রজ্জ্বলিত ছিল। মোগল শাসন, আরাকানী শাসন, সর্বশেষ

অষ্টাদশ শতক থেকে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ধর্মে, উৎসবে, পূজা-পার্বণে, আচার-আচরণে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও বৌদ্ধরা তাদের স্বকীয়তা ধরে রেখেছিল। পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে থেরবাদী বৌদ্ধ প্রধান দেশ বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) ও শ্রীলংকার সাথে ধর্মীয় আদান-প্রদানের ফলে বর্তমান বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান ছিল। বর্তমানে বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধই একমাত্র উপাস্য। বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী পূর্ণিমা তিথিতে সংগঠিত হয়েছিল বলে সারা বিশ্বের বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসবগুলো পূর্ণিমা কেন্দ্রিক। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলীয় অঞ্চল তথা কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে বসবাসকারি উপজাতীয় বৌদ্ধরা। এরা নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মঙ্গোলী-আরাকানি বংশোদ্ভূত হওয়ায় আচার-আচরণে, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে বাঙালি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও জীবন বৈচিত্র্য থেকে ভিন্ন। তবে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী বলে ধর্মীয় দিক থেকে বাঙালি বৌদ্ধদের মত তারাও তথাগত বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত পূর্ণিমাগুলোকে উপলক্ষ করে উৎসবাদি করে থাকে। তবে বর্ষবরণ ও বিদায় উদ্‌যাপন ক্ষেত্রে ভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয়, কেননা এ দুটি কোন ধর্মীয় ব্যাপার না। বাঙালি বৌদ্ধরা চিরায়ত বাঙালি ধারায় বর্ষ বিদায় ও বরণোৎসব করে থাকে; আবার উপজাতীয় বৌদ্ধরা তাদের স্ব স্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচারণে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে বর্ষ বিদায় ও বরণোৎসব করে থাকে।

'*জাতক নিদান*'[১১] গ্রন্থে উল্লেখিত বুদ্ধের সময়ের নগরবাসীগণ কপিলাবস্তু নগরীকে সুসজ্জিত করে। স্বয়ং রাজা শুদ্ধোদনের নেতৃত্বে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বর্ষার প্রারম্ভে 'হলকর্ষণ উৎসব'[১২] উদ্‌যাপনের কথা যেমন জানতে পারি, তেমনি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পর খ্রি. পূর্ব ৩৭০ অব্দে সংকলিত বৌদ্ধ *জাতক* সাহিত্য থেকে তৎকালীন সময়ের উৎসব সম্পর্কে জানতে পারি। সে সময়ে প্রধান উৎসব হত কার্তিক মাসে, যা কার্তিকোৎসব নামে পরিচিত ছিল। এই উৎসব কার্তিক পূর্ণিমায় শুরু হয়ে সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী হত। যেসব জাতক থেকে আমরা এ উৎসব সম্পর্কে জানতে পারি তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বত্তক জাতক (৩৫)[১৩]
- পুষ্পরক্ত জাতক (১৪৭)[১৪]
- সঞ্জীব জাতক (১৫০)[১৫]
- গুপ্তিল জাতক (২৪৩)[১৬]
- উন্মাদয়ন্তী জাতক (৫২৭)[১৭]

উপর্যুক্ত জাতক কাত্তিকোৎসব সম্পর্কে জানা যায়। এ উৎসবে সমস্ত নগরবাসী উৎসবে মেতে উঠত। সমস্ত নগরী সুসজ্জিত হয়ে দেবনগরীর ন্যায় শোভাবর্ধন করত। রাজা নগর প্রদক্ষিণ করতে বের হতেন।

নগরবাসী নতুন রঙিন কাপড় পরিধান করে উৎসবে যোগ দিত। উৎসব উপলক্ষ্যে নাচ-গানের ব্যবস্থা হত। উৎসবের একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল সুরাপান। বিভিন্ন জাতক থেকে এ তথ্য জানা। নিম্নে জাতকগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো:

- ❖ তুণ্ডিল জাতক (৩৮৮)[১৮]
- ❖ পদকুশলমাণব জাতক (৪৩২)[১৯]
- ❖ সুরাপান জাতক (৮১)[২০]
- ❖ গঙ্গমাল জাতক (৪২১)[২১]

বর্তমান সময়ের উৎসবে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে হিন্দুরা কার্তিকী পূর্ণিমাতে রথযাত্রা উৎসবে মেতে উঠে অন্যদিকে বৌদ্ধরা আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন হতে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপন করে। বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ উৎসবগুলোতে বৌদ্ধ বিহার-মন্দিরগুলো অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়, আর উৎসবের দিন বৌদ্ধরা নতুন কাপড় পরিধান করে উৎসবে যোগদান করেন। বিভিন্ন উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তেমনি চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, ক্যানিংহাম, হান্টার, ফার্গুসন, এতিহাসিক পুরাবিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে বর্তমান আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার উৎস হচ্ছে বৌদ্ধ যুগের বুদ্ধের রথযাত্রা উৎসব। মনে হয় ইতিহাসের নিরিখে বললে অতিশয়োক্তি হবে না, যদি বলা হয় সেই বুদ্ধের সময়কাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সমাজ বিবর্তনেও বৌদ্ধ উৎসবের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে, কোথাও বেশ জাঁকজমকের সাথে, কোথাও বা বৌদ্ধরা সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে ক্ষীণ ধারায়।[২২] ঢাকায় বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বিহারে যায়, পারিবারিকভাবে নানা অনুষ্ঠান ঘরে এবং রেস্তোরা ও কমিউনিটি সেন্টারে পালন করে থাকে। এছাড়া, বাঙালিদের যে সকল উৎসব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই উদ্‌যাপন করেন ঢাকার বৌদ্ধরা সে সকল উৎসবে যোগদান করেন। যেমন: নববর্ষ, চৈত্র-সংক্রান্তি, বসন্ত উৎসব, পৌষ মেলা, দূর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী, বড়দিন, অমর একুশে গ্রন্থমেলা, পৌষ সংক্রান্তি (সাকরাইন) এবং ইদ। নিম্নে ঢাকায় বৌদ্ধদের উৎসব গুলোর বর্ণনা করা হলো:

বাংলায় বারো মাসে বারো পূর্ণিমা। বাঙালি বৌদ্ধদের উৎসবাদি এসব পূর্ণিমাতেই অনুষ্ঠিত হয় কারণ বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের স্মরণীয় ঘটনাগুলো কোন না কোন পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়েছিল।[২৩]

বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা:

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হলো বুদ্ধ পূর্ণিমা। এ দিবসকে 'ভেসাক' বলে। পালি ভাষায় 'বেশাখ' 'ভেসাক' নামে পরিচিত। আবার 'বুদ্ধ জয়ন্তী' নামেও পরিচিত। প্রাচীনতম ঐতিহ্যানুযায়ী এ পূর্ণিমা উৎসব বঙ্গাব্দের

প্রথম মাস অর্থাৎ বৈশাখ মাসের পূর্ণচন্দ্র দিবসেই অনুষ্ঠিত হয় যা সাধারণত খ্রিস্টাব্দ গণনার মে মাসেই হয়ে থাকে।[২৪] বুদ্ধ পূর্ণিমা নাম হওয়ার কারণ এই পবিত্র দিনে নেপালের লুম্বিনী কাননে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দের বুদ্ধের জন্ম, ভারতের বুদ্ধগয়ায় ৫৮৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং ভারতের কুশীনগরে ৫৪৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সেজন্য এই দিনটি বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র এবং এটা তাদের শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় উৎসব।[২৫] ১৯৫০ সালে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অফ বুদ্ধিস্ট' এর প্রথম কনফারেন্সে বৈশাখ মাসের এই পূর্ণিমা তিথিটিতে বুদ্ধের জন্মদিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[২৬] ১৯৫৬ সাল পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। বছরটি ছিল মহামতি গৌতম বুদ্ধের ২৫০০ তম মহাপরিনির্বাণ বার্ষিকী। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বৌদ্ধদের বিশ্ব সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড ফেলোশীপ অব বুদ্ধিস্ট' যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় এবং মহাআড়ম্বরে বিশ্বব্যাপী এই বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করে পূর্ববঙ্গে সার্ধদ্বিসহস্রতম বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়। যারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী নন তারাও জানেন যে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম এবং এই দিনেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি এবং মহাপরিনির্বাণ ঘটেছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের জন্য এই পুণ্য তিথি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ব্যাপক জনসমাগম হয়। সর্বোচ্চ ধর্মীয় মর্যাদা এবং বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ মহাথের-এর উদ্যোগে সিদ্ধান্ত হয় যে, সে বছর কেন্দ্রীয়ভাবে নানান অনুষ্ঠান সূচির মধ্য দিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ উৎসবকে সফল করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী কামিনী কুমার দেওয়ানকে সভাপতি, মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরকে সিনিয়র সহসভাপতি এবং তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের একমাত্র নির্বাচিত বাঙালি বৌদ্ধ সদস্য সুধাংশু বিমল বড়ুয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে এক শক্তিশালী বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, এই ঐতিহাসিক বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপন তিন মাসব্যাপী চলবে। রাউজানের জ্ঞানানন্দ বিহার প্রাঙ্গনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় এবং চট্টগ্রাম শহরে নিয়াজ (বর্তমান এম. এ. আজিজ) স্টেডিয়ামে হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। এছাড়াও মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিদিন কোনো না কোনো বৌদ্ধ বিহারে অনুষ্ঠান চলে। তিনমাসব্যাপী এ অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সে সময়কার পূর্ববঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী জনাব আবুল হোসেন সরকার। তিনি সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা প্রদান করেন, প্রতিটি বিহারে আলাদা আলাদাভাবে বুদ্ধজয়ন্তীর অনুষ্ঠান পালন হবে। এসব অনুষ্ঠানে সরকার আর্থিক অনুদানসহ অন্যান্য সহযোগিতা দিবেন। এরপর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধ পূর্ণিমা তথা উৎসব শুরু হয়।[২৭] উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বুদ্ধ পূর্ণিমা (Wesak or Vesak Full Moon Day) জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে উদ্‌যাপনের স্বীকৃতি লাভ করে।[২৮]

বাংলাদেশের ন্যায় ঢাকা শহরে প্রতিবছর যথাযোগ্য সম্মান, ভক্তি ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে প্রতিবছর এ উৎসব পালন করা হয়। ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলে আনন্দের সঙ্গে দিবসটি উপভোগ করে। এভাবেই বুদ্ধ পূর্ণিমা ঢাকা শহরে সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে এ দিনটি সর্ব সাধারণের জন্য সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় প্রধান পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকায় বিভিন্ন বৌদ্ধ সংগঠন থেকে ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা ধরণের আয়োজন করে থাকে।

ছবি: ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে সার্বজনীন বুদ্ধ পূর্ণিমায় প্রার্থনারত ঢাকা শহরের বৌদ্ধ অনুসারীরা

'বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' থেকে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে[২৯] ভোরে জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন, সকালে ভিক্ষু সংঘের প্রাতঃরাশ গ্রহণ, প্রভাত ফেরী, সমবেত প্রার্থনা, মহাসংঘদান ও স্বেচ্ছায় রক্তদান, শীল গ্রহণ, ভিক্ষু সংঘের পিণ্ডদান, সন্ধ্যায় পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ, প্রদীপ পূজা, ধর্মীয় আলোচনা সভা, বুদ্ধ পূজা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। আলোচনা সভায় দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো। এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর সব বিহারে সমন্বিত ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে বিভিন্ন বিহারে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদ শান্তি শোভাযাত্রার[৩০] আয়োজন করে থাকে। শোভাযাত্রাটি শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে শুরু হয়ে প্রেসক্লাবে শেষ হয়।

ছবি: ধর্মরাজিক বিহার কর্তৃক বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের শান্তির শোভাযাত্রা

দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে[৩১], মেরুল বাড্ডাতে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।[৩২] 'পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ' কর্তৃক আয়োজিত মিরপুরের শাক্যমুনি বিহার[৩৩] বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির ঢাকা অঞ্চলের রাজধানীর উত্তরার বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহার[৩৪], সাভার আন্তর্জাতিক বন বিহার[৩৫], বাংলাদেশ মারমা বুদ্ধিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের ধামরাইয়ের ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধবিহার[৩৬], নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার[৩৭] বাংলা বাজার বৌদ্ধ বিহার[৩৮] প্রজ্ঞানন্দ বৌদ্ধ বিহার[৩৯] বৌদ্ধ পূর্ণিমা আয়োজন করে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচারের[৪০] উদ্যোগে র‍্যালি আয়োজন করে এবং এই বিশ্বদ্যিালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক ১৮ মে ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হয়।

ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন সেমিনার সভাপতি অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের বুদ্ধ পূর্ণিমা ২০১৮উপলক্ষ্যে র‍্যালি

এছাড়া ঢাকায় অন্যান্য বৌদ্ধ সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সভা-সেমিনার, ম্যাগাজিন, স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, রেডিও- টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালাও সম্প্রচার করা হয়। দিনটিতে ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধরা ঘরে ঘরে নানা আয়োজন করে থাকেন এবং শুচিবস্ত্র পরিধান করে বিহারে যান।[৪১] উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বছর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশন (১৯৯০) দ্বিতীয় সভাপতি ড. সুকোমল বড়ুয়ার সময় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রথম বৌদ্ধদের শুভ বৌদ্ধ পূর্ণিমার সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। সংগঠন ভিত্তিক প্রথম এ প্রথা চালু করেন ড. সুকোমল বড়ুয়া।[৪২]

আষাঢ়ী পূর্ণিমা/ছোট প্রবারণা/ছোট ছাদাং/বর্ষাবাস[৪৩]:

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে ছোট প্রবারণা, ছোট ছাদাং (ছাদাং বর্মী শব্দ, অর্থ-উপোসথ) ও বর্ষাবাস বলা হয়।[৪৪] শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি বৈশাখী পূর্ণিমার মত সারা বিশ্বের বৌদ্ধদের অতীব পবিত্র ও ধর্মোৎসবের দিন।[৪৫] বাঙালি বৌদ্ধ তথা থেরবাদী বৌদ্ধদের নিকট চারটি প্রধান কারণে এ পূর্ণিমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা:

- ❖ সিদ্ধার্থের মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ
- ❖ মহাভিনিষ্ক্রিমণ
- ❖ বারাণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন
- ❖ বর্ষাবাস ব্রত অধিষ্ঠান।[৪৬]

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে কোশল রাজ্যের অধীনে শাক্যদের গণরাজ্যের রাজধানী কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের স্ত্রী, মায়াদেবীর, গর্ভে বোধিসত্ত্ব তূষিত স্বর্গ থেকে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় ভূমিষ্ট হয়ে (খ্রিঃ পূঃ ৬২৪ অথবা ৫৬৩) ২৯ বছর বয়সে চতুর্নিমিত্ত (জরা, ব্যাধি, মৃত ও গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী) দর্শন করে শুভ আষাঢ়ী

পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে গভীর রাতে মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। অতঃপর দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনান্তে আর এক বৈশাখী পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে (খ্রিঃপূঃ ৫৮৯ অথবা ৫২৮) ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধগয়াতে বোধিসত্ত্ব হলেন বুদ্ধ।[৪৭] তিনি সপ্ত সপ্তাহ সেখানে অতিক্রান্ত করার পর তাঁর অর্জিত জ্ঞান ঋষিপতন মৃগদাবে আধুনিক সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কৌণ্ডন্য, বপ্প, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিত মাধ্যমে সত্যধর্ম প্রচার শুরু করেন যা মহাপরিনির্বাণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ বছর প্রচার করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রথম নির্দেশনা দিয়েছিলেন[৪৮],

"চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়,
লোকানুকম্পায়, অত্থায হিতায, সুখায, দেব মনুস্সানং
...দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদি কল্লাণং
মজঝে কল্লানং, পরিযোসান কল্লাণং...পকাসেথ"

অর্থাৎ, হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য দেব মনুষ্যের কল্যানার্থে তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে যাও। আর এরকম ধর্ম নির্দেশনা করবে যেখানে আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ এবং অন্ত কল্যাণ রয়েছে।[৪৯] তিনি পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের উপসম্পাদনা প্রদান করলেন, প্রকাশ করলেন তাঁর সাধনালব্ধ সত্যজ্ঞান। পৃথিবীতে প্রকাশ পেল একটি নতুন বাস্তব ধর্মমত-যা পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বব্যাপী 'বৌদ্ধধর্ম' নামে পরিচিতি লাভ করে। সেদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে তথাগত বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাঝে যে নবধর্ম প্রকাশ করেছিলেন তা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র'[৫০] নামে অভিহিত। আষাঢ়ী পূর্ণিমার প্রধান ও সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল- এই দিবসেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিনয়-বিধান অনুসারে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান করেন এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাস সময়কাল এক বিহারে অবস্থান করেন। এই তিন মাস ভিক্ষুরা ধ্যান-সাধনা ও জ্ঞানচর্চায় ব্যাপৃত থেকে নিজেকে বুদ্ধের যোগ্য শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান। বিশেষ জরুরি কোন অবস্থা ছাড়া তাঁরা সাধারণত নিজ বিহার ছাড়া অন্যত্র রাত্রিযাপন করেন না। বুদ্ধের জীবদ্দশায় এই বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে অনুমতি নিয়ে পর্বতে, অরণ্যে বা গিরিগুহায় গিয়ে ধ্যান-সাধনা করতেন। যার যার পছন্দসই স্থান বেছে নিয়ে তিন মাস তাঁরা সেখানেই অবস্থান করতেন।[৫১] এই বর্ষাবাসের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বহু কিছু নির্ভরশীল। প্রথমত, এই তিনমাস বিনয় সম্মত বর্ষাবাসের দ্বারা ভিক্ষুদের বয়স নির্ধারিত হয়। ভিক্ষু জীবনের বয়সের উপর ভিত্তি করে ভিক্ষুরা স্থবির-মহাস্থবির অথবা থের-মহাথের পদে ভূষিত হন। দ্বিতীয়ত, বর্ষাবাস উদ্‌যাপনকারী ভিক্ষু দায়কগণের থেকে চতুপ্রত্যয় এবং সংশ্লিষ্ট বিহারে থাকার অধিকার লাভ করেন। তৃতীয়ত, একমাত্র বর্ষাব্রত উদ্‌যাপনকারী ভিক্ষু দায়কদের থেকে কঠিন চীবর লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন-যা বৌদ্ধ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান বা দানোত্তম কঠিন চীবর দান হিসেবে পরিচিত। গৃহীদের মধ্যে অনেকেই বিশেষত বয়োঃবৃদ্ধরা বর্ষাবাসের এ তিন মাসব্যাপী দান, ধর্মলোচনা, শীল পালন ও ধ্যান ভাবনায় রত থাকেন। সর্বোপরি, বর্ষাবাসের পর পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ

ও ব্রহ্মচর্য সহকারে বহুজনের হিত সুখের উদ্দেশ্যে এই সদ্ধর্ম সর্বদেশে প্রচার করতে মহাকারুণিক বুদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।[৫২]

মহাসাড়ম্বরে রাজধানীর সবুজবাগের ধর্মরাজিক বৌদ্ধমহাবিহার, মেরুল বাড্ডার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, আশুলিয়া বোধিজ্ঞান ভাবনাকেন্দ্র, মিরপুর শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ পূর্ণিমা আয়োজন করে থাকে। জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন, ভিক্ষু সঙ্ঘের প্রাতঃরাশ, অষ্টশীল গ্রহণ, বুদ্ধপূজা, সঙ্ঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান, ভিক্ষু সংঘকে পিণ্ডদান এবং উপাসক-উপাসিকা ও অতিথিদের দুপুরের ভোজ, ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র পাঠ, পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ, সদ্ধর্ম আলোচনা সভা, হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন, প্রদীপ পূজা ও আলোকসজ্জা ইত্যাদির আয়োজন হয়ে থাকে। দেশের অগ্রগতি সমৃদ্ধি, বিশ্ব-শান্তি এবং সমস্ত মানব জাতির তথা প্রাণিজগতের সুখ-শান্তি কামনায় বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ ত্রিরত্নের কাছে সমবেত প্রার্থনা ও মৈত্রী ভাবনা করা হয়। এতে উপাসক-উপাসিকা তথা সাধারণ গৃহীরা অংশ নেন।[৫৩] উল্লেখ্য যে, যে বিহারের ভিক্ষু বর্ষাবাস যাপন করবে না, সে বিহারে কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠান করা যাবে না। বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা সংঘারাম, বিহার ও সাধনা কেন্দ্র বেছে নেন।[৫৪] ঢাকা তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধরা যেন পূর্ণিমাকে অতি জাঁকজমকতার সাথে উদযাপন করতে পারে এজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর বৌদ্ধদের জন্য দিবসটি ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করে।[৫৫] এ দিবসটি উপলক্ষ্যে পত্রিকাতে আষাঢ়ী পূর্ণিমার উপর বিশেষ লেখা প্রকাশিত হয়। এছাড়াও রেডিও ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

এ দিনটি যেমন বৌদ্ধ বিশ্বের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন ঠিক তেমনি ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। কারণ ১৯৫৯ সালে ঢাকায় শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় জনসন রোডের ঢাকা জেলা পরিষদ হলে। মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গর্ভনর মেজর জেনারেল আযম খান। তিনি এর আগে বৌদ্ধদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখেননি। তিনি অনুষ্ঠানে যোগদান করে আবেগ আপ্লুত হয়ে যান। তিনি তখন আশ্বাস প্রদান করেন যে, ঢাকায় বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার অবশ্যই জমি প্রদান করবেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের দপ্তরে যায়। বলা যায়, এই পূর্ণিমাই ঢাকায় বৌদ্ধদের প্রথম বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঢাকায় প্রথম ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু হয়।[৫৬]

ভাদ্র পূর্ণিমা/ মধু পূর্ণিমাঃ

ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিই মধু পূর্ণিমা। সারাবিশ্বের বৌদ্ধদের জন্য অন্যতম এক শুভ তিথি। বুদ্ধ পারিলেয়্য বনে নির্জন বাসকালে প্রাণীদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে। সেখানে এক হাতি বুদ্ধের সেবায় রত হয়। এক বানর এই পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধকে মধু দান করে। পরে এই বানর ত্যাগ ও মহিমায় উদ্ভাসিত চিত্তে মৃত্যুবরণ করে দেবলোক উৎপন্ন হয়। সুতরাং সেবা ও ত্যাগের আদর্শ হিসেবে এই মধু পূর্ণিমা পালন করা হয়।[৫৭] বর্ষাবাসের দ্বিতীয় পূর্ণিমা ভাদ্র মাসে পূর্ণিমা তিথি বিশ্বে এটি মধু পূর্ণিমা নামে বেশি পরিচিত। এ দিনকে উপলক্ষ্য করে দেশের অন্যান্য বিহারের ন্যায় ঢাকার বিহারগুলোতেও মধু দানসহ নানা উৎসব ও আনন্দ এবং যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য দ্বারা পালিত হয়। সব বয়সের ও শ্রেণীর নর-নারীরা বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে মধু দান করার জন্য উৎসবে মেতে উঠে।[৫৮] মহামানব গৌতম বুদ্ধের সময়ে, তিনি পারিল্যেয় বনে অবস্থানকালে হস্তিরাজের সেবা ও বানরের মধুদানকে স্মরণ করে এই দিন বৌদ্ধরা ভিক্ষু সংঘদের মধু ও ভেষজ দান করে। এই দিন সকালে নানা বিহারে লাভী শ্রেষ্ঠ ভিক্ষু সীবলী পূজা ও সংঘদানের আয়োজন করে। এ উপলক্ষ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন (উইমেন্স)[৫৯] -এর পক্ষ থেকে নানা আয়োজন করা হয়ে থাকেন। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ধর্মরাজিক মহাবিহারে, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি (ঢাকা অঞ্চল) কর্তৃক বাংলাদেশ মহাবিহারে, পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের মিরপুরে শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার ও ঢাকার অন্যান্য বিহারে নানা আয়োজন করা হয়।[৬০] মেরুল বাড্ডায় আন্তজার্তিক বৌদ্ধ বিহারের ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত এ পূর্ণিমার কর্মসূচি উল্লেখ করা হলো:

জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন, ভিক্ষুসংঘের প্রাতঃরাশ গ্রহণ, বুদ্ধপূজা ও সংঘদান, ভিক্ষুসংঘের পিণ্ডদান প্রদান, অষ্টশীলধারীদের মধ্যাহ্নভোজ, বিকেলে ত্রিপিটক পাঠ, আলোচনা অনুষ্ঠান, মধুদান, মধুদান উৎসর্গ, প্রদীপ পূজা, বুদ্ধ কীর্তন ও হাজারবাতি উৎসর্গ এবং সবশেষে বিশ্বশান্তি কামনায় সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, বিহারগুলো আলোক সজ্জিত করা হয়।[৬১] এ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়। প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার দিবসটিকে বাংলাদেশে বসবাসরত সকল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করে।[৬২]

আশ্বিনী পূর্ণিমা/প্রবারণা পূর্ণিমা/বড় ছাদাং[৬৩]:

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা। আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভের পর আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত তিন মাস বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা উৎসব পালন করেন। সেই থেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরুরা বর্ষাবাস শেষে দিবসটি পালন করে আসছেন। তাই ভিক্ষু সংঘের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত শেষে আসে এ প্রবারণা তিথি। প্রবারণা অর্থ হলো- আত্ম-নিবেদনের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়া। এ তিথিতে

ভিক্ষুরা একে অন্যের কাছে দোষ স্বীকার করেন (যদি বর্ষাকালে কোনো দোষ করে থাকেন) এবং ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করা হয়।[৬৪] প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন থেকে এক মাস দেশের প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে শুরু হয় কঠিন চীবর দান উৎসব। এ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন' রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে দিনব্যাপী আয়োজন করে থাকে।

ছবি: বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস উড্ডয়ন

জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন, ভিক্ষু সংঘের প্রাতঃরাশ, মঙ্গলসূত্র পাঠ, বুদ্ধপূজা, পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গ উপসথ শীল গ্রহণ, মহাসংঘদান, অতিথি আপ্যায়ন, পবিত্র ত্রিপিটক থেকে পাঠ, আলোচনা সভা, প্রদীপ পূজা, আলোকসজ্জা, বিশ্বশান্তি কামনায় সম্মিলিত বুদ্ধোপাসনা, ফানুস উড়ানো ও বুদ্ধ কীর্তন। এছাড়াও বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে সবুজবাগ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, নানা ধরনের ধর্মীয় আয়োজনের মধ্যে আলোচনা উৎসব, প্রভাতফেরী ও ফানুস উত্তোলন করা হয়।[৬৫] সন্ধ্যার পর ফানুস উৎসবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই অংশগ্রহণ করেন। ফানুসে ফানুসে ছেয়ে যায় ঢাকার আকাশ।[৬৬] প্রবারণা উপলক্ষে মিরপুরস্থ শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহারে 'সমবেত প্রার্থনা ও মৈত্রী ভাবনা' শীর্ষক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এ কর্মসূচিতে সকল স্বধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকারা উপস্থিতি থাকে।[৬৭]

এ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। এ দিনেই তথাগত প্রথম শিষ্যদের মধ্যে কল্যাণ ধর্ম প্রচারের জন্য দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এদিন ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত শেষ হয় বলে তারা পরদিন থেকে বহুজনের হিত ও কল্যাণে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। এদিন ধর্মপ্রচার শুরু করার দিন নামেও

অভিহিত।[৬৮] অন্যান্য পূর্ণিমার ন্যায় এদিন বৌদ্ধ বিহারকে সাজানো হয়। অনেকে আবার বাড়ি-ঘরও সাজায়। প্রতিটি বিহারের প্রধান আকর্ষণ ফানুস উড্ডয়ন। এ সময় ঢাক-ঢোল, কাঁসা, বাঁশী, মন্দিরা ইত্যাদি বাজিয়ে শিশু-কিশোর আনন্দ করে এবং এর সাথে বয়োঃবৃদ্ধরা ফানুস উত্তোলনের সময় সমস্বরে সাধু-সাধু-সাধু বলে। এ দিবসে প্রতিটি বিহারে বুদ্ধের চুলধাতুকে স্মরণ করার নিমিত্তে আশ্বিনী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস ব্যাপী বিহার সংলগ্ন কোনো একটি গাছের শীর্ষে ধজাপতাকা ও আকাশ প্রদীপ উত্তোলন করা হয়। বর্তমানে প্রবারণাকে প্রীতি সম্মেলন বলা হয়। কেননা এদিনে গৃহীদের মধ্যে কিশোর-যুবক পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলির মাধ্যমে প্রবারণার শুভেচ্ছা জানায়। এ দিনে সবাই নববস্ত্র পরিধান করে বৌদ্ধ বিহারে যায়। বর্ষা শেষে শরতের স্নিগ্ধ আমেজ স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় হাসি আনন্দ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আর ভাবগাম্ভীর্যের ভেতর দিয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৬৯] এ দিনে প্রবারণার পূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পত্র-পত্রিকাতে বিশেষ লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

মাঘী পূর্ণিমাঃ

মাঘী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের অন্যতম ধর্মীয় তিথি। দিন ব্যাপী বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায় রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে এ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে। বৌদ্ধরা মাঘী পূর্ণিমা তিথিকে ভগবান বুদ্ধের স্কন্ধ নিবৃত্তি বা মহাপরিনির্বাণ দিন ঘোষণার স্মৃতি হিসেবে পালন করে থাকেন। এ পূর্ণিমা তিথিকে বুদ্ধের আয়ু সংস্কার তিথি বলা হয়। ভগবান গৌতম বুদ্ধ বৈশালীর চাপাল চৈত্য শিষ্য পরিবৃত্তয়ে ঘোষণা করেছিলেন তিনি অচিরেই অর্থাৎ সেই মাঘী পূর্ণিমা তিথি থেকে তিন মাস পর বৈশালী পূর্ণিমা তিথিতে পরিনির্বাণে নির্বাপিত হবেন। এ দিবসে তিনি আরও বলেছিলেন, "যে ভিক্ষুগণ অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান, শীলবান ও সুসমাহিত সংকল্পবদ্ধ হয়ে স্বীয় চিত্তকে সর্বদা এক উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করবে, আমার দ্বারা প্রকাশিত, সুব্যাখ্যাত, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ও ফলদানে কালাকাল মানে না এমন ধর্ম বিনয়ে যে অপ্রমত্ত হয়ে বিহরণ করবে সেই জন্ম তথা সংসার-চক্র অতিক্রম করে অনঘ মুক্তির স্বাদ লাভ করবে।"[৭০] এ দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকার মেরুল বাড্ডার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করে, ভিক্ষু সংঘের প্রাতঃরাশ গ্রহণ, বুদ্ধপূজা ও সীবলী মূর্তির জীবন্যাস, অষ্টপরিষ্কারসহ সংঘদান, ভিক্ষু সংঘের পিণ্ডদান, অতিথি ভোজন, পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ, আলোচনা সভা প্রভৃতি।[৭১] ঢাকার অন্যান্য বিহারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ-এর ঘোষণাকে মানসপটে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য নানা আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার বৌদ্ধদের জন্য এদিন ঐচ্ছিক ছুটি ঘোষণা করে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমাঃ

বুদ্ধত্ব লাভের একবছর পর গৌতমবুদ্ধ এ পবিত্র তিথিতে নিজ ভূমি কপিলাবস্তুতে আগমন করেছিলেন। তিনি তার জ্ঞাতিবর্গের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। বুদ্ধের স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এই দিনটি পালন করা হয়। এ তিথিকে জ্ঞাতি সম্মেলনের তিথিও বলা হয়। বুদ্ধ বলেছেন, 'জ্ঞাতিগণের ছায়া সুশীতল।'[৭২] এ দিবসটিতে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য বিহারে ধর্মসভা, আমোদ উৎসব, ধ্বজা পতাকা উত্তোলন, বুদ্ধ পূজা, ভিক্ষু সংঘকে আহার্য দান, শীলাদি গহণ, ধর্মালোচনা ও বিকেলে প্রদীপ পূজা আয়োজন করা হয়।[৭৩]

উল্লেখিত, পূর্ণিমা ছাড়া আরো কয়েকটি পূর্ণিমা উদযাপিত হয়। আলোচিত পূর্ণিমা ছাড়া অন্যান্য পূর্ণিমা কম-বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা-শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার এবং সিংহলে প্রথম ধর্মপ্রচারক ধর্মাশোকপুত্র মহিন্দ স্থবিরের পরিনির্বাণ। কার্তিকী পূর্ণিমা মূলত অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র মহাস্থবিরে মহাপরিনির্বাণ। মগধরাজ অজাতশত্রুর মত পরিবর্তন ও বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ। বুদ্ধের সিংহল যাত্রা। ঢাকা সহ ঢাকার বাহিরের বিভিন্ন বিহারে বুদ্ধ পূজা, শীল গ্রহণ, মৃতদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান, ভিক্ষুদের পিণ্ডদান, ধর্মশ্রবণ, প্রদীপ পূজা আয়োজন করা হয়।[৭৪]

কঠিন চীবর দানঃ

কঠিন চীবর দান বৌদ্ধদের জন্য এক পরম পবিত্র ও সর্বোচ্চ দানোৎসব। পৃথিবীর সর্ববিধ দান বস্তুর মধ্যে এই চীবর দানের ফল সর্বোত্তম, সর্বোকৃষ্ট, অতুলনীয় ও অপ্রমেয়।[৭৫] আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরদিন থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিন মাসব্যাপী ওয়া বা বর্ষাব্রত (উপোষ) পালন শেষে প্রবারণা পূর্ণিমার মধ্যদিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। এরপর প্রতিটি বিহারে শুরু হয় কঠিন চীবর দানোৎসব। বৌদ্ধধর্ম মতে, বুদ্ধের মহাউপাসিকা বিশাখার প্রবর্তিত ভান্তেদেরকে চীবর দান করাই হলো কঠিন চীবর দানোৎসবের ঐতিহ্য। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা রং করে চীবর তৈরি করা হয়। প্রথমে চরকার মাধ্যমে তুলা থেকে সুতা বের করে, সুতাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রং দিয়ে বেইনের মাধ্যমে তৈরি হয় চীবর (ভান্তেদের পরিধেয় বস্ত্র)। পরদিন বিকেলে এ চীবর দায়ক দায়িকেরা উৎসর্গ (দান) করেন ভান্তেদের উদ্দেশ্যে।[৭৬] গণ হিসেবে নূন্যতম পাঁচজন ভিক্ষু গ্রহণ করতে পারেন, তার কম হলে হবে না। উপাসক-উপাসিকা, ভিক্ষু-শ্রামণ সকলেই কঠিন চীবর দান করতে পারেন।

মূলত কঠিন চীবরের প্রবক্তা হলেন স্বয়ং বুদ্ধ। তবে এ বাংলায় ১৯১৫ সালে প্রথম কঠিন চীবর দানের সংস্কৃতি শুরু হয়। বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরের প্রণোদনায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া নাইখাইন বোধিসত্ত্ব বিহারে প্রথম কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে উল্লেখ আছে। ধীরে ধীরে আজ বাংলাদেশের প্রতিটি বৌদ্ধ বিহার ও জনপদ সাড়ম্বরে কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপন করে

থাকে এবং বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে।[৭৭] ঢাকা অঞ্চলের সকল বিহারে (আশুলিয়া বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র, প্রজ্ঞানন্দ বৌদ্ধ বিহার, বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহার মহাবিহার, শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার, নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার, সাভার বন বিহার, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান কমপ্লেক্স, আন্তজার্তিক বৌদ্ধ বিহার, বাংলাবাজার বৌদ্ধ বিহার, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার, গাজীপুর কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার) কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মিরপুরের শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহারে ৩১ তম দানোত্তম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান হয় ২০১৯ সালে। ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন, ভিক্ষুসংঘের প্রাতঃরাশ, পঞ্চশীল গ্রহণ, বুদ্ধ পূজা উৎসর্গ, বুদ্ধমূর্তি দান, অষ্টপরিষ্কার দান ও সংঘদান, ভিক্ষুসংঘের মধ্যাহ্ন ভোজন, সমাগত পুণ্যার্থীদের প্রীতিভোজ, শোভাযাত্রা সহকারে কঠিন চীবর ও কল্পতরু অনুষ্ঠান আণয়ন, ধর্মীয় সংগীত, ধর্মীয় আলোচনা ও বিশ্বশান্তির জন্য প্রদীপ পূজা করা হয়।[৭৮] ১৯৯০ সালে বাড্ডার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে প্রথম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।[৭৯] যেদিন যে বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হয় সে বিহারকে নতুনভাবে সাজানো হয়। এ দিনের শ্রেষ্ঠ চমক থাকে ধর্মসভা। বৌদ্ধ সমাজ ছাড়াও সমাজের বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণ এ ধর্মসভায় বুদ্ধের বাণী ও জীবন নিয়ে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রতি বছর একবারই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কঠিন চীবর দান হয় বলে বিহারের দায়ক-দায়িকা ও ধর্মপ্রাণ নর-নারী আগ্রহের সাথে এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এ উৎসব অত্যন্ত জমজমাট ও আকর্ষণীয় হয় রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় বলে। এছাড়াও সন্ধ্যায় ফানুসও উড়ানো হয়।[৮০]

চিত্র: বাড্ডায় আন্তজার্তিক বৌদ্ধ বিহারে উদযাপিত কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান

কঠিন চীবর উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিহার থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ঢাকা শহরে মূলত যেখানে স্থায়ী বিহার রয়েছে সেখানে বিহারাঙ্গনে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে অস্থায়ী বিহার রয়েছে সেখানে বিভিন্ন

কমিউনিটি সেন্টার বা হলে উৎসবের আয়োজন করা হয়। ঢাকা অঞ্চলের দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দান-২০১৯ অনুষ্ঠানের বিহারের নাম ও তারিখ ছকাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো[৮১]:

তারিখ	বার	বিহারের নাম	ঠিকানা
১৮-১০-২০১৯	শুক্রবার	আশুলিয়া বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র	আশুলিয়া, বঙ্গবন্ধু সড়ক, সাভার, ঢাকা।
১৯-১০-২০১৯	শনিবার	প্রজ্ঞানন্দ বৌদ্ধ বিহার	৫৬/১, প্রগতি স্মরণি, নর্দা বাস স্ট্যান্ড, নর্দা, ঢাকা।
২৫-১০-২০১৯	শুক্রবার	বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহার	প্লট-আর-২, সেক্টর-১৬ বি, উত্তরা ৩য় প্রকল্প, উত্তরা ।ঢাকা।
২৫-১০-২০১৯	শুক্রবার	শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার	প্লট নং-৪, ব্লক-এ, মেইন রোড, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
০১-১১-২০১৯	শুক্রবার	নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার	গ্রাম- দাপা, ইদ্রাকপুর, ডাকঘর-ফতুল্লা, জেলা-নারায়নগঞ্জ।
০৮-১১-২০১৯	শুক্রবার	আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার	মেরুল বাড্ডা, ঢাকা।
১০-১১-২০১৯	রবিবার	বাংলাবাজার বৌদ্ধ বিহার	১৭/৮, কে.জি. গুপ্ত লেন, লক্ষীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা।
১১-১১-২০১৯	সোমবার	ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার	অতীশ দীপংকর সড়ক, সবুজবাগ, কমলাপুর, ঢাকা।

বৌদ্ধদের ধর্মীয়-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসবগুলোর মধ্যে কঠিন চীবর দানের অবদান সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে উৎসবটি ধর্মীয় হলেও সামাজিক সম্মেলনের অন্যতম বাহনে রূপান্তরিত হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক সংহতি, সম্প্রীতির মিলনোৎসবের নাম কঠিন চীবর দান।[৮২]

বর্ষসংক্রান্তি ও বর্ষবরণ:

বুদ্ধ পূর্ণিমার চেয়ে চৈত্র সংক্রান্তি ও বর্ষবরণ গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। বৌদ্ধরা তিনদিন যাবত এ অনুষ্ঠান উদযাপন করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। ঘরে ঘরে পুরাতন আবর্জনার স্তূপ পুড়িয়ে বাড়ির আঙ্গিনা পরিস্কার করা হয়। ধর্মীয় আবহে বর্ষের প্রথম দিন পালন করে শুদ্ধ জীবন অনুশীলনের শপথ নিয়ে থাকে। ঐ দিন বৌদ্ধরা বিহারে গিয়ে বুদ্ধ মূর্তি ও বিহার পরিষ্কারের কাজ করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে স্নানপর্ব সারার জন্য বালক-বালিকারা জল ক্রীড়ায় মেতে উঠে। রাখাইন ও মারমা ছেলে-মেয়েরা এ উৎসবে সবচেয়ে বেশি জলোৎসব করে থাকে। বড়ুয়া বা চাকমা বৌদ্ধরা স্নান পর্ব উদযাপন করে। বর্ষ সংক্রান্তিকে মারমা ভাষায় 'সাংগ্রাই' বলা হয়। বৌদ্ধদের কাছে সংক্রান্তি বা সাংগ্রাইন উৎসব পালন করা হয়। এসময় বৌদ্ধরা মিথ্যা কথা বলে না, প্রাণী হত্যা করে না, শাক সবজির পাঁচন ও টক মিষ্টি দিয়ে খাবারের আয়োজন করে। এ দিনে নতুন জামা কাপড় পরিধান করে। বিভিন্ন খাবারের আয়োজন করে। এগুলোর মধ্যে খই, নাড়ু, মোয়া, নানারকম পিঠা, মিষ্টান্ন, শাক সবজি ও তিতা দিয়ে পাঁচন রান্না, নানা রকম শস্যের ভাজা মিশিয়ে 'আট কড়ইয়া' তৈরি করে।

বর্হিবিশ্বে বুদ্ধ পূর্ণিমাকে বৈশাখ বা ভেশাখ ডে হিসেবে পালন করে থাকে। সুতরাং বৌদ্ধদের সাথে বৈশাখের সম্পর্ক শুধু সাংস্কৃতিক নয়, ধর্মীয়ও। বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখের কথা বলতে গিয়ে সবাই ছায়ানট ও রমনার বটমূলের কথায় চলে আসে। লক্ষ্যনীয় যে, রমনার বৃক্ষটি বটগাছ নয়। এটি গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের সেই

জ্ঞান বৃক্ষ। এই গাছের নীচে বসে গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর ধ্যান করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। রমনার বটমূল (বোধি বা অশ্বত্থ) এ পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গিয়ে যারা ১৯৬৭ সালে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট রবীন্দ্র শিল্পী মিতা হকের প্রয়াত পিতা ওয়াহিদুর হক, সানজিদা খাতুন, ডঃ নওয়াজেশ আহমদ, কমল সিদ্দিকী, আনোয়ারুল হক পিয়ারু উল্লেখযোগ্য। ছায়ানটের পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান চালুর পিছনে কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাইরে সার্বজনীন ও ঐতিহ্য বিষয়ক পরিকল্পনাও তাঁদের মানসপটে বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে ছায়ানটের প্রধান উদ্যোক্তা ওয়াহিদুল হক তাঁর 'পহেলা বৈশাখ' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন,

> "মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ প্রাচ্যের প্রায় সবটা জুড়ে বৈশাখী নামের একটি বিরাট উৎসব আছে। এই বৈশাখী নামের ভিতর লুকিয়ে আছে সমস্ত প্রাচ্য জুড়ে ভারত সংস্কৃতির প্রভাবের সত্যটি, যে সংস্কৃতির মূল অংশে আমরা বাঙালিরা আছি জড়িয়ে। প্রায় সমগ্র মধ্য এশিয়া এক সময় বৌদ্ধ ছিল। সেই নিরশ্বরবাদী ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা অর্থাৎ যে তিথিতে বুদ্ধের জন্ম , বোধি প্রাপ্তি ও পরিনির্বাণ। এই তিথিতে আসলে বৈশাখী পূর্ণিমা, বৈশাখী উদিত চন্দ্রের পূর্ণচন্দ্র তথা বৈশাখী। প্রাচ্যের এমন জায়গা নেই যেখানে বৈশাখী নেই।"[৮৩]

বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বুদ্ধ পূজা, সংঘদান, বিশ্ব শান্তি কামনায় পরিত্রাণ পাঠ ও ধর্মালোচনার আয়োজন করা হয়।[৮৪]

ঢাকায় বসবাসরত আদিবাসী চাকমা সম্প্রদায়ের কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, তাদের অন্যতম "ফুল বিঝু" উৎসবটি ঢাকার মিরপুরে, বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজ ও সাভার বন বিহার নানা ধরণের আয়োজন করে থাকে। এ দিনটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, সংসদ ভবনের লেকে ও রবীন্দ্র সরোবরের লেকে ফুল ভাসানো হয়। যারা জীবনের প্রয়োজনে নগর কেন্দ্রিক জীবন যাপন করেন তারাঁই ঢাকাতে বৈসাবি উৎসব পালন করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বৈসাবী উৎসব ঢাকায় আয়োজন করে থাকে।

ছবি: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় ২০১৯ সালে বৈসাবী উৎসব উদযাপন

পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বজনীন সামাজিক অনুষ্ঠান এটি। তাই তারা ঢাকা শহরে র‍্যালিরও আয়োজন করে থাকে। র‍্যালিটি জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ পাশের মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে শুরু হয়ে বিজয় স্মরণী দিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যান সংলগ্ন ক্রিসেন্ট লেকে ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। র‍্যালিতে ঢাকায় বসবাসরত পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী, দেশি বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কয়েক'শ মানুষ অংশ নেন।[৮৫] ১২ এপ্রিল ২০১২ সালে সকালে জাদুঘরের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল উৎসবের। আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা নিজস্ব পোশাক ও ফুল হাতে বাদ্যের তালে তালে জগন্নাথ হলের পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। এই উৎসবকেই বলে "ফুল বিঝু"। প্লাস্টিকের থালায় সাজানো নানা রঙের গাঁদা ও গোলাপ ফুল। সুন্দর করে একেকজন ভাসিয়ে দিলেন ফুল ও পাপড়ি। এ উৎসব নিয়ে উপলক্ষে একজন আদিবাসী বৌদ্ধ বলেন, " আমাদের ফুল বিজুতে ফুল ভাসিয়ে সারা বছরের জন্য শুভকামনা করি।" এরপর সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয় এবং আদিবাসীদের তৈরি পিঠাও বিতরণ করা হয়।"

বৈসাবি শব্দটি মূলত ত্রিপুরাদের 'বৈসু', মারমাদের 'সাংগ্রাই', চাকমাদের 'বিজু', তঞ্চঙ্গ্যাদের 'বিষু', খিয়াংদের 'সাংলান', ম্রোদের 'সাংক্রান' ও চাকমাদের 'সাংগ্রাই' শব্দগুলো থেকে এসেছে। তবে এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ। আবহমান কাল ধরে ঐতিহ্যবাহী এ উৎসব পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায় পালন করে আসছে তাদের নিজস্ব রীতিতে। চৈত্রের শেষ দুই দিন এবং বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনকে ঘিরে এই "বৈসাবি" উৎসব পালিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক শিবাশীষ চাকমা বলেন, 'বৈসাবি মূলত তিন দিন ধরে পালন করা হয়। প্রথম দিন পাল ন হয় "ফুল বিঝু", দ্বিতীয় দিন পালন করা হয় "মূল বিঝু" এবং নববর্ষের দিন পালন করা হয় "কুজ্জবিজ্জু"। বৈসাবির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, "সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে সব শ্রেণির মধ্যে ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনা করা, অতীতের সব ভেদাভেদ হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরা এবং সব শ্রেণি ও জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন গড়ে তোলা।" আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা শহরে ২০১২ সাল থেকে প্রথম পালন করা হয় শুরু হয়।[৮৬]

সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কারদান:

ভিক্ষু, শ্রামণ, দায়ক-দায়িকা ও উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে যে কারো ও যেকোনো সময়ে সঙ্ঘদান করতে ইচ্ছে হলে সর্বনিম্ন চারজন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করে এ আচার পালন করা যায়। ভিক্ষু শ্রামণদের প্রয়োজনীয় অষ্টবিধ বস্তুকে অষ্টপরিষ্কার বলা হয়। যথা: সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, পাত্র, ক্ষুর, সূচ-সূতা, কটি বন্ধনী, জল ছাঁকিবার

গামছা।[৮৭] ঢাকায় বৌদ্ধ বিহারে অনেকে জ্ঞাতিজনের উদ্দেশ্যে এ দান করে থাকেন। কেউ বিহারে এসে পালন করেন এবং বাসায়ও এ আয়োজন করে থাকেন। দেখা যায়, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতকে নিমন্ত্রণ করা হয়, ফলে সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া নামকরণ, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন, বিদ্যারম্ভ, কর্ণছেদন ও অন্নপ্রাসনে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কারের আয়োজন করা হয়।

বিবাহঃ

বাংলাদেশের বাঙালি বৌদ্ধরা একটি ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়। বাঙালি হিসেবে তাদের জীবনধারায় অন্যান্য বাঙালি সম্প্রদায়ের সাথে মিল থাকলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আছে স্বাতন্ত্র্যতা। এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য আলাদা সম্প্রদায়। বৌদ্ধ বিবাহ স্বাতন্ত্র্যের ধারায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৌদ্ধ বিবাহ খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বৌদ্ধধর্ম ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই এর ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। *জাতক* সাহিত্য ও চর্যাপদে বৌদ্ধ বিবাহের উল্লেখ আছে। বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। বাঙালি বৌদ্ধরা তাদের নিজস্ব রীতি-নীতি অনুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন করেন। সমতলীয় বৌদ্ধ ও আদিবাসী বৌদ্ধরা তাদের নিজস্ব নিয়ম রীতি অনুযায়ী বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে। তবে ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধদের বিয়ে অধিকাংশ ক্লাবে অথবা কমিউনিটি সেন্টারে সম্পন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বৌদ্ধ বিবাহ সাধারণত রাতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ছবি: ঢাকা শহরের আন্তজার্তিক বৌদ্ধ বিহারে পঞ্চশীলে প্রার্থনারত নবদম্পতি

দিনের বেলায় আশীর্বাদ, নামানী, গায়ে হলুদ ইত্যাদি হয়। ঢাকায় নতুন বর-কনেরা বিহারে যায় সেখানে বুদ্ধমূর্তিকে বন্দনা করে, পূজা দেয় এবং তার সামনে বাতি জ্বালায়। ভিক্ষুরা বর-কনেকে শীল প্রদান করে তারপর মঙ্গলসূত্র আবৃত্তি করে। সুত্রপাঠের পর সুত্রপুত সুতা দিয়ে তৈরী মঙ্গল সুতা বরকনের গলায় এবং অন্যান্যদের

হাতে পরিয়ে দেয়া হয়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় বিধান মতে দম্পতি হিসেবে ভিক্ষুসংঘ দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সংসার জীবনে প্রবেশের পূর্বে ধর্মীয় গুরুদের আর্শীবাদ ও উপদেশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[৮৮] ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের বিয়ে নিয়ে মেরুল বাড্ডার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের প্রধান ধর্মগুরু ধর্মমিত্র মহাথেরো এক সাক্ষাৎকারে বিডিনিউজ২৪.কমকে (জানু. ১২, ২০১৪) বলেন: "প্রথমত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পর সামাজিকভাবে সবাইকে জানিয়ে তারিখ ঠিক করে বৌদ্ধ বিহারে পাত্র-পাত্রীকে নিয়ে আসা হয়। এখানে মঙ্গল প্রজ্বলিত জ্বালিয়ে বুদ্ধের পূজা করা হয়। ত্রিশিরণ, পঞ্চশীল পূজার মাধ্যমে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের আর্শিবাদ গ্রহণের মাধ্যমে বৌদ্ধ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এরপর একজন গৃহী তাদের সামাজিক অনুশাসন প্রদান করে। এছাড়া অনেকে কোট ম্যারেজ ও বিশেষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।"

অনিত্যসভা:

মৃত ব্যক্তির সৎকার করাকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। বৌদ্ধরা এ অনুষ্ঠান সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির সংমিশ্রণে সম্পাদন করে থাকে। বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বেশ জাঁকজমকের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ভিক্ষুরা উপস্থিত থাকেন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরা থাকেন। এরা মৃত বক্তির পর্যালোচনা করেন অনিত্যধর্মের উপর ধর্মদেশনা করেন। যদি মৃত ব্যক্তি তাঁর কাজ কর্মে অধিকতর পরিচিতি লাভ করে থাকেন তাহলে মৃত আসরে ভিক্ষু-সংঘসহ বহু নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন এবং তার প্রতি সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করেন। অবশেষে, পুণ্যানুমোদনের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। মৃতদেহ সমাহিত করা কিংবা দাহ করার ব্যাপারে বৌদ্ধধর্মে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। খুব কম বয়সী ছেলে মেয়ের মৃত দেহ সমাহিত বা মাটি চাপা দেওয়া হয় আর বড়দেরকে দাহ করা হয়। ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের অনিত্যসভা অধিকাংশই বিহারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

ছবি: আশুলিয়া বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত অনিত্যসভা

অনেক সময় ঢাকায় রাজারবাগ শশ্মানে বা আশুলিয়াতে বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্রে সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে অনেকেই গ্রামের বাড়িতে মৃতদেহ নিয়ে যায়।[৮৬]

২০১৫ সালের ১১ ডিসেম্বও আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় পার্বত্য মেলা শুরু হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীব-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্যাদি তুলে ধরা হয়। মেলায় সমতলের সাথে আদিবাসীর মেলবন্ধন তৈরি করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ মেলার আয়োজন করে থাকে।

ছবি ও সূত্র: রাজধানীতে ২০১৫ সালের পার্বত্য মেলার প্রধান ফটক। 'পার্বত্য মেলা শুরু হচ্ছে আজ', https://www.bhorerkagoj.com, Dec 7, 2017

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ধর্মগুলোর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম প্রবর্তনের পর থেকে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, নিয়মনীতি ও নিজস্ব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সুসংগঠিত হয়েছে। সে সময়ে টিকে থাকা অন্য ধর্মগুলোর দ্বারাও কখনও কখনও প্রভাবিত হয়েছে। তবুও কালের পরিক্রমায় হাজারো পরিবর্তনের ভিড়েও টিকে রয়েছে বৌদ্ধদের অনেক আচার-অনুষ্ঠান, পালিত হচ্ছে তাদের নিজস্ব নিয়মানুসারে। এছাড়াও এ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন নিমার্ণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উৎসবানুষ্ঠানের অন্যতম দিক হিসেবে রয়েছে সার্বজনীনতা। পরিলক্ষিত যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগ পূর্ণিমা, দান এবং বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা। তাছাড়াও বৌদ্ধদের উল্লেখযোগ্য উৎসব বর্ষবরণ এবং কিছু দান উৎসব। সুতরাং, বছর জুড়ে সবসময়ই বৌদ্ধ সমাজে উৎসবমুখরতা লেগেই থাকে। ঢাকা শহরের বসবাসরত বৌদ্ধ অনুসারীরা

তাঁদের উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। তবে ঢাকার বাহিরে উৎসব উদযাপনে বৌদ্ধ অনুসারীরা সময় নিয়ে পালন করেন কিন্তু শহরের ব্যস্তময় জীবনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব শেষ করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. 'পূজা' বহুল পরিচিত একটি শব্দ যা বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে এ রীতি প্রচলন হয়ে আসছে। এটি মূলত অর্চনা, আরাধনা, ভক্তি প্রদর্শন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত। সকল দেব-এর মধ্যে দেবেন্দ্র, অসুরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও মানবের মধ্যে মহারাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, শাক্যরাজ, মল্লরাজ, লিচ্ছবীরাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যথাশক্তি পূজা করেছিলেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের পর প্রায় ২১৮ বৎসর পর সম্রাট অশোক ৯৬ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপে ৮৪,০০০ (চুরাশি হাজার) বিহার ও স্তূপনির্মাণ করেন। বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধ লোকসংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা), পৃ. ৪৯

২. {পর্বন্+অ (অণ্)} শব্দের অর্থ উৎসব। মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ১৮ তম সংস্করণ (ঢাকা: ২০১১, বাংলা একাডেমি), পৃ.৭৪৯

৩. সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হলো 'উৎসব'। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ । এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন- আনন্দানুষ্ঠান, পর্ব, আনন্দানুভূতি, আহ্লাদ ইত্যাদি। যা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে সহায়তা করে। সুতরাং উৎসব হলো চিত্ত বিনোদনের অন্যতম প্রধান উদ্দীপনার জ্বালানি। বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০২০, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন), পৃ. ২২৭

৪. সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, *বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৮, বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভা), পৃ. ১০৭

৫. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৩

৬. থেরবাদ আদি ও মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মদর্শন। পালি 'থের' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। 'থের' শব্দের অর্থ স্থবির, স্থিত, স্থিতধী, স্থিতিশীল ইত্যাদি। অর্থাৎ, যিনি সংসার ত্যাগপূর্বক ভিক্ষুত্বে উপনীত হয়ে কমপক্ষে দশ বছর নিরন্তর ব্রহ্মচর্য পালনে স্থিতিশীল থাকেন তাঁকেই বলা হয় 'স্থবির' বা 'থের'। কথিত হয় যে, গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রথম সঙ্গীতিতে (সম্মেলনে) এ রীতির প্রচলন হয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে এখনও এ ধারা বর্তমান। ভিক্ষুসংঘের এ 'থের' অভিধা থেকেই 'থেরবাদ' শব্দের অভ্যুদয়। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের গোড়া পত্তন হয়। সে সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান নির্দেশক স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। পরবর্তীতে বুদ্ধ প্রদত্ত বাণী ও নির্দেশনার সংকলনে তৈরি হয় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ *ত্রিপিটক*। *ত্রিপিটকে* বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ছাড়াও বৌদ্ধধর্মের প্রধান ধারক ও বাহক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনাচারের প্রতিটি বিষয়ের নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত আছে। পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত

আদি ও মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মাচার ও দর্শনকেই বলা হয় থেরবাদ। সুমন কান্তি বড়ুয়া, 'থেরবাদ', http://bn.banglapedia.org, ৬ জানুয়ারি, ২০১৫

৭. জয়নাল হোসেন, *মানবপুত্র গৌতম ধর্ম ও জীবনাচার* (ঢাকা: ২০১৩, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন), পৃ. ৮৭

৮. জগন্নাথ বড়ুয়া, *'বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান'*, https://banglanewsmag.blogpost.com, Nov 2, 2014

৯. অশোক বিশ্বাস, *বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৫, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৬০

১০. খ্রিস্টিয় ৫ম শতকে শ্রীলংকায় পালি ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থ। বুদ্ধের পূর্বজন্ম ও বর্তমান জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ধর্ম্মপাল ভিক্ষু, *জাতক নিদান*, প্রথম সংস্করণ (কলিকাতা: ২৫০৬ বুদ্দাব্দ, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার), পৃ. ৫

১১. অল্পবয়সে যখন সিদ্ধার্থ গৌতম মাতৃহারা হলেন তখন মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে তিনি লালিত পালিত হয়। সিদ্ধার্থের বাবা রাজা শুদ্ধোধন কখনো পুত্রকে রেখে কোথাও যেতেন না, একান্ত প্রয়োজন হলে তাকে সাথে নিয়ে যেতেন। কপিলাবস্তু নগরে হলকর্ষণ উৎসবের আয়োজন হলে রাজা শুদ্ধোধন পুত্রকে নিয়ে সে আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। পুরো নগরে সুসজ্জিত করা হয়। সকলেই নতুন পোষাক পরিধান করে উৎসবে যোগদান করেন। রাজা প্রতিবছর এ উৎসবে এক সহস্র লাঙ্গল যোগদান করেন কিন্তু সে বৎসর তিনি অষ্টশত লাঙ্গল যোগদান করেছিলেন। বাৎসরিক উৎসব হিসেবে বিশেষ আকর্ষণ থাকে। নৃত্য, গীত ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হতো। রাজা সেদিন পরিজনবর্গসহ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে ঘন পত্র-পল্লব ও শীতল ছায়াযুক্ত একটি জম্বুবৃক্ষ ছিল। সেই গাছের ছায়াতে রাজা কুমারের শয্যাসন রচনা করে উপরিভাগে সুবর্ণ তারকা-খচিত চন্দ্রাতপ টানিয়ে ও চতুর্দিকে যবনিকা-বেষ্টনী দ্বারা বেষ্টিত করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত করে রাজা এই কর্ষণোৎসবের পৌরহিত্য করলেন। রক্ষকেরা ও ক্রমে উৎসব উপভোগ করতে করতে কুমারকে ফেলে অন্যত্র চলে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন কর্ষিত ভূমির উপর মৃত ও জীবিত অগণিত কীট পতঙ্গ। উড়ন্ত পাখীগুলো সেসব কীট পতঙ্গ ধরে ধরে খাচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থ চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ভাবলেন, জীব করছে জীবিকার জন্য জীবের বিনাশ। তখন আনন্দঘন পরিবেশ হয়ে গেল তার কাছে অর্থহীন। সিদ্ধার্থ সেখানেই গভীর ধ্যানে নিমজ্জিত হয়ে গেলো। তখন পরিচারিকাগণ ফিরে এসে এ পরিস্থিতি দেখতে পেল এবং রাজাকে সব জানাল। রাজা অবস্থা দেখে ঋষি কালদেবল ও ব্রাহ্মণের ভবিষদ্বাণী মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি জোড় হস্তে দ্বিতীয়বার বন্দনা করলেন আপন সন্তানকে। রণধীর বড়ুয়া, *মহামানব বুদ্ধ*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম:

১৯৮৫), পৃ. ২৭ ও ২৮ ও সুকোমল চৌধুরী, সম্পাদিত, *মহামানব গৌতম বুদ্ধ*, প্রথম প্রকাশ (কোলকাতা: ২০০৮, মহাবোধি বুক এজেন্সি), পৃ. ১৮ ও ১৯

১২. ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ষষ্ঠ মুদ্রণ (কলিকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৬৬

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

১৫. ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (প্রথম খণ্ড)*, ষষ্ঠ মুদ্রণ (কলকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ১৫৪

১৬. ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (পঞ্চম খণ্ড)*, পঞ্চম মুদ্রণ (কলকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৯০

১৭. ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (তৃতীয় খণ্ড)*, *চতুর্থ মুদ্রণ* (কলকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ১৬৫

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

১৯. ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (প্রথম খণ্ড)*, ষষ্ঠ মুদ্রণ (কলকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ১৫৪

২০. ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (তৃতীয় খণ্ড)* (কলকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ২৫২

২১. শিমুল বড়ুয়া, *বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম: ২০১২, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী), পৃ. ১২২, ১২৩ ও ১২৪

২২. সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (কলিকাতা: বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৮০, স্বারস্বত লাইব্রেরী), পৃ. ৬৪

২৩. সুনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমি), পৃ. ২৩৫

২৪. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ২০০৬), পৃ. ৬৩

২৫. কাঞ্চন, মোহাঃ সামসুদ্দিন, আন্তর্জাতিক সংযোগ ব্যবস্থা, https://m.facebook.com>post, Serampore My Love, Apr 29, 2018

২৬. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, অনুপম বড়ুয়া (সম্পাদিত), *সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের-এর স্মৃতিকথা সংকলন (ব্যক্ত হোক জীবনের জয়-গ্রন্থের আলোকে)*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৮), পৃ. ২৭৪, ২৭৫ ও ২৭৬

২৭. শিমুল বড়ুয়া, *বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, (চট্টগ্রাম: ২০১২, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী), পৃ. ১২৫

২৮. ঢাকায় প্রথম বৌদ্ধবিহার ২৪ তম মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার। রাজধানী ঢাকার সবুজবাগের বাসাবোতে অবস্থিত। এই বৌদ্ধ বিহারে হাজার হাজার ধর্মীয় আচার পালন করা হয়। প্রায় দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢাকায় অবস্থিত দেশি-বিদেশি বৌদ্ধদের ধর্মীয় কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এ বিহারটি। ১৯৬২ সালে প্রথম একজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল সস্ত্রীক এ বিহার পরিদর্শন করেন। তাঁদের আগমন উপলক্ষে বিহারে নির্মাণ করা হয় একটি প্রার্থনা হল, যার নাম 'অতীশ দীপংকর প্রার্থনা হল'। এরপর থেকে দেশি-বিদেশি নানা ধর্ম ও বর্ণের সুধীবৃন্দের আগমনে এ বিহারের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ফলে এটি একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ বিহারে বহু প্রাচীন ও মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। তন্মোধ্যে ১৯৮৪ সালে থাইল্যান্ডের ধর্মাধিরাজ মহামুনি প্রদত্ত ১০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কালো রঙের ব্রোঞ্জের বিশাল বুদ্ধমূর্তি এবং জাপানের প্রখ্যাত ধর্মগুরু ন্যাকায়সা প্রদত্ত ২ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট সুবর্ণবর্ণের বুদ্ধমূর্তি উল্লেখযোগ্য। বিহারের প্রতিষ্ঠা বছরই এখানে স্থাপিত হয় ধর্মরাজিক পালি কলেজ। স্বাধীনতার পর যুদ্ধাহত ও অসহায় পরিবারের শিশু সন্তানদের জন্য গড়ে তোলা হয় ধর্মরাজিক অনাথালয়। পর্যায়ক্রমে ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭২), ধর্মরাজিক কিন্ডার গার্টেন (১৯৯৩), ধর্মরাজিক ললিতকলা একাডেমি (১৯৯৫), ধর্মরাজিক নিক্কিউনিয়ানো ক্লিনিক (১৯৯৬), ধর্মরাজিক আন্তর্জাতিক উপাসনা হল (১৯৯৬)। ঢাকাবাসী বৌদ্ধরা এখানে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান এ বিহারে করে থাকে। পাঁচ শতাধিক অনাথ ও অর্ধ শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে বর্তমান একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ হয়েছে। সুকোমল বড়ুয়া, 'মহাথের বিশুদ্ধানন্দ', http://banglapedia.org, ৩ মার্চ, ২০১৫

২৯. বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা, বাংলাদেশ মানবীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও লালনই আমাদের লক্ষ্য-এ মূলমন্ত্র নিয়ে প্রতিবছর শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা শান্তি শোভাযাত্রা ও সম্প্রীতি উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। এ শোভাযাত্রায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের-মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বৌদ্ধ সংগঠনের শীর্ষনেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। আদিবাসী বৌদ্ধরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের পোশাক পরিধান করে এ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। (বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক ২০১৯ এর শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা সম্মিলিত শান্তি শোভাযাত্রা ও সম্প্রীতি উৎসবের লিফলেট থেকে তথ্য নেয়া)।

৩০. স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আরেকটি বিহার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে ১৯৮১ সালে মহামান্য সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরো এবং বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত মাননীয় শান্তপদ মহাথের-এর অনুপ্রেরণায় শ্রীমৎ

সুন্দরানন্দ ভিক্ষু (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া) ঢাকায় আসেন। তাঁর আহ্বানে ঢাকাবাসী কতিপয় বিশিষ্ট বৌদ্ধ সুধীজন নিয়ে ১৯৮১ সালে ২০ জুলাই খিলগাঁও মালিবাগস্থ ডি আই জি এস কে চৌধুরীর বাসভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কমিটি' এবং স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ ভিক্ষুকে আহ্বায়ক করে 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কমিটি' নামে এডহক কমিটি গঠন করা হয়। সেই বৈঠকে সকলের সিদ্ধান্তক্রমে শ্রীমৎ সুনন্দরানন্দ ভিক্ষুকে বিহারাধ্যক্ষ করা হয় এবং মালিবাগ রেল ক্রসিং এর পাশে ১১৫/এ বাসাটি অস্থায়ী বিহার হিসেবে ভাড়া নিয়ে ঢাকাবাসী সকলের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮২ সালে ১০ অক্টোবর দিনটি ঢাকাবাসী বৌদ্ধদের জন্য একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে কারণ সেদিন ফার্মগেটস্থ তেজগাঁও কলেজে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ শান্তপদ মহাথের (প্রয়াত) ও সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার যুব-এর সভাপতি শ্রীমৎ অজিতানন্দ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এস কে চৌধুরীকে সভাপতি ও বিশ্বপতি বড়ুয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কমিটি' গঠন করা হয়। এত সর্বাঙ্গীনভাবে দায়িত্ব পালন করেন সুন্দরানন্দ ভিক্ষু। তাঁর মাধ্যমে আজকের বুদ্ধানন্দ মহাস্থবির সেদিন ঢাকায় আসছিলেন, এরপর ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় এসছিলেন। বিহার নির্মাণে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে সুনন্দারন্দ ভিক্ষু পি.এইচডির জন্য ভারতে চলে গেলে ১৯৮৪ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর এক সভায় আন্তর্জাতিক মানের বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৪ সালে ১৬ নভেম্বর সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসাধরণের এক সভায় খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদন পায় এবং ২৫ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন-এর নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকা তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সহযোগিতায় সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেডারেশন বৌদ্ধদের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কমিটির ধারাবাহিকতায় আজকের ঢাকায় মেরুল বাড্ডায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার (১৯৮৫)। সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ: ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর* , প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) পৃ. ১৪৯, ১৫০ ও ১৫১

৩১. 'আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা', https://www.bhorerkagoj.com, মে ১৮, ২০১৯

৩২. আজ থেকে তেঁতাল্লিশ বছর আগে ঢাকা শহরের বুকে সমতল ও আদিবাসী বৌদ্ধদের নিত্য নৈমিত্তিক পূজার্চনা, প্রার্থনা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রাতপালনের জন্য একটি মাত্র বৌদ্ধ মন্দির অবস্থিত ছিল। সেটি হল কমলাপুর ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ মহাবিহার। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী বৌদ্ধ

জনগোষ্ঠীর স্বকীয় বৌদ্ধিক সংস্কৃতির আবহে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য নিজস্ব বৌদ্ধ মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা ও তাগিদ অগ্রজ বিমল তিষ্য মহোদয় উপলব্ধি করে আসছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় পরিচালিত ও অক্লান্ত পরিশ্রমে 'পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘে'র আবির্ভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. নীরু কুমার চাকমা, চাকমা রাজা ত্রিদিপ রায় মহোদয়ের মাতা বিনীতা রায় মহোদয়কে নিয়োগ করা হয় এবং তার একান্ত সচিব তখনকার আদিবাসী চাকমা সমাজের অন্যতম উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা মিঃ শরদেন্দু শেখর চাকমা, তারাচরণ চাকমা ও বিমল তিষ্য ভিক্ষুকে নানাভাবে সর্বত্মক সহযোগিতা করেন। ১৯৭৬ সালে খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর ঢাকার গ্রীনরোডস্থ হামিদুল হক চৌধুরীল বাড়িতে তখনকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় ছাত্রাবাসে 'পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘে'র জন্ম হয়। তাদের কল্যাণে আট বছর প্রচেষ্টার ফলে মিরপুর ১৩ এ একটি বৌদ্ধ মন্দির র্নিমাণের লক্ষে 'পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘে'র নামে অগ্রজ ০.৭৭ বিঘা পরিমাণ জায়গা প্রচলিত সেলামীর বিনিময়ে বরাদ্দ পেতে সক্ষম রাষ্ট্রপতির বদান্যতায়। অতঃপর 'শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ শুরু হয়। এ বিহার প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদানের কথা উল্লেখ না করলে নয় তারা হলেন: তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপজাতীয় বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা বাবু উপেন্দ্রলাল চাকমা, রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপদেষ্টা বাবু সুবিমল দেওয়ান, রাজমাতা বিনীতা রায়, বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ও শুদ্ধানন্দ মহাথেরো। এছাড়া অনুত্তর ভিক্ষুসংঘ ও পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের সদস্যদের অবদান স্মরণীয়। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী 'শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহারে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ ও শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহারের দায়িত্ব প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুর কাছে পৌঁছায়। ১৯৮৭ সালে জানুয়ারি মাসে ১২ তারিখ পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের একটি সাধারণ সভা হয়। সেই সভায় প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও বিহারের অধ্যক্ষ বানানো হয়। প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো, 'শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার', https://www.jumjournal.com, Mar 12, 2020

৩৩. বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি হলো সবচেয়ে পুরনো সংগঠন হলো বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৭। বার্মার সারমিত্র (সারমেধ) মহাস্থবিরের নেতৃত্বে ১৮৬৪ সালে এই অঞ্চলের ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে। তান্ত্রিকতার বেড়াজাল থেকে বৌদ্ধ সমাজকে মুক্ত করার নিরলস প্রয়াস চলান তিনি। এর প্রায় ২৩ বছর পর গঠিত সংগঠনটি তিন ভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থানে তাদের কর্মপ্রক্রিয়া অব্যহত রেখেছে। সমিতির শুরু বৃটিশ ভারতে (চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি), মাঝখানে পাকিস্তান (পাকিস্তান বৌদ্ধ সমিতি) এবং স্বাধীনতা লাভের পর বর্তমান (বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি)। এই তিন অবস্থানের পারিপার্শ্বিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও তাদের তাৎপরতার একটি প্রধান দিক হলো এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের নির্বিঘ্ন চর্চা নিশ্চিত করা ও বৌদ্ধ জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। শুরু থেকে সমিতির প্রধান কার্যালয়

চট্টগ্রামে অবস্থিত, তবে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এর শাখা কার্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি-ঢাকা অঞ্চল ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন থেকে বিহার প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহার। ২০১৫ সালে এ বিহারটি নির্মাণ করেন। বিহারটি প্লট-আর-২, সেক্টর-১৬ বি, উত্তরা ৩য় প্রকল্প, ঢাকায় অবস্থিত। চিন্ময় মুৎসুদ্দী, জাতীয় বৌদ্ধ সংগঠনের স্বরূপ, চারুলতা, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা (১৯৯৬-২০০৭), সংকলিত ২৫, পৃ. ১৫, বৈশালী, শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব-২০১২, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া (জানুয়ারি ২০০৩), "বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি", বাংলাপিডিয়া, সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ, সৌম্য-২০১৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের ম্যাগাজিন, পৃ. ১৫

৩৪. ২০১৫ সালে নির্মিত এ বিহারটির অবস্থান দক্ষিণ গাজীরচট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

৩৫. ১৯৭৮ সালে ঢাকায় বসবাসরত চাকুরে, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মারমা সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্যোগে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে এই সমিতিকে ১৮৬০ সালের সোসাইটি অ্যাক্ট এর ২১ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ এ সমিতিকে ১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায় সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগে রেজিস্ট্রি করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এ সংগঠনটি। ২০০১ সালে মৌজা দক্ষিণ পাড়া, ধামরাই, সাভারে এ সংগঠন থেকে ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করা হয়। বিহারকে কেন্দ্র করে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এছে যার নাম জ্যোতিবিদ্যা নিকেতন। পাঁচতলা স্কুল বিল্ডিং আছে এবং শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য দুটি হোস্টেল রয়েছে। চাইন্দাওয়ারা ভিক্ষু, সাধারণ সম্পাদক, *সম্বোধি*, বাংলাদেশ মারমা বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ. ২৯, Dilip Kumar Barua, Shantu Barua, Yusho Wakahara, Kensuke Okaoto, *Directory of Buddhist Monasteries In Bangladesh* (A Provisional Edition) (Japan, 2014, Research Centre for Buddhist Cultures in Asia), pg. 108

৩৬. ২০১২ সালে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার দাপা ইন্দ্রাকপুরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রথম বৌদ্ধ বিহার ও ড. শাসন রক্ষিত ধ্যানকেন্দ্র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ বিহারের ভূমি দাতা বিদর্শনাচার্য ডঃ শাসনরক্ষিত মহাস্থবির, প্রাক্তন অধ্যাপক, পালি ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ভদন্ত চন্দ্রবংশ ভিক্ষু। তথ্য সংগ্রহ: (নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রিয় বুদ্ধ বিহার ও ড. শাসনরক্ষিত ধ্যানকেন্দ্রের আর্থিক সাহয্যের আবেদনপত্র থেকে)

৩৭. আন্তর্জাতিক শান্তিকুঞ্জ ভাবনা কেন্দ্র (বাংলা বাজার বুদ্ধ বিহার), ১৭/৮, কে. জি গুপ্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, সূত্রাপুর-১১০০। ১৬-০৬-২০১৭ ইং তারিখে এ বিহারে উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশ বৌদ্ধদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু উপসংঘরাজ প্রিয়ানন্দ মহাথের ও এ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

পালি বিভাগের চেয়ারম্যান জিনবোধি মহাথের। International Shantikunja Meditation Centre, Dhaka এর ফেসবুক পেজ থেকে নেয়া।

৩৮. ৫৬/১, প্রগতি স্মরণি, নর্দা বাস স্ট্যান্ড, গুলশান, ঢাকাতে প্রজ্ঞানন্দ বিহার অবস্থিত। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি ঢাকা অঞ্চল কর্তৃক নির্মিত প্রজ্ঞানন্দ বৌদ্ধ বিহার।

৩৯. ২০০৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচার' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান সুকোমল বড়ুয়ার উদ্যোগে এ সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন), পৃ. ১৯৭

৪০. রোমানা পাপড়ি, 'তাৎপর্যপূর্ণ বুদ্ধপূর্ণিমা', *করোনাময় উদযাপন*, প্রথম আলো (নাগরিক সংবাদ), https://www.prothomalo.com, ৬ মে ২০২০

৪১. সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ: ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন), পৃ. ১৫১

৪২. প্রাগুক্ত, *বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১২৫

৪৩. কাদের মাহমুদ, *বৌদ্ধত্ব পরিচয়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, নভেল পাবলিশিং হাউস), পৃ. ১৯০

৪৪. সুদর্শন বড়ুয়া, *সদ্ধর্ম শিক্ষানীতি*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ২০০১), পৃ. ২২২

৪৫. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, পৃ. ২৩৭

৪৬. বৌদ্ধধর্মীয় একটি সংগঠন। ১৯৪৯ সালের ৪ ডিসেম্বর পটিয়ার লাখেরা অভয় বিহারে 'পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীন হওয়ার পর বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ নামে পরিচিত হয়। সে সেময়ে সংগঠনের সভাপতি ছিলেন শ্রীমৎ ধর্মদর্শী মহাথেরো ও শ্রীমৎ বংগীশ ভিক্ষু। সে সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বৌদ্ধদের নানা দাবি আদায়ের জন্য কাজ করে চলেছে। ১৯৬০ সালে সংঘের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে সংঘের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এই বিহারকে কেন্দ্র করে ধর্মরাজিক অনাথালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বোধিঅঙ্গন ও আন্তর্জাতিক মানের একটি উপসনালয় গড়ে ওঠে। এ সংগঠন থেকে নিয়মিত 'কৃষ্টি' মুখপত্র ১৯৫৬ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। ১৯৯৯ সাল হতে প্রথমবারের মতো ধর্মরাজিক বিহারে এ সংগঠন থেকে কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সংঘের অন্যতম কৃতিত্ব হলো ভারতের বুদ্ধগয়ায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের পক্ষে 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করা। মুন্সীগঞ্জের অতীশ দীপংকরের ভিটায় অতীশ দীপংকর কমপ্লেক্স নির্মাণ করেন।

অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক ও বিশুদ্ধানন্দ শান্তি স্বর্ণ পদক এবং বিভিন্ন সামাজিক-ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় এই সংগঠন থেকে। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন ও নির্বাচন ১০ আগস্ট ২০১৮ তে অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধানন্দ মহাথের সভাপতি মি. প্রকৃতি রঞ্জন বড়ুয়া মহাসচিব ও মি. অনিমেষ তালুকদার অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, http://bn.banglapedia.org. ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ'র ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন ও নির্বাচন ২০১৮, https://www.tathagataonline.com, ১১ আগস্ট, ২০১৮

৪৭. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম: ২০১৭, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৮৬

৪৮. অনুপম বড়ুয়া সম্পা., *পবিত্র ত্রিপিটক*, প্রথম সংস্করণ, সুত্তপিটক, গ্রন্থ নং ৭, দীর্ঘনিকায়, মহাবর্গ, মহাপদান সূত্র

৪৯. রোমানা পাপড়ি, 'ললিতবিস্তর গ্রন্থের আলোকে মহামতি গৌতমবুদ্ধের জীবনীঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা', https://bibartanonline.com>2017/12/08

৫০. বুদ্ধের ধর্মের মূল সত্য নিহিত আছে এ সূত্রে। জগতে দুঃখ আছে যেমন, তেমনি দুঃখের কারণ আছে। দুঃখের কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা। দুঃখের নিরোধও সম্ভব। কারণ যা কিছু উৎপন্ন হবে একদিন তাঁর বিনাশ হবে। এটাই জগতের কার্যকারণনীতি। এতএব দুঃখের ধ্বংস আছে। এই দুঃখ-ধ্বংসের উপায় বুদ্ধ জেনেছেন । সেটা হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ-সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই উপায়ের নাম মধ্যম পন্থা। এই আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা মানুষ সংসার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে চিরশান্তির সুখ-দুঃখের অতীত নির্বাণ পদে উন্নীত হতে পারে। সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (কলিকাতা: ১৩৮০ বুদ্ধ পূর্ণিমা, সারস্বত লাইব্রেরি), পৃ. ৬৬

৫১. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৬৭

৫২. প্রাগুক্ত, *সদ্ধর্ম শিক্ষানীতি*, পৃ. ২২৪ ও ২২৫

৫৩. 'শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা আজ', https://www.dailynayadiganta.com, 27 July 2018

৫৪. 'আজ শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা', https://www.ekushey-tv.com, 27 July 2020

৫৫. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, *প্রথম প্রকাশ* (ঢাকা: ২০২০, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন), পৃ. ২৩৫

৫৬. প্রাগুক্ত, *সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের-এর স্মৃতিকথা সংকলন*, পৃ. ৯৯

৫৭. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০০, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৬৩

৫৮. 'আগামীকাল শুভ মধু পূর্ণিমা', https://nivvanatv.net, Sep 4, 2017

৫৯. বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের একটি অঙ্গসংগঠন। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন উইমেন্সের পথচলা শুরু। সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন), পৃ. ১৪৯

৬০. 'আগামীকাল শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা', Atish Dipankar অতীশ দীপঙ্কর ফেসবুক পেজ থেকে, https://m.facebook.com. Sep 27, 2015

৬১. 'শুভ মধু পূর্ণিমা উদযাপিত', https://www.jugantor.com, Sep 14

৬২. প্রাগুক্ত, *বাঙালি বৌদ্ধ লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ৭৩

৬৩. প্রাগুক্ত, *বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১২৮

৬৪. কাদের মাহমুদ, *বৌদ্ধত্ব পরিচয়* (ঢাকা: ২০১৭, নভেল পাবলিশিং হাউস), পৃ. ১৯০ ও ১৯১

৬৫. 'আজ প্রবারণা পূর্ণিমা', https://www.banglatribune.com, Oct 24, 2018. Shakyamuni Bouddha Vihara, Dhaka Oct 24, 2018

৬৬. 'শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা' আজ ফানুস উত্তোলন সন্ধ্যায়, https://www.dailynayadiganta.com, Oct 13, 2019.

৬৭. Shakyamuni Bouddha Vihara, Dhaka শাক্যমুণি বৌদ্ধবিহার, ঢাকা ফেসবুক পেজ থেকে নেয়া, Oct 24, 2018

৬৮. আখতার হোসেন, *বৌদ্ধ দর্শনে আধ্যাত্মিক ভাবনা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৬, সমাচার), পৃ. ২৫১

৬৯. প্রাগুক্ত, *বাঙালি বৌদ্ধ লোকসংস্কৃতি*, পৃ. ৭৪

৭০.প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, পৃ. ২৪০ ও ২৪১।

৭১. 'আজ শুভ মাঘী পূর্ণিমা', https://samakal.com. ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৭২. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ২০০৬), পৃ. ৬৪

৭৩. প্রাগুক্ত, সুনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন* পৃ. ২৪২

৭৪.সুদর্শন বড়ুয়া, *সদ্ধর্ম শিক্ষানীতি*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ২০০১), পৃ. ২২৮

৭৫.সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০০, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৬৭

৭৬. 'বিহারে বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসব', https://www.banglanews24.com, Oct 21, 2019

৭৭. দীপঙ্কর, শুভ কঠিন চীবর দান ও জাতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন ২০১৯, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, ২০১৯, কঠিন চীবর দান ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব, বুদ্ধানন্দ মহাথেরো, পৃ. ৩১

৭৮. ঢাকাস্থ শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহারে ৩১ তম দানোত্তম কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান ২০১৯-এর আমন্ত্রণপত্র

৭৯.সুনন্দপ্রিয়, উপ বিহারাধ্যক্ষ, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, বাড্ডা ঢাকা এর ফেসবুক থেকে সংগৃহীত, ১২ জুন, ২০২০

৮০. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৯৯

৮১.সুজাতা বন্দনা পরিষদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর ফেসবুক পেজ থেকে নেয়া, ৩০-০৮-২০২০

৮২. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ২৫৯

৮৩. রাহুল বড়ুয়া, যুব বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, বাংলা নববর্ষ ও বৌদ্ধধর্ম, Atish Dipankar অতীশ দীপঙ্কর ফেসবুক পেজ থেকে, Apr 13, 2016

৮৪. ১৪২৪ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে নির্মিত ব্যানার থেকে সংগৃহীত, ১২.১২.২০১৯

৮৫. 'ঢাকায় বৈসাবি র‍্যালি', https://www.risingbd.com, Apr 12, 2016

৮৬. মনিরুল আলম, 'ঢাকায় বিঝু উৎসব', প্রথম আলো, এপ্রিল ১৩, ২০১২

৮৭. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্ন সম্ভার*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ২০০৩), পৃ. ৬২ ও ৬৩

৮৮. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন*, পৃ. ৬৮, ৭০, ৭৬

৮৯. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ২০০৭, আবির প্রকাশন), পৃ. ২৬৭-২৭০

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা উন্নয়নে ঢাকা শহরের বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, মানব-জাতির উন্নয়নের রূপকার। শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সুন্দর ও উন্নত ভবিষ্যত নির্মিত হয়। শিক্ষাই পারে মানুষকে পরিপূর্ণ জীবন দান করতে। শিক্ষা ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলি এবং সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, ভাল-মন্দ জানতে সহায়তা করে এবং সে সঙ্গে কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, মানুষে মানুষে মৈত্রী ইত্যাদি গুণের অধিকারি করে তোলে।[১] শিক্ষার লক্ষ্য হল একটি আদর্শগত সাধারণ বিমূর্ত বাক্য বা বিবৃতি। এর মধ্যে দার্শনিক বিশেষত্ব প্রতিফলিত হয়। ডেভিস (১৯৭৬) শিক্ষার লক্ষ্যের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন: "An aim can broadly be defined as a general statement, which attempts to give both shape and direction to set of more detailed intentions for the future out."[২]

'শিক্ষা' পৃথিবীর সকল দেশেই অতি পরিচিত একটি প্রত্যয়। 'শিক্ষা' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত 'শাস্' থেকে, যার অর্থ 'শাসন', নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ বা উপদেশ দান"। শাব্দিক অর্থে 'শাস' ধাতু কঠোর কাঠামোগত পরিচালনামূলক উদ্দেশ্যের অধিকারী হলেও ব্যাপক অর্থে তা 'যথাযথ নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন' অর্থে প্রয়োগ করা হয়।[৩] আভিধানিক অর্থে "শিক্ষা-অভ্যাস, শেখা, বিদ্যাভ্যাস, অধ্যয়ন, চরিত্রোন্নতি।" সুঅভ্যাস বা ক্রমাগত অনুশীলন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। বিদ্যাভ্যাস লব্ধ শিক্ষাকে স্থায়ী করে। শিক্ষার চরম উৎকর্ষ চরিত্রোন্নতি। অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনিগড়িত ব্যক্তিসত্তার কাঙ্খিত বিকাশসাধন সার্থক শিক্ষারই স্থায়ী ফল। ল্যাটিন শব্দ Educo (rear) থেকে ইরেজি Education শব্দের উৎপত্তি। Educo শব্দের মূলগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, E=out; duco=to lead, to draw ev পরিচালিত করা, বের করা, প্রতিভাত করা। তাহলে শিক্ষা শব্দের ইরেজি প্রতিশব্দ Education এর তাৎপর্য হচ্ছে মানবমনের সহজাত বৃত্তি বা সম্ভাবনাকে বিকশিত ও পরিচালিত করাই শিক্ষার কাজ।[৪]

শিক্ষার ধারণার ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে 'আত্মবিশ্বাসী হওয়া' 'আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া' এবং 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ'লাভের উপায় হিসেবে 'শিক্ষা'কে দেখা যায়। শিক্ষা সম্পর্কে ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে, শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আত্ম-অভ্যাস ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হল এমনই একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত অর্থ 'মানুষের মুক্তি'।[৫] প্রাচীনকালে ভারতের বাহিরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও শিক্ষাচিন্তাবিদগণও শিক্ষা বলতে প্রধানত মানুষ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর

নৈতিক ও নান্দনিক জীবন বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের মতে শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা হলো, শিক্ষা নানাগুণে গুণান্বিত উন্নত চরিত্রের 'ভদ্রলোক' তৈরি করবে, 'যে' হীনতা জয় করে সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকবে।[৬] প্রাচীন গ্রিস ও রোমে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমাজ-দার্শনিক মতবাদের বিকাশ ঘটেছিল। এরিস্টটল শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে 'প্রজ্ঞা ও অভ্যাস উভয়ের সমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া অত্যাবশ্যক' বলে মন্তব্য করেন। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার স্বর্ণযুগের পর মধ্যযুগে ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে খ্রিস্ট ধর্মের নীতি ও আদর্শ সঞ্চালনই ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। আর 'চার্চ' শিক্ষা পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করতে থাকে।[৭]

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় কালক্রমে সনাতন (হিন্দু) ধর্মের নীতি-প্রথা, আচাররীতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রাধান্য বিস্তার করে। মধ্যযুগে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার এটিই ছিল প্রধান ধারা। উচ্চ বর্ণের হিন্দু শিশুরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তানেরা (অবশ্যই ছেলে শিশু) এ ধারার শিক্ষা গ্রহণ করে।[৮] তবে পাঠশালা শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু পার্থিব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। অব্রাহ্মণ সন্তানেরা পাঠশালায় পড়তো। কিছু মুসলমান ছাত্রও পড়তো। পঞ্চানন মণ্ডলের মন্তব্যে এর প্রমাণ মেলে- "পাঠশালায় শিক্ষা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের জাতির ছেলেরাই গ্রহণ করিত। মুসলমান ছেলেরাও এই পাঠশালায় পড়িতে যাইত।"[৯] কিন্তু মধ্যযুগে সংস্কৃত উচ্চশিক্ষার চর্চা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এ ধারাটির বিস্তার ঘটে। ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রসার লাভ করে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ও নন্দনচর্চা পাশাপাশি চলতে থাকে। পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, সংখ্যা, মহাযান শাস্ত্র, জোতির্বিদ্যা, যোগশাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা এবং আধ্যাত্ম বিদ্যা প্রভৃতি চর্চা হতো। আরো উচ্চতর বিষয়সমূহ অধ্যয়নের জন্য ছাত্রদিগকে নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমপুর, ওদন্তপুর, বলভী বিশ্ববিদ্যালয়, জগদ্দল মহাবিহার, পণ্ডিত বিহার, ভাসু বিহার, সোমপুর বিহার, সীতাকোট বিহার ও শালবন বিহার প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করতে হত। এই সমস্ত বৌদ্ধ মঠগুলিতে জ্ঞানার্জনের বড় বড় গ্রন্থাগারও ছিল। এই সকল গ্রন্থাগারে বহু সংখ্যক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সুরক্ষিত থাকতো।[১০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বলেন[১১],

> "এই ইউনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কাল নির্ণয় এখনও হয়নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ইউরোপীয় ইউনিভার্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব।"

বৌদ্ধধর্মের আর্বিভাব ও এর বিকাশের সাথে সাথে এ উপ-মহাদেশের বৌদ্ধদের সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ জীবন ভিত্তিক। তাই বৌদ্ধধর্ম যেমন একটি নতুন ধর্ম

তেমনি বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাও একটি নতুন জীবনবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। বুদ্ধ তাঁর প্রথম ধর্মদেশনা 'ধম্মচক্রপ্রবর্তন সূত্রে' শিক্ষা পদ্ধতি, সূচিপত্র, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ত্রিপিটকে জ্ঞান আহরণ, শ্রামণ্য ধর্মের পরিশুদ্ধতা ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য। *মহাবর্গগ্রন্থটি* ভিক্ষুদের বিনয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য দলিল হলেও এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, নিয়ম-কানুন, ব্রত সম্পাদন, আচার্যের প্রতি শিষ্যের কর্তব্য, শিষ্যের প্রতি আচার্যের সুদৃষ্টি, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, নৈতিক চরিত্র গঠন প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষানীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলতে গেলে, একজন আদর্শ শিক্ষক ও অনুগত মেধাবী ছাত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।[১২] বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো অংশ নয়, বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে সমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ছিল।[১৩] খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ধর্মে যাগযজ্ঞ, পশুবলি, বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, নিম্ন বর্ণের লোকের প্রতি উচ্চ বর্ণের ঘৃণার ভাব এবং সমাজ জীবনে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন এ পরিস্থিতির মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রথাসমূহের বিরোধিতা করেন কিন্তু তিনি বেদ বিরোধী ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম আর্বিভাবের শুরুতে মানুষের গার্হস্থ্য জীবনের কোন গুরুত্ব ছিল না। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত আচার্যদের কাছে সন্ন্যাসীর পক্ষেই কেবলমাত্র নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সাথে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পৃথক এক শিক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। নব দীক্ষিত বৌদ্ধদের ধর্মের রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বৌদ্ধরা এক নতুন ও নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এ চাহিদা থেকেই বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক দৃঢ়তা, জীবনের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধিতে সহায়তা করা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।[১৪]

অর্থাৎ বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো জাতিভেদ ছিলনা, এখানে সকল বর্ণের মানুষ সমান সুযোগ পেতো। উল্লেখ্য যে, প্রথমে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের মর্যাদা না দিলেও পরের দিকে নারীদের স্থান ছিলো অনেক উঁচুতে, এদের বলা হতো ভিক্ষুণী। প্রাচীনকালে প্রধানত বৌদ্ধধর্মেই প্রথম গণশিক্ষার প্রভাব দেখা যায়। যার ফলে সকল স্তরের জনসাধারণ জ্ঞানচর্চায় সুযোগ পেত। জনগণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রসারে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সর্বদা চেষ্টা করতেন। যাতে সকলের মধ্যে সম শিক্ষা প্রসার লাভ করতে পারে। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শিক্ষা শুরু হতো প্রবজ্যা গ্রহণের মধ্য দিয়ে যাদের বয়স ৮ বছর। ৮ বছরের নীচে কোন শিক্ষার্থী প্রবজ্যা গ্রহণ করতে পারতো না। বৌদ্ধদের বিহার জীবনের দীর্ঘ ১২ বছর ব্যাপী আবশ্যিক শিক্ষা শেষ হতো উপসম্পাদা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। উপসম্পাদা প্রদানের সময় শ্রমণকে ভিক্ষুদের সভায় উপস্থিত হতে হতো। বৌদ্ধ ভিক্ষু শিক্ষকদের নানাবিধ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলে তবেই উপসম্পাদা উপাধি লাভ করতে পারতো। বৌদ্ধ শিক্ষায় মাতৃভাষার মাধ্যমে গণশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলে তৎকালীন সময়ে সহজে জনসাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে, একমাত্র বৌদ্ধ শিক্ষাতেই শিক্ষার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়।

যার ফলে ভারত থেকে বৌদ্ধ শিক্ষা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিশ্বে এক যোগাযোগ স্থাপন হয়।[১৫] এই শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো[১৬]ঃ শিক্ষার লক্ষ্য: পরিনির্বাণ ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার চরম লক্ষ্য। দু:খ জর্জরিত সমাজ জীবনের বন্ধন থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভই হল পরিনির্বাণ। সংঘভিত্তিক শিক্ষা: বৌদ্ধ শিক্ষা গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধমঠ[১৭] বা সংঘকে কেন্দ্র করে। সংঘ ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনে সহায়তা করতেন। শিক্ষা শুরুর অনুষ্ঠান: বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবজ্যা নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শুরু হতো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে শিক্ষার্থীরা সংঘে প্রবেশ করতো, তাদের বলা হতো শ্রমণ। সর্বজনীন শিক্ষা: বৌদ্ধ শিক্ষা ছিল সর্বজনীন। মেধার ভিত্তিতে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সব ধরণের মানুষকেই পঠন-পাঠনের সুযোগ দেওয়া হত। তবে রোগগ্রস্ত এবং অপরাধী ব্যক্তিদের সংঘে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক: বৌদ্ধ শিক্ষায় গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল মধুর। উভয়ই পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালন করতো। বৌদ্ধ শিক্ষায় গুরুর কথাই অগ্রাধিকার পেতো না, সংঘের কথাই প্রধান ছিল। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কথাও শোনা হতো। শিক্ষার পাঠক্রম: বৌদ্ধ শিক্ষার পাঠক্রম ছিল খুবই উন্নতমানের। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠক্রম ছাড়াও বেদ, পুরাণ, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, সংগীত, ছন্দ-ধ্বনি-কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, গৃহীদের জন্য শিক্ষা এবং লোক শিক্ষা বা গণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষাদান পদ্ধতি: মূলত আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো। বিতর্ক, চিন্তাপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদান করা হতো। পাঠদানের মাধ্যম ছিল প্রাকৃত ভাষা। নিয়মানুবর্তিতা: হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার মতো বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাতেও শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল সমার্থক। প্রতিটি শ্রমণকে ১০ টি শীল পালন করতে হত। মিথ্যাকথন, সুরাপান, দান বহির্ভূত দ্রব্য গ্রহণ, অপবিত্র আচরণ, অসময়ে ভোজন, নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ, মাল্য, পাদুকা, সুগন্ধি, অলংকার ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার, উচ্চাসনে উপবেশন ও স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। উপসম্পাদা: উপসম্পাদা নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৌদ্ধ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটতো। এটি আসলে চিরকালীন গৃহত্যাগের অনুষ্ঠান।

বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শিশুনাগ, মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পালযুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে। সম্রাট কণিষ্ক ছিলেন বেশ শিক্ষানুরাগী, দার্শনিক পার্শ্ব, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রমুখদের পাণ্ডিত্য খ্যাতনামা। শিল্প-সাহিত্যে কণিষ্কের অবদান সবচেয়ে বেশি। গুপ্তযুগে বিহার নির্মাণ এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরব-সমৃদ্ধি হয়েছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকেও জানা যায় সে সেময়কার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। দেব বংশ ও পাল বংশের রাজারা প্রাচীন বাংলায় বিহার, ধ্যানকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরি ও নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।[১৮] মৌর্যযুগের শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাল অগ্রগতি হয়েছিল, মৌর্য শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার অগ্রগতি একটি অনুকূল সুযোগ পেয়েছিল। মৌর্যযুগে তক্ষশীলার মতো উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র ছাড়াও গুরুকূল, মঠ ও বিহারে শিক্ষা দেওয়া হতো। এ শিক্ষা

কেন্দ্রগুলি রাজ্য দ্বারা অর্থায়িত হয়েছিল। মৌর্য শাসনামলে শিক্ষার অবস্থা বিবেচনা করে ড. ভি. এ স্মিথ লিখেছেন: "অশোকের সময় বৌদ্ধ জনসংখ্যার শিক্ষিত শতাংশই ইংরেজি ভারতের বহু প্রদেশের শিক্ষিত লোকের শতাংশের চেয়ে বেশি ছিল।" মৌর্য যুগে সম্রাট অশোক পালি ভাষাকে (এক ধরনের গণভাষা ছিল) সরকারী ভাষা হিসেবে তৈরি করেছিলেন।[১৯] পালযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কেমন ছিলো সে সম্পর্কে পণ্ডিত নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী-সারনাথের বৌদ্ধসংঘ ও মহাবিহারগুলিকে আশ্রয় করে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতেও বাংলাদেশ একটি গৌরবময় স্থান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।" এই পাল যুগেই শান্তরক্ষিত, পদসম্ভব, কমলশীল, দীপংকর, জেতারী, জ্ঞানশ্রী প্রমুখ বৌদ্ধচার্যগণ আন্তর্জাতিক দরবারে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তাছাড়া, দিবাকরচন্দ্র, কুমারচন্দ্র, কুমারবজ্র, দানশীল, অভয়াকরগুপ্ত, মোক্ষকরগুপ্ত, পুত্তলী, নাগবোধি, প্রজ্ঞাবর্মণ, কোঠিভদ্র, বিভূতিচন্দ্র ও প্রভাকর পণ্ডিতগণ পালযুগকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।[২০] পাল রাজাদের প্রতিষ্ঠিত বিহারগুলো হলো: নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, সোমপুর, জগদ্দল, বিক্রমপুরী, ত্রৈকূটক, দেবীকোট, হলুদ, সিতাকূট, পণ্ডিত, কনকস্তূপ, পট্টিকেরা, শালবন, রূপবান, আনন্দ বাজার, ভোজ রাজার, ভাসু, সন্নগড়, দুর্গোত্তর, শীলবর্ষ, ইটাখোলা, জম্বল, গুণ, সুবর্ণ, বালান্দা, থাকন্দ এবং ভরত ভায়না বিহার। বিহারগুলো ছিল এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে বৌদ্ধ ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করতো। এখানকার শিক্ষকদের বলা হয় আচার্য বা ভিক্ষু। আর শিক্ষার্থীদের বলা হতো শ্রমণ। বর্তমান যুগের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিহারেও ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা ছিল।[২১]

ব্রিটিশ শাসন আমলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো বৌদ্ধরাও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ সময় বিদ্যা শিক্ষার জন্য তারা কলকাতায়ও যেতে থাকেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অনেকে মায়ানমার (তৎকালীন বার্মা) শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যাণ্ড গমন করেন। ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা শিক্ষা অর্জন ও জীবিকার জন্য ব্রিটিশ শাসনের অধীন আর্থিক ও শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলে গমন করতে থাকেন। সরকারী বেসরকারী চাকুরি, ডাক্তার, প্রকৌশলী, উকিল, শিক্ষক, ব্যবসা এবং প্রভৃতি পেশায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে থাকেন ফলে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকেন। ফলে তারা নৈতিক ও মানবিক গুনাবলির বিকাশের জন্য নব উদ্যমে ধর্মচর্চা শুরু করেন। ব্রিটিশ আমলে বৌদ্ধদের মধ্যে আত্মশক্তিতে বলিয়ান হওয়ার যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান আমলে তা আরো সমৃদ্ধি লাভ করে। এর অন্যতম কারণ প্রাজ্ঞ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঠিক দিক-নির্দেশনা ও তাঁদের নির্দেশিত কর্মকাণ্ডে গৃহীত বৌদ্ধদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধরা সম্মিলিত হয়ে নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক, শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় যে সকল সংগঠন এসব কাজ করছে তন্মোধ্যে: বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ মারমা বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহিলা সমিতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ মহিলা শাখা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ যুব, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট

ফেডারেশন ফর উইমেন, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট স্টুডেন্ট এসোশিয়েশন, আদিবাসী ছাত্রপরিষদ, তঞ্চইগ্যা-চাকমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল, কাপেং ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বুদ্ধিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশন, নিরোধ-শান্তা শিক্ষাবৃত্তি, বাংলাদেশ কলেজ ইউনিভার্সিটি বুড্ডিস্ট স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন, ত্রিপিটক প্রকাশনী বোর্ড, পালি বুক সোসাইটি, চারুলতা পরিষদ, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার, সৌগত প্রকাশন, অতীশ গণ উন্নয়ন সমবায় সমিতি, বুদ্ধিস্ট ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি, বৌদ্ধ ছাত্র-যুব পরিষদ, বৌদ্ধ ছাত্র কল্যাণ পরিষদ, জ্ঞানালোক ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ, দ্যা বুদ্ধিস্ট ইউনিটি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড, পালি টোল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। স্কুল ও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বি.এ অনার্স, এম.এ, এম ফিল, পিএইচ.ডি পর্যায়ে পালি ও বুদ্ধিস্ট নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ আছে।[২২] প্রতিটি সংগঠন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সাহিত্য, গবেষণা, ধর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন, গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান, ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ও সাহিত্যর উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার নির্মাণ, ছাত্রাবাস নির্মাণ, বই প্রকাশ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা, তাদের উৎসব ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সাময়িকী, সংকলন, স্মরণিকা প্রকাশ করে।

পূর্বেই জেনেছি যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল চট্টগ্রামে। তাই বাংলাদেশে বৌদ্ধ শিক্ষা বিস্তারে এ অঞ্চলের পণ্ডিতদের অবদান অনেক বেশি। চাকমা রানী কালিন্দী এ অঞ্চলের বৌদ্ধদের থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের মতাদর্শে ধাবিত করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৫৬ খ্রি. সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরকে আরাকান থেকে চট্টগ্রামে আনা হয়েছিল এবং ১৮৫৭ খ্রি. তাঁকে রাজগুরু পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কালিন্দী রাণীর প্রচেষ্টায় হীনযান বা থেরবাদ মতাদর্শ অনুসরণ করা শুরু করেছিলেন।[২৩] এ থেকেই বাঙালি বৌদ্ধদের অগ্রগতি অব্যহত থাকে। প্রখ্যাত বৌদ্ধ নেতা কৃষ্ণ চন্দ্র চৌধুরী (নাজির) ১৮৭৯ সালে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৯৯ সালে ডা. ভগীরথন্দ্র বড়ুয়া কর্তৃক চট্টগ্রামে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ, ১৯১৯ সালে চট্টগ্রামে 'বৌদ্ধ সমবায় আরবান ব্যাংক' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা, সমাজকর্মী ১৯২৯ সালে 'বৌদ্ধ সমাগম' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের যাত্রা এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাদের মধ্যে হলেন, আচার্য পুন্নাচার (১৮৩৭-১৯০৮), অভয় শরণ মহাস্থবির (১৮১৬-১৯২৩), সংঘনায়ক জ্ঞানালঙ্কার মহাথের (১৮৩৮-১৯২৭), কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬), অগ্গ মহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাথের (১৮৭৯-১৯৭১), অগ্রসার মহাস্থবির (১৮৬০-১৯৪৫), ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির, শ্রমণ পুর্নানন্দ, অগ্গ মহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির, গুণালঙ্কার মহাস্থবির, ভদন্ত কালী কুমার, সুমনাচার মহাস্থবির, বংশদ্বীপ মহাস্থবির, জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, আর্য বংশ মহাস্থবির, অভয়তিষ্য মহাস্থবির, দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান মহাস্থবির, শান্তপদ মহাস্থবির, মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, জিনবংশ মহাস্থবির, বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির, পূর্ণানন্দ মহাস্থবির, নাগসেন

মহাস্থবির, সুবোধিরত্ন মহাস্থবির, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবির, ধর্মাধার মহাস্থবির, প্রিয়ানন্দ মহাথের, আনন্দমিত্র মহাস্থবির প্রমুখ। বৌদ্ধ বিহারগুলিতে আধুনিক ভিক্ষুগণ ধর্ম ও পালি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সংগঠিত হয়ে ধর্মকার্য করার জন্য মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষুগণ ১৮৫৪ সালে ত্রিরত্নাকার সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমানে তা বাংলাদেশ 'ভিক্ষু মহাসভা' নামে পরিচিত। অন্যদিকে সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুগণ ভিক্ষু মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। আবার পার্বত্য এলাকার উপজাতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সুধমা নিকায়, রাখাইন মার্মা সংঘ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে ভিক্ষুদের মধ্যে চারটি বিভাগ রয়েছে, এগুলিকে নিকায় বলা হয়। নিকায়গুলির নাম হলো: মহাস্থবির নিকায়, সংঘরাজ নিকায়, দোয়ারা নিকায় ও সুধম্মা নিকায়। নিকায়ের প্রধানকে সংঘনায়ক বলা হয়। ভিক্ষুদের ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার জন্য চারটি সমিতি রয়েছে- বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভা, সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সমিতি ও রাখাইন মারমা সংঘ কাউন্সিল। এটা অনুমান করা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম তার হৃতগতি খুঁজে পেয়েছিল। এই যুগ সন্ধিক্ষণে যুগপুরুষদের আবির্ভাব বৌদ্ধ সমাজের চলার গতিকে প্রাণবন্ত করেছিল। সেই যুগ পুরুষদের মধ্যে অভিধর্মাচার্য রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২), কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৭৮০-১৯০৮), পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪), অগ্রসার মহাস্থবির (১৮৬৩-১৯৪২), কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৬৫-১৯২৬), ডাঃ ভগীরথ চন্দ্র বড়ুয়া, গোবিন্দ মুৎসুদ্দী ও গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া, ফুল চন্দ্র বড়ুয়া, নবরাজ পণ্ডিত, ড. বেনী মাধব বড়ুয়া, শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া, বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি, নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া, কিরণ চন্দ্র মৎসুদ্দি, বিশ্বম্ভর বড়ুয়া, মতিলাল তালুকদার, মোহন চন্দ্র বড়ুয়া, সুবল চন্দ্র বড়ুয়া, ধনঞ্জয় বড়ুয়া, সুরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি, সৌরীন্দ্র মোহন মুৎসুদ্দী, উমেশ মুৎসুদ্দী, গিরীশ চন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ।[২৪]

এ উপমহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কলেজে পালি শিক্ষার প্রচলন বাঙালি বৌদ্ধদের অগ্রযাত্রায় আরেকটি প্রচেষ্টা। ১৯০৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজে, ১৯০৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে, ১৯০৬ প্রেসিডেন্সি কলেজে, ১৯৩৯ সালে কানুগগোপাড়া স্যার আশুতোস কলেজে পালি বিভাগ খোলা হয়। তাছাড়া, রাঙ্গুনিয়া কলেজ, নোয়াপাড়া কলেজ, অগ্রসার মহিলা কলেজ, আশালতা কলেজ, ইমাম গজ্জালী কলেজ, ছালেহনূর কলেজ, হাসিনা জামাল কলেজ, রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ, পদুয়া কলেজ, শাহআলম কলেজ, কর্ণফুলী কলেজ, কাওখালী কলেজ, লাইমাই কলেজ, রাঙ্গামাটি কলেজ, রাজস্থলী কলেজ, দীঘিনালা কলেজ, খলিলমীর কলেজ, শিলক মহিলা কলেজ, অলি আহম্মদ কলেজ এবং আমানত ছফা বদরুন্নেসা মহিলা কলেজে এইচ এসসি ও অনার্স ক্লাসে পালি শিক্ষা চালু আছে। অধিকন্তু বাংলাদেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকার স্কুলে পালি ও বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। সুখের বিষয় বহু ছাত্র বিদেশ থেকে পালিতে পি.এইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছে। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যাপনা করে পালি শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে পালি শিক্ষা অসম্ভব গতিবেগ লাভ করেছে। পালি শিক্ষার বিস্তারে এবং পালি শিক্ষকদের স্বার্থ দেখার জন্য 'পালি সাহিত্য'

সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে।[২৫] অন্যদিকে ১৯১৫ সাল থেকে বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের মাধ্যমে পালিতে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এর উত্তরাধিকারী হিসেবে বর্তমান পালি ও সংস্কৃত বোর্ড পালি টোলগুলিতে সেই কোর্স চালু রেখেছে। যারা একত্রে সমস্ত ডিগ্রি অর্জন করেন তাদের ত্রিপিটক বিশারদ বলা হয়। অন্যান্য ডিগ্রী হচ্ছে সূত্র বিশারদ, বিনয় বিশারদ ও অভিধর্ম বিশারদ। সারা দেশে দুই শতাধিক পালি টোল ও কলেজ আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পালি শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিতে অনার্স, মাস্টার্স, এম.ফিল ও পি.এইচডি কোর্স চালু আছে।

১৯৫০ সালে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঢাকায় আসলে বিহার নির্মাণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে পালি ও সংস্কৃত বোর্ড গঠনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন, বৌদ্ধদের জন্য পৃথক পৃথক আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে প্রাদেশিক সরকারেরকাছে যুক্ত নির্বাচন দাবি পেশ করেন এবং বৌদ্ধদের জন্য প্রথম পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি মেডিকেল বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। ১৯৫২ সালে বিশুদ্ধানন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে অতীশ দীপংকরের ভিটায় যান। ১৯৫৩ সালে তিনি বিহার নির্মাণ কমিটি গঠন করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের কাছে বৌদ্ধদের দাবি-দাওয়া নিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন। ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ খোলার দাবি পেশ করেন। ১৯৫০-১৯৫১ সালে ঢাকার বুকে প্রথম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করার জন্য বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬০ সালে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়। তারপর তিনি একেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ধর্মরাজিক অনাথালয়, ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়, ধর্মরাজিক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, ধর্মরাজিক কিন্ডার গার্ডেন, অরফান প্রিন্টিং প্রেস, ধর্মরাজিক সেলাই ও টাইপরাইটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অতীশ দীপংকর হল, আন্তর্জাতিক ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ধর্মরাজিক দাতব্য চিকিৎসালয়, ধর্মরাজিক অতিথিশালা, ধর্মরাজিক বুক সেন্টার, ধর্মরাজিক সাহিত্য সভা, ধর্মরাজিক ক্রীড়া চক্র, ধর্মরাজিক মিউজিয়াম, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ (যুব, মহিলা) এবং বিভিন্ন দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের শাখা খুলেন এ বিহারকে কেন্দ্র করে এবং তিনি দায়িত্ব পালন করেন।। ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি, বাংলাদেশ পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ডের সচিব ছিলেন তিনি। স্বাধীনতা অর্জনে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার ও বিশুদ্ধানন্দ মহাথের'র অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ১৯৯৪ সালে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।[২৬] সমাজসেবা অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ২০০৫ সালে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করে।

মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের'র মৃত্যুর পর ঢাকার বৌদ্ধদের হাল ধরেন তাঁর যোগ্য শিষ্য শুদ্ধানন্দ মহাথের। তাঁর গুরুর পর তিনি ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার ও অন্যান্য সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনিও শিক্ষা অনুরাগী

ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত। ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়, ধর্মরাজিক কিন্ডার গার্ডেন, ধর্মরাজিক কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদানও যথেষ্ট। তিনি ঢাকায় ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মরাজিক ললিতকলা একাডেমি। অনাথ ও এলাকার গরিব জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মরাজিক নিক্কিও নিয়ানো ক্লিনিক। তাঁর ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জের বজ্রযোগীনিতে অতীশ মেমোরিয়াল কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে, নির্মিত হচ্ছে অতীশ দীপঙ্কর লাইব্রেরি ও অডিটোরিয়াম এবং অতীশ দীপংকর বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কাজ চলছে। তিনি ২০০১ সলে অতীশ দীপঙ্কর ও বিশুদ্ধানন্দ স্বর্ণপদক প্রবর্তন করেন। শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সার্বজনীন মঙ্গল ও কল্যাণে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য প্রতিবছর বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এ পদক প্রদান করে। ফলে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ও বিশ্বজননীন মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ উজ্জীবিত হয়।[২৭] সমাজসেবায় অবদানের জন্য ২০১২ সালে তিনি একুশে পদক পান। তিনি ২০১০ সাল থেকে প্রতি রমজান মাসের প্রতিদিন পাঁচশ মানুষকে ইফতার বিতরণ করেন। যা 'সম্প্রীতির ইফতার' নামে পরিচিত। তিনি ২০২০ সালে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮]

ঢাকায় বৌদ্ধদের শিক্ষাবিস্তারে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, শুদ্ধানন্দ মহাথের এর পর প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮০ সালে পালি ভাষায় প্রথম শ্রেণিতে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করায় যথারীতি "বাংলাদেশ পালি ও সংস্কৃত বোর্ড" থেকে কৃতিত্বের সাথে যথাক্রমে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম মধ্য ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকার মিরপুরে শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। তিনি ১৯৯১ সালে এ বিহারে বনফুল চিলড্রেন হোম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বনফুল প্রাইমারী স্কুল। পার্বত্য বৌদ্ধসংঘের আওতায় ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আদিবাসী গ্রীণহার্ট কলেজ।[২৯]

ঢাকার আশুলিয়াতে ২০০৪ সালে অসিন জিন রক্ষিত ভান্তে বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ২ বিঘা জমির উপর এই বিহার কমপ্লেক্স। শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে উপহার হিসেবে বোধিবৃক্ষ পেয়েছেন এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত শ্রীলংকার ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধরা বোধিবৃক্ষের চারিদিকে ২৮ বুদ্ধের মূর্তিসহ নান্দনিক স্থাপনা করছেন এবং নান্দনিক ধাতু চৈত্য নির্মাণ করেছেন। এখানে ঢাকাতে একমাত্র বৌদ্ধদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য একটি শশ্মান নির্মাণ করা হয়েছে। করোনা মহামারীতে অনেক বৌদ্ধ মৃত ব্যক্তিকে এই শশ্মানে দাহ করা হয়েছে। সর্বোপরি ৬ তলা বিশিষ্ট একটি নান্দনিক ভাবনা কেন্দ্র ও বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য বড় পরিসরে হল ঘর আছে। এ বিহারে ভাবনা কোর্স হয়। পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে অষ্ট পরিষ্কার সহ সংঘদান করা হয়।[৩০] এছাড়া অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারগুলোর ন্যায় বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র দুঃস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন, মুসলমানদের ইদুল ফিতর উপলক্ষে ত্রাণ বিতরণ করেন, করেনা মহামারীর মধ্যে সকল ধর্মের গরিবদের মধ্যে

ত্রাণ বিতরণ করেন। কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে প্রতিবছর এ বিহার থেকে বোধিজ্ঞান নামে একটি মুখপত্র বের হয়।[৩১]

অপরদিকে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় বুদ্ধ বিহার ও ড. শাসনরক্ষিত ধ্যান কেন্দ্র বিদর্শন ভাবনা কোর্সের আয়োজন করা হয়। সাতদিন ও দশদিন ব্যাপী বছরে একবার ও দু'বার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আজ ৭ বছর যাবত এ বিহারে মেডিটেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বুদ্ধ পূর্ণিমা, সংঘদান, প্রবারণা পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা এবং কঠিন চীবর দানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।[৩২] এছাড়াও চারু একাডেমি অব আর্ট এন্ড কালচার সেন্টার থেকে ঘন্টাব্যাপী মেডিটেশনের[৩৩] ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে মেডিটেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়। এসকল প্রোগ্রামগুলোতে ঢাকা শহরের বৌদ্ধ সমাজের সকলে অংশগ্রহণ করেন। আমরা জানি, স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। সুতারাং, সুস্থতার জন্যই মেডিটেশন একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মেডিটেশন ও ধ্যানকেন্দ্রগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

ছবি: বাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে চারু একাডেমি অব আর্ট এন্ড কালচার সেন্টার থেকে ধ্যানুষ্ঠান

১৯৭২ সালে ঢাকার বাসাবোতে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়। শুরুতে ছিন্নমূল শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর অন্যতম স্কুল হিসেবে সুপরিচিত। অসম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা থেকে ঢাকা মহানগরীর দঃ পূর্ব এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যালয়টি অনন্য ভূমিকা পালন করছে। প্রথম পর্যায়ে স্কুলের নাম ছিল ধর্মরাজিক বিদ্যালয়, স্বীকৃত পর্যায়ে নাম ছিল ধর্মরাজিক অনাথালয় আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়, পরবর্তীতে ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয় (১৮-০১-২০১০ থেকে বর্তমান)। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ও সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের। ১৯৮৩ সাল থেকে স্কুলটি এমপিওভুক্ত। শিশু শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি (মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা) পর্যন্ত অনুমোদিত আছে। স্কুলের

ফলাফল (পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি) সন্তোষজনক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম (সংগীত, খেলাধূলা, শিক্ষা সফর, দেয়ালিকা প্রকাশ, পাঠাগার, দৈনিক পত্রিকা, সাহিত্য সভা, বিজ্ঞান ক্লাব, সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন, স্কাউট, স্টুডেন্ট কেবিনেট কার্যক্রম, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং নানা অর্জন রয়েছে স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের।

ছবি: ঢাকা শহরের কমলাপুর বাসাবোতে অবস্থিত ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়

স্কুলটির আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যালয়ে এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী ও ২৫ জন শিক্ষক রয়েছে। বিদ্যালয়টি জাতীয় দিবস ও বিশেষ দিবস পালন করে থাকে। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজ তা সাফল্যের চূড়াতে পৌঁছেছে। স্কুলের বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রভাষক, উর্ধ্বতন সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, গবেষক, আইনজ্ঞ ও ব্যবসায়ী শিল্পীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।[৩৪] ২০০৮ সালে ১৮ জুলাই গঠিত হয় ধর্মরাজিক প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ।[৩৫]

শ্রেয়োবোধ, সম্প্রীতি ও ঐক্যবোধের বহু প্রত্যাশিত আশা জাগানিয়া আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ২০০৪ সালে ভেন. প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো প্রতিষ্ঠা করেন রাজধানীর মিরপুর ১৩ এ বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজ। বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয় প্লে-গ্রুপ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসা শিক্ষা) পর্যন্ত। শিক্ষালয়টি আবাসিক ও অনাবাসিক।

ছবি: মিরপুরে অবস্থিত বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা

'বনফুল আদিবাসী এডুকেশন ফাউন্ডেশন' মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে বাঙালি ও আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফল ও অন্যান্য সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য ইতোমধ্যে ঢাকাবাসীর আস্থা অর্জন করেছে। দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য জন্য স্কুলটি এগিয়ে যাচ্ছে।[৩৬]

বাংলাদেশ মারমা বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক ঢাকা জেলার ধামরাইয়ে ২০০০ সালে ধর্মজ্যোতি বিহার নির্মাণ এবং পরে জ্যোতি বিদ্যা নিকেতন ২০০১ সালে ৩৬ জন (পাহাড়ি ও স্থানীয়) ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়। ২০১৮ হতে কলেজ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০ বছর যাবত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আগত পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অত্র ধামরাই এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানের শিক্ষা বিস্তারে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা করছে। এটি একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জাপানিজ ও জার্মানি এম্ব্যাসি সহায়তা করছে বিদ্যালয়টিকে। ঢাকার বৌদ্ধদের জন্য সাংগ্রাই, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান নানা আয়োজন এ বিদ্যায়তনটি করে থাকে। ইতোমধ্যে শিক্ষার ফলাফল, সহশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য উপজেলা ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[৩৭]

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশের পালি টোলের আদলে ১০০টি প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করার জন্য এ প্রকল্প। এই স্কুলের জন্য ১০০ জন শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে।[৩৮] ঢাকায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে দু'ঘন্টা ব্যাপী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিহারের আবাসিক ভিক্ষু বোধিরত্ন ক্লাস নিয়ে থাকেন। ২০০৬ সাল থেকে এ কার্যক্রম বিহারে চলছে। এছাড়া অন্যান্য বিহারেও শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বৌদ্ধ শিক্ষাক্রম ও সংস্কৃতিকে বিকাশত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।[৩৯] ঢাকার নর্দার প্রজ্ঞানন্দ বৌদ্ধ বিহারে প্রজ্ঞালোক ধর্মীয় শিক্ষা

পরিষদে শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও ভাবনার ক্লাস নেয়া হয়। এ সংগঠন থেকে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।[৪০]

এছাড়াও ঢাকা জেলার সাভারের আশুলিয়ার বুড়িবাজার নামক জায়গায় অবস্থিত 'জুম্ম সুরঞ্জলী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক একাডেমি'। সাভারে জন্ম এবং বেড়ে ওঠা জুম্ম শিশু-কিশোরদের জুম্ম সংস্কৃতি ও জীবনাচারের শিক্ষা দেয়া হয়। এ একাডেমিটির পরিচালক রতন বিজয় চাকমা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিঝুম তালুকদার এটি ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুর দিকে 'বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম' ও 'আদিবাসী সামাজিক কল্যাণ সমিতি' আর্থিক সহযোগিতা করলেও এখন নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। বর্তমানে নাচ, ড্রইং, স্পোকেন ইংলিশ কোর্স চালু আছে। তাদের তথ্যমতে বর্তমানে সাভারে প্রায় ১২ হাজার জুম্ম বাস করেন। ভবিষ্যতে এর সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি চলে যাবে। সাভারে বসবাসকারী আদিবাসী জুম্মদের মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা ৯৫ শতাংশের বেশি। সেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। সাভারের আদিবাসীদের মধ্যে অনেক আদিবাসী পোশাক শ্রমিক। তাদের সন্তানরাই মূলত একাডেমির শিক্ষার্থী। প্রতিষ্ঠানটি সাভারে বিঝু উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফুল বিঝুর আয়োজন করা হয়। পল্লী বিদ্যুৎ, বুড়ী বাজার, গাজীর চটের আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব পণ্যের মুদির দোকান দিয়ে বসেছেন। চাকমা ভাষার লিখন পদ্ধতি ও কম্পিউটার কোর্স সেখানে দুই ব্যবসায়ী বিনা মূল্যে প্রদান করছেন। কর্মজীবী মায়েদের সন্তানদের জন্য রয়েছে "জুম্ম শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র"।[৪১]

বাংলাদেশের বৌদ্ধবিদ্যা উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০ সালে সংস্কৃত ও পালি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপূর্বে বাংলার সাথে পালি আবার সংস্কৃতের সাথে পালি বিষয়টি পড়ানো হতো। *শতবর্ষের আলোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, (ঢাকা: ২০২১, পৃ. ১৮২) বইয়ে উল্লেখ আছে, ১৪-০৪-২০০৭ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র্য পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। স্বতন্ত্র বিভাগে অনার্স, মাস্টার্স, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিভাগে বৌদ্ধ শিক্ষক ব্যতিত হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষক রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিভাগটি বৌদ্ধচর্চার জন্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নানা সেমিনারের আয়োজন করে। ২০১৮ সালে বিভাগটি সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচারের সহযোগিতায় 'বৌদ্ধধর্ম: সভ্যতা ও সংস্কৃতি' নামে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ২০১২ সাল থেকে বিভাগে রবীন্দ্র বিজয় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হচ্ছে। বিভাগের সেমিনারের রয়েছে অনেক বিষয়ের উপর মহামূল্যবান বই, জার্নাল ও সাময়িকী। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে আদিবাসী বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। বিভাগের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য এম.এ ও বি. এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম উত্তীর্ণদের সুকোমল বড়ুয়া স্বর্ণপদক ও বংশদ্বীপ মহাস্থবীর স্বর্ণপদক দেয়া হয়। এছাড়াও বিভাগের মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য ড. গণেশ ও বুদ্ধিমতী বড়ুয়া বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।[৪২] বিভাগ থেকে পাশকৃত শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের নানা সেক্টরে দায়িত্বরত

আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংগঠন নামে একটি সংগঠন রয়েছে। ১৯৮৮ সালে এ সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রতি বছর বৌদ্ধ পূর্ণিমা, প্রবারণা নানা সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এ সংগঠনটি 'সৌম্য' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে থাকে। শান্তি, শিক্ষা, সাহিত্যে, সমাজসেবা, সংগীত, শিল্পোদোক্তা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বৌদ্ধ, যারা বিশেষ অবদান রাখেন তাদেরকে গুণীজন সম্মামনা প্রদান করা হয়।[৪৩] আরো আছে সেন্টার ফর বুদ্ধিস্ট হেরিটেজ এন্ড কালচার, যেখানে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে সম্প্রীতি ও শান্তি শোভাযাত্রার আয়োজনসহ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ২০০৬ সালে জগন্নাথ হলে ৩০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন বুদ্ধমূর্তির কাজ শুরু হলে শেষ হয় ২০১৫ সালে। যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আশেপাশের বৌদ্ধরা প্রার্থনা করতে পারেন।[৪৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম লিটারেচার এবং কালচার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন আছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া জুম্ম শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সংগঠন।[৪৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।

ঢাকা জেলার গাজীপুরে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ পর্যায়ে বি.এ পাস ও সাবসিডিয়ারি কোর্স পরীক্ষায় পালি ছিল। পূর্বে এ সকল পরীক্ষা নেয়া হতো ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। পরবর্তীতে বি. এ, এম.এ, এম.ফিল এবং পি.এইচ.ডি. এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আছে তাদের নিজস্ব সিলেবাস। এ বিষয় পাঠদানের জন্য পালি শিক্ষায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং উচ্চ শিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে।[৪৬] এছাড়া ঢাকা শহরের খুব সন্নিকটে জেলাটি হওয়াতে এমনকি জাতীয় অধিভূক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে বৌদ্ধ শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা শেষে চাকুরী করার সুবিধ পান।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদি শিক্ষা হল টোল শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা দেখা শুনা করছে বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি বোর্ড। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সারা দেশে প্রায় ৯৩ টি পালি কলেজ রয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর 'বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড' নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ বোর্ডের অবস্থান ঢাকার কমলাপুরে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে। পালিতে সূত্র, বিনয় ও অভিধম্ম ইত্যাদি বিষয়ে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা তিনটি এক বছর মেয়াদি। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। আদ্য ও মধ্য উভয়ই পরীক্ষায় দুটি পত্রে ২০০ নম্বর এবং উপাধি পরীক্ষায় ৪ টি পত্রে ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়।[৪৭]

ঢাকাতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেমন: মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম ও বাংলা মিডিয়াম স্কুল, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ, সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, হোমিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করতে গিয়ে

দেখা যায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বৌদ্ধ শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে এবং শিক্ষা শেষে ভালো ফলাফলে তারা এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করারও সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক সংগঠনগুলো নানাভাবে সমাজে সহযোগিতা করছে।

প্রত্যেক জাতি শিক্ষা তার ধর্ম, দর্শন, চেতনা ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রসার, বাণিজ্যিক প্রসার, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাও এই সমস্ত বিষয়কে প্রভাবিত করে থাকে। বৌদ্ধধর্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত প্রচার শুরু করেছিলেন যখন তিনি দেখলেন সমাজে অন্যায় অনাচার, দ্বন্দ্ব বিগ্রহ বিরাজমান এবং মানুষের মনে দুঃখ তাকে গ্রাস করেছে। তখন মানব মুক্তি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তায় মগ্ন হন মহামানব গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রচার করেন তাঁর শিক্ষা। তাঁর শিষ্যরা তাঁর নীতি, দর্শন এবং উপদেশগুলো শিখে রাখতেন এবং প্রচার করতেন। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রচারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বহু শিক্ষা কেন্দ্র যেগুলো বিহার নামে পরিচিত হয়ে উঠে। প্রাচীন ভারতে বিহারগুলোতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিস্তার শুরু হলেও পরবর্তীতে এই শিক্ষা হয়ে উঠে নৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ভাবধারা সম্বলিত, দর্শন ভিত্তিক এবং বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সার্বজনীন।

বিহারে ভিক্ষুরা শিক্ষা প্রদান করতেন এবং শিষ্যরা বিহারেই অবস্থান করতো ও শিক্ষা গ্রহণ করতো। এটাই ছিল মূলত আধুনিক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম ধারণা। প্রবজ্যা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবেশের পর বারো বছর শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত হলে "উপসম্পাদা"- এর মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা জীবন শেষ হতো। বর্তমানে আমরা ছয় বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি, পরীক্ষার মাধ্যমে নিচের ক্লাস থেকে উপরের শ্রেণিতে প্রমোশন এবং সমাবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার যে প্রচলন দেখতে পাই, এর তাৎপর্যপূর্ন ঐতিহাসিক ভিত্তি নিহিত আছে। বিহারে গুরুগণ গৃহে অবস্থান করে শিষ্যদের শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা শেষে উপসম্পাদা প্রাপ্তির মধ্যে। বিহারে গুরু শিষ্য একসাথে অবস্থান করায় দুইজনের মধ্যে গুরু ভক্তি ও শিষ্য স্নেহ প্রভৃতি মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। উদ্ভব ঘটে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব মুক্তির দর্শনের। এগুলো পরবর্তীতে নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়। ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণের ফলে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ পাঠদান, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে। উল্লেখ্য যে, বিহার ভিত্তিক শিক্ষা পূর্ববর্তী সনাতন বা বৈদিক ধর্মের ক্ষেত্রে শিক্ষা সার্বজনীন ছিলনা। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমাজের অন্য কোনো শ্রেণিতে সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতোনা, এমনকি ব্রাহ্মণ নারীরা ও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ছিলনা, প্রথম দিকে নারীরা শিক্ষা থেকে দূরে থাকলেও পরবর্তীতে শিক্ষা সার্বজনীন রূপ পায়।

ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন সূত্র, বিনয় ও অভিধম্মপিটক পাঠদানের সাথে বিকাশ ঘটে শব্দতত্ত্ব, ভাষা শিক্ষা, ব্যাকরণ পাঠ, ছন্দ ও উচ্চারণ প্রভৃতি নতুনধারার। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দর্শন প্রাধান্য পায়। প্রচারের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠে অসংখ্য বিহার। এদের মধ্যে নালন্দা বিহারের কথা অধিক প্রচলিত যা পৃথিবীর প্রাচীনতম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেও পরিচিত। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং নালন্দা বিহারে অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন সাপেক্ষে সাহিত্য, ধর্ম, দর্শনের শিক্ষায় ও পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন ভারতে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাল শাসনামলের পরবর্তী সেন শাসন ও মুসলমানদের উপমহাদেশে শাসন শুরু হলেও বৌদ্ধদের শিক্ষা টিকে থাকে। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৌদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদেশে গড়ে উঠে বৌদ্ধ দর্শন ভিত্তিক অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল ও কলেজ। ধর্ম হিসেবে হোক, বা ভাষা হিসেবে, বৌদ্ধ শিক্ষা কার্যক্রম এবং পালি ভাষা শিক্ষা এখনো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে প্রচলিত আছে, বিকশিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে গড়ে উঠে শিক্ষা ভিত্তিক অনেক সংগঠন, সমিতি ও সংঘ। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা উন্নয়ন অনেক দূর এগিয়েছে এবং এগিয়ে যাবে।

উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাচীনতম রূপের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ঘটেইনি শুধু, বরং এর অনেক প্রভাব আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ও বিদ্যমান। বৌদ্ধধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা সমৃদ্ধ করেছে আমাদের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, বিশ্বধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব, নৈতিকতা, ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান এবং সর্বোপরি আধুনিক শিক্ষানীতির অনেক চিন্তাকেও। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব প্রাচীন অব্দি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি। যেমন, স্কুলে ভর্তির বয়স নির্ধারণ, ভর্তি ও মৌখিক পরীক্ষা, আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাবর্তন, সিলেবাস, বির্তক, সহ-পাঠক্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম, মেডিটেশন, বৃত্তি ও আর্থিক অনুদান ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মের এ সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা যখন বর্হিবিশ্বে ছড়িয়ে পরে তখন এর প্রভাব বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়াতে থাকে। ঢাকা শহরে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বসবাসকে কেন্দ্র করে নানা শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশে বৌদ্ধ জনসংখ্যা কম হলেও ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের সংখ্যা আরো কম তবে, সে তুলনায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ঢাকায় ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয় ও বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজ শিক্ষান্নোয়নে অসাধারণ অবদান রাখছে। সেখানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করার সুযোগ পাচ্ছে। ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতিসংঘঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ফলে সুন্দর ও সুপরিকল্পিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. এম. এ ওহাব মিয়া, *শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৪, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৪

২. Davies, Ivor K. (1976) *Objectives in Curriculum Design*, London: McGraw Hill Book Co. Dr. Taraknath Pan (Reviewer), পৃ. ৬ উদ্ধৃত, আবুল এহসান, *শিক্ষাক্রম উন্নয়ন নীতি ও পদ্ধতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি), পৃ. ৩৩

৩. আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, ষষ্ঠ সংস্করণ (ঢাকা: ২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন), পৃ. ২

৪. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, *সুশিক্ষক*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১১, চারুলিপি প্রকাশ), পৃ. ২০ ও ২১

৫. অমরনাথ ঘোষ ও ঋতেন্দ্রকুমার রায়, *শিক্ষাবিজ্ঞান*, ২য় সংস্করণ (কলকাতা: ১৯৮৭, ব্যানার্জি পাবলিকেশন), পৃ. ১

৬. শরীফা খাতুন, *দর্শন ও শিক্ষা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৪

৭. আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখবাজ রিয়াদ, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, ৪র্থ সংস্করণ (ঢাকা: ২০১৪, র‍্যামন পাবলিশার্স), পৃ. ৩ ও ৪

৮. প্রবীর মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা (প্রথম ভাগ)*, প্রথম প্রকাশ (কলিকাতা: ১৯৯৯, দীপায়ন), পৃ. ১২

৯. পঞ্চানন মণ্ডল, *চিঠিপত্র সমাজচিত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ (কলিকাতা: ১৯৫৬, বিদ্যাভবন), পৃ. ১০১

১০. প্রাগুক্ত, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, পৃ. ৫

১১. বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিক সং, একাদশ খণ্ড, পৃ. ৬৮১

১২. কলা অনুষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, খন্ড ৪, সংখ্যা ৬, জুলাই ২০১০-জুন-২০১১, বেলু রানী বড়ুয়া, বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি: অতীত ঐতিহ্য, পৃ. ১৪০

১৩. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৬৯

১৪. History of Education in India, Directorate of Distance Education, 2016, Tripura University, pg.10-21

১৫. প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য, https//:www.dascoaching.in, june 30, 2020

১৬. 'বৌদ্ধ শিক্ষা', https//:millioncontent.com, 07.02.21

১৭. চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বলেন, সে সময় ভারতের সর্বত্র তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ দেখতে পান এবং পাটলীপুত্র ছিল সেই যুগে বৌদ্ধধর্ম ও বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ৬২৯ খ্রি. হিউয়েন সাং এর ভারত পর্যটনের বিবরণীতেও উল্লেখ আছে যে, তখন ভারতের প্রায় পাঁচ হাজার বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং সেই সকল অঞ্চলের মঠসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা তাঁর মতে দুই লক্ষেরও বেশি। এই সকল মঠে তরুণ ভিক্ষু, শ্রমণ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হত। অসঙ্গ, বসুবন্ধু, পার্শ্ব, অশ্বঘোষ, নারায়ণ ভদ্র, প্রমুখ বৌদ্ধ পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি ও ধর্মাচার্যগণ তাঁদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য বিভিন্ন মঠের কাছে ঋণী। প্রাগুক্ত, *আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, পৃ. ৭০ ও ৭১

১৮. সৌগত: Sougata: বুদ্ধচর্চার অনবদ্য ম্যাগাজিনের ফেসবুক পেজ থেকে নেয়া, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাচীন পীঠস্থান নালন্দা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ হলে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সুকোমল বড়ুয়া, ২৯ এপ্রিল, ২০১৫

১৯. 'মৌর্যযুগের শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কথা', https//:Sojasapta.com, ১৪ এপ্রিল, ২০২১

২০. প্রণব কুমার বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৩৯ ও ৪০

২১. 'শিক্ষার সেকাল একাল', সিদ্দিকুর রহমান, https//:m.dainiksiksha.com, ০১ মার্চ, ২০২০

২২. মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো Mahasanghanayaka Vishuddananda Mahathera ফেসবুক পেজ থেকে, এপ্রিল ২৬, ২০১৮

২৩. 'বৌদ্ধধর্ম ও চাকমা জাতি, শুভ্র জ্যোতি চাকমা', গবেষণা কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে সংগৃহীত

২৪. সুনীথানন্দ, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০৩

২৫. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৭৪

২৬. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরঃ জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ২০০৬, ময়নামতি প্রকাশনা), পৃ. ৩৪, ৩৫, ৭৮, ৭৯

২৭. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া ও অনুপম বড়ুয়া সম্পাদিত, *সংঘনায়ক শুদ্ধনন্দ মহাথের-এর স্মৃতিকথা সংকলন*, প্রথম প্রকাশ *(ব্যক্ত হোক জীবনের জয়- গ্রন্থের আলোকে)* (ঢাকা: ২০১৮), পৃ. ৩১, ৬৩ ও ১৪১

২৮. 'শুদ্ধানন্দ মহাথেরোর মহাপ্রস্থান', https//:bangla.bdnews24.com, march 3, 2020

২৯. 'প্রজ্ঞানন্দ একটি আলোকিত নাম', www.jumjournal.com, 5th Dec, 2020

৩০. বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বপন বড়ুয়া চৌধুরীর ফেসবুক থেকে নেয়া, অক্টোবর ২, ২০২০

৩১. *বোধিজ্ঞান*, বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্রের মুখপাত্র, প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১৫ খ্রি.

৩২. নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার ও ড. শাসনরক্ষিত ধ্যান কেন্দ্রের লিফলেট থেকে সংগৃহীত, অগাস্ট ২২, ২০২০

৩৩. ইংরেজীতে 'মেডিটেশন' শব্দে ধ্যান বা গভীর চিন্তনকে বুঝায়। সাধারণ অর্থে ধ্যান বলতে মন:সংযোগ বা মানসিক চর্চাকে বুঝায়। কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা কাল্পনিক কিছুকে অবলম্বন করে মনে মনে ভাবনা করা বা চিন্তা করাকে সাধারণত ধ্যান বলা হয়। বৌদ্ধধর্মে ধ্যান দু প্রকার: শমথ ধ্যান ও বিদর্শন ধ্যান। শমথ ধ্যান ক্লেশ, তৃষ্ণা ও দুঃখকে শান্ত করে, উপশম করে। বিদর্শন ধ্যান হলো ধারণার বশবর্তী না হয়ে বস্তুর যথাযথ অনুদর্শন। ধ্যান একটি সম্পূর্ণ সচেতন ক্রিয়া পদ্ধতি, ইচ্ছা শক্তির অনুশীলন ও একটি আধ্যাত্মিক ভাবের একাগ্রতা। বৌদ্ধধর্মের মুক্তির পথ নির্বাণ, তা অর্জনের জন্য ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *ধ্যান: সুখী জীবনের চাবিকাঠি* (ঢাকা: ২০১৪, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১ ও জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বিদর্শন ধ্যান* (ঢাকা: ২০১৩, অন্যধারা), পৃ. ৩১ ও ৩২

৩৪. *দ্যুতিময় ধর্মরাজিক* বার্ষিকী ২০১৭, ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়ের স্মরণিকা, পৃ. ২৪, ২৫, ৩১, ৩৩

৩৫. *ধর্মরাজিক*, মহামান্য মহাসংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের'র মহাপ্রয়াণোত্তর ষান্মাসিক মহাসংঘদান ও স্মরণানুষ্ঠান সংখ্যা-২০২০, পৃ. ১৭

৩৬. *স্পন্দন*, বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০১৫-১০১৬, বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট কলেজ, পৃ. ৫, ১৭ ও ১৭০

৩৭. *জ্যোতির্ময়*, জ্যোতি বিদ্যা নিকেতনের ম্যাগাজিন, দশম বর্ষ, দশম সংখ্যা (২০১৭) পৃ. ৩৫, ৩৬ ৫৪

৩৮. *চারুলতা*, সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক প্রকাশনা, নভেম্বর, ২০১৬, পৃ. ১৮

৩৯. তথ্য সংগ্রহ: ভদন্ত বোধিরত্ন ভিক্ষু, আবাসিক, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২, ২২-০৩-২০২১

৪০. *বৈশালী*, স্মরণিকা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহার, শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব-২০১২

৪১. জুম্ম সুরঞ্জলী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক একাডেমি-সাভারে দুই বন্ধুর জুম চাষ, www.jumjournal.com, 8th Dec, 2020

৪২. সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা:২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন), পৃ. ৬৭ ও ৬৮

৪৩.প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর*, পৃ. ৬৯

৪৪. *সৌম্য*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে স্মরণিকা, ২০১০

৪৫. Dhaka University Jum Literature and Culture Society এর ফেসবুক পেজ থেকে, ২১ মার্চ, ২০২১

৪৬. সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশে পালি ও বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চা একটি সমীক্ষা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৬, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন), পৃ. ১১৮

৪৭. সুকোমল বড়ুয়া, 'বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাবোর্ড', http://bn.banglapedia.org, ৫ মে, ২০১৪

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

সাধারণত আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও সামাজিক জীবন এর মাঝে সম্পর্কে বুঝায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির সামাজিক অবস্থা এবং তার অর্থনৈতিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কেই আর্থ-সামাজিক অবস্থা বলা হয় (https://www.bissoy.com) ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরুপনের ১৫০ জন বৌদ্ধ নাগরিকের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমের তা কার্টোগ্রাফিক (স্তম্ভচিত্র, লেখচিত্র ও বৃত্তচিত্ত) পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে । নিম্নে তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

তথ্য বিশ্লেষণ:

সারণি-৫.১ বয়স ও বর্তমান বাসস্থানে বসবাসের বছর সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

বয়স ও বর্তমান বাসস্থানে বসবাসের বছর	গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
বয়স	৩৯.৫	১৯	৮৮
বর্তমান বাসস্থানে বসবাসের বছর	১০.৫৮৬৬৭	১	৭০

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বয়স ও বর্তমান বাসস্থানে বসবাসের বছর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের (Participants) গড় বয়স ছিল ৩৯.৫ বছর। যেখানে সর্বনিম্ন বয়স পাওয়া যায় ১৯ এবং সর্বোচ্চ বয়স ছিল ৮৮। একই সাথে বর্তমান বাসস্থানে বসবাসের বছর এর তালিকায় দেখা যায় বর্তমান বাসস্থানে বসবাসের গড় বয়স ১০.৫৮৬৬৭ বছর। এক্ষেত্রে দেখতে পাই, ঢাকাস্থ বৌদ্ধগণ তাদের বর্তমান বাসস্থানে সর্বনিম্ন ১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৭০ বছর ধরে বসবাস করে আসছে।

সারণি-৫.২ বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

বৈবাহিক অবস্থা	শতাংশ
বিবাহিত	৭৪.৬৭
অবিবাহিত	২৪.৬৭
তালাকপ্রাপ্ত	০.৬৭

লেখচিত্রঃ ৫.২ বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

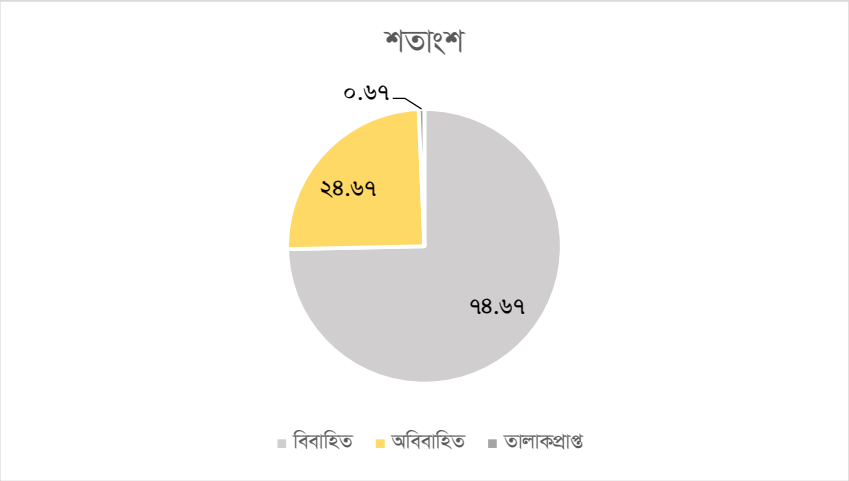

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধদের বৈবাহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, তাদের মধ্যে বিবাহিত শতকরা প্রায় ৭৪.৬৭ শতাংশ। অবিবাহিত শতকরা প্রায় ২৪.৬৭ শতাংশ এবং তালাকপ্রাপ্ত বৌদ্ধ শতকরা প্রায় ০.৬৭ শতাংশ।

সারণি-৫.৩ লিঙ্গ বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

লিঙ্গ	শতাংশ
পুরুষ	৬৭.৩৩
মহিলা	৩২.৬৭

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে গবেষণা করার নিমিত্তে উপাত্ত সংগ্রহ করে দেখা যায়, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরুষের উপস্থিতি ছিল শতকরা ৬৭.৩৩ শতাংশ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলার সংখ্যা পাই শতকরা প্রায় ৩২.৬৭ শতাংশ।

সারণি-৫.৪ শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

শিক্ষা	শতাংশ
নিরক্ষর	১.৩৩
প্রাথমিক	৬.৬৭
মাধ্যমিক	৫.৩৩
উচ্চ মাধ্যমিক	২৬.০০
ডিপ্লোমা	৬.০০
স্নাতক	২৬.৬৭
স্নাতকোত্তর	২৭.৩৩
এম.ফিল/পিএইচ.ডি	০.৬৭

লেখচিত্রঃ ৫.৪ শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

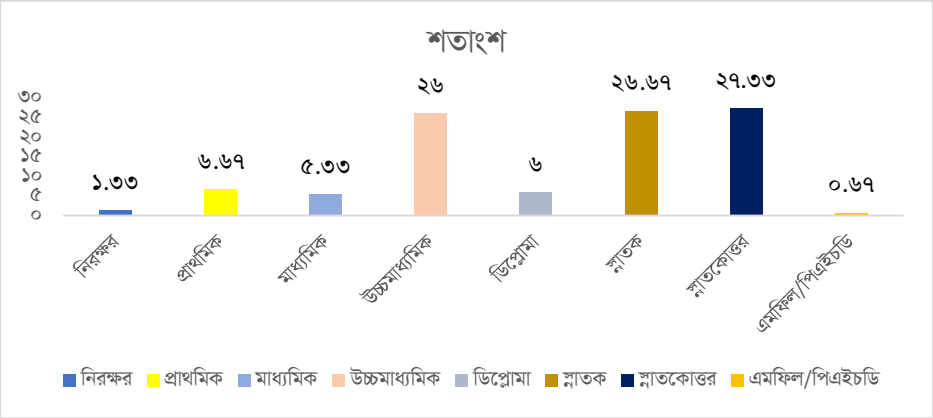

ঢাকায় অবস্থানরত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের শিক্ষার দিকে নজর দিলে দেখা যায় এখানকার বৌদ্ধদের প্রায় ১.৩৩ শতাংশ জনগণ নিরক্ষর। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সম্পন্ন করেছেন প্রায় ৬.৬৭ শতাংশ লোক। মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন ৫.৩৩ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন ২৬ শতাংশ বৌদ্ধ। এছাড়া ডিপ্লোমা বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন ৬ শতাংশ। স্নাতক সম্পন্ন করেছেন ২৬.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধ। স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন ঢাকায় বসবাসকারী প্রায় ২৭.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ এবং এম.ফিল/পিএইচ.ডি পর্যন্ত সম্পন্ন করেছেন প্রায় ০.৬৭ শতাংশ।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের মাধ্যমে ঢাকাস্থ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন কিনা তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

কদমতলা, বাসাবোতে বসবাসরত ২১ বছর বয়সী একজন পুরুষ বৌদ্ধ শিক্ষার্থী মনে করেন শিক্ষালয়ে বা সহপাঠীদের মধ্যে তিনি কোন ধরনের বৈষম্যের স্বীকার হননি। তবে এক্ষেত্রে তিনি মনে করেন শিক্ষার্থীদের প্রধান বাঁধা বা অসুবিধা হলো ধর্মীয় বিশেষ দিবসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকেনা, যেটা তিনি দেখেছেন চট্টগ্রামে বন্ধ থাকে। এছাড়া অনেক ধর্মীয় আচরণাদি পালনের ক্ষেত্রে সরকারী ছুটি দেওয়া হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের জন্য কোটা ব্যবস্থা ঢাকায় আছে কিনা সে বিষয়ে তিনি না জানলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে এক্ষেত্রে বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। (IMS-1)

বৌদ্ধরা মনে করেন শিক্ষাঙ্গণ সবার জন্য উন্মুক্ত। শিক্ষাঙ্গণে বৈষম্য কম। অন্য সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে, বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে পারে, তেমনি বৌদ্ধ শিক্ষার্থীরাও পারে। তবে

সমস্যা হলো অনেকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য এখন যে বৌদ্ধ একটা জাতি তাও অনেকে জানে না। এ যুগে এসে তা অনেক সময় আশ্চর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর বৌদ্ধদের হিন্দু ভাবে। তারা আরও জানান বাংলাদেশী বৌদ্ধরা আলাদা পালি টোল বা বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে নাই। কোন বিদেশী সহায়তা নিয়ে বা কোন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে নাই। যেমন: ১. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ২. ওআইসি (ইসলামী সম্মেলন সংস্থা) এর অনুষ্ঠানে আইইউটি (ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি) তে শুধু মুসলিম শিক্ষার্থীরাই ভর্তি হতে পারে। ঢাকার মুসলিম হাইস্কুল, আইডিয়াল স্কুলে শুধু মুসলিম শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে। এটা মনে করেন বৌদ্ধদের ব্যর্থতা, দূরদর্শিতার অভাব ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব। (IFT-1)

এক্ষেত্রে একজন বৌদ্ধ শিক্ষার্থী তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ঢাকা কলেজে পড়ার সময় তাদের সাথে বৌদ্ধ সংখ্যায় কম ছিল মাত্র ৬ জন। একদিন টিফিন এর সময় কয়েকজন মিলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অন্য একজন তার ধর্মের ব্যাখ্যা তাদের শুনায়। তারপর তাকে বলতে বলা হয় কিন্তু তার উত্তরে তারা মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। এরপর তাকে আরও প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ধর্ম একটি বিশ্বাস এবং এরপরও নানান কথায় তিনি আর কথা বাড়াননি। এ ঘটনার পর থেকে তিনি আর স্বাভাবিকভাবে চলতে পারেননি। এটাকে তিনি বৈষম্য মনে করেন যা অন্যদের থেকে তিনি আশা করেননি। (IMS-2)

সামাজিক যে বিষয়গুলি রয়েছে তার কোনটাই তারা পালন করতে পারেন না। তাদের সামাজিক উৎসব বিষু/বিষু তারা ঠিকমতো পালন করতে পারেনা কেননা সে সময় ক্লাস অথবা পরীক্ষা থাকে। আর এ উৎসবটি তিন দিন যাবৎ পালন করা হয় কিন্তু সরকারী ছুটির দিন থাকে মাত্র একটি তাই তারা বাড়িতে যেতে পারেন না। এছাড়া তারা আরও বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার্থী তুলনামূলক কম তাই অন্যান্য মুসলিম বা হিন্দু ধর্মের বন্ধুবান্ধবদের সাথে তারা মেলামেশা করেন তবে এক্ষেত্রে ধর্ম নিয়ে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি তাদের। (IMS-3)

বাসাবোতে বসবাসকারী একজন বৌদ্ধ উত্তরদাতা মনে করেন ঢাকায় বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের প্রতি সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো উচিৎ। বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো দরকার আর সেই সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধধর্ম পড়ানোর শিক্ষক নিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি মনে করেন অনেক বৌদ্ধ শিক্ষার্থীরাই দেশে থাকতে চায়না। তাদের যদি সর্বক্ষেত্রে সুযোগ প্রদান করা না হয় তাহলে সামনের দিকে অস্তিত্বের হুমকিতে পরতে পারে। তাই পাড়া, মহল্লায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, এনজিও এর সহযোগিতা, বিদেশীদের রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ঢাকায় বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ পর্যায়ে ব্যবস্থা করার কথা বলেন। (IME-1)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৌদ্ধ নারী শিক্ষার্থী বলেন তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে তার গর্ব বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এখনও। আর তিনি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যের মুখোমুখি হননি। তিনি বলেন, শিক্ষাই পারে সকল বৈষম্যকে দূর করতে। পরামর্শ দেন ধরনের সেমিনার আয়োজন করার। দেশের বাইরের ভালো স্কলার দেশে এনে তার সাথে পরিচয় করানোর মাধ্যমে জ্ঞানের আদান-প্রদানের কথা বলেন। কেউ কেউ বলেন বৌদ্ধ ধর্মচর্চা বাড়ানোর জন্য আরও বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া উচিৎ। (IFS-1)

সারণি-৫.৫ পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

পেশা	শতাংশ
গৃহিণী	১৮.৬৭
ব্যবসায়ী	১৬
সরকারী চাকুরিজীবী	১১.৩৩
বেসরকারী চাকুরিজীবী	৩৫.৩৩
বেকার	৯.৩৩
অন্যান্য	৯.৩৩

লেখচিত্র-৫.৫ পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

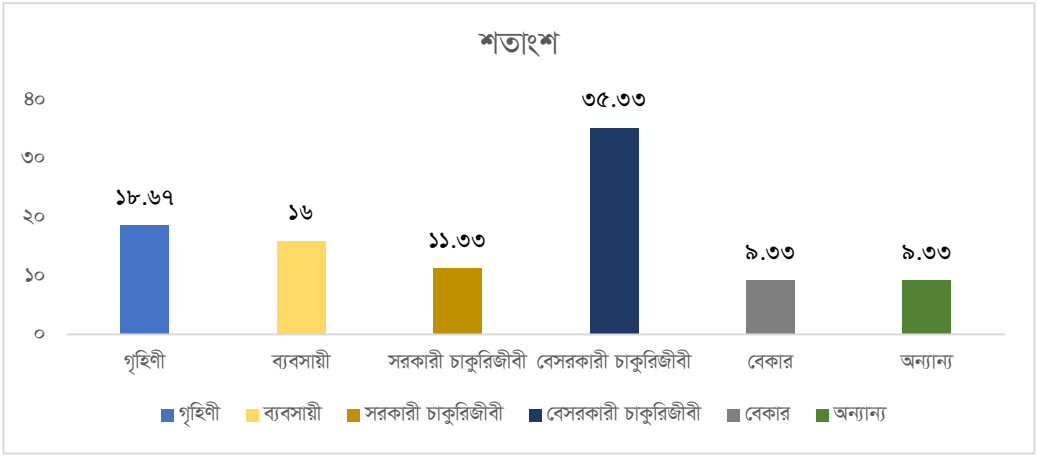

ঢাকায় অবস্থানরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পেশা পর্যালোচনা করে দেখা যায় তাদের মধ্যে গৃহিণী শতকরা ১৮.৬৭ শতাংশ, ব্যবসায়ী ১৬ শতাংশ, সরকারী চাকুরিজীবী ১১.৩৩ শতাংশ, বেসরকারী চাকুরিজীবী ৩৫.৩৩ শতাংশ। এছাড়া বেকার ও অন্যান্য পেশায় সম্পৃক্ত শতকরা ৯.৩৩ শতাংশ।

কে.আই.আই থেকে জানা যায়, অনেকে মনে করেন ঢাকাতে অনেক সফল বৌদ্ধ ব্যবসায়ী আছেন। এছাড়া কাজের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন কিনা এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তারা বলেন, কাজের বা দায়িত্বের সুষম বণ্টন যদি না হয় তাহলে সবার ক্ষেত্রে বৈষম্য হয়। তবে ইদের সময় বৌদ্ধদের কর্মস্থলে অনেক সময় বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয়। মুসলমান কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা তখন দুটি উৎসব বাধ্যতামূলকভাবে ভোগ করে। তখন কোন কোন ক্ষেত্রে সেখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয়। অপরদিকে

কর্মস্থলে বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা ছাড়া আর কোন আলাদা ছুটি নেই। অনেকে ব্যবসার ক্ষেত্রে মনে করেন ব্যবসায় যদি মূলধন খাটাতে পারে বিনিয়োগ করতে পারে সকলেই ব্যবসা করতে পারেন। ঋণ সুবিধা বৌদ্ধদের আলাদা করে কোন ব্যবস্থা নেই। সবার আইনসম্মত ব্যবসা করতে যা প্রয়োজন সকলেই তা করতে পারেন। সমস্যা সবার জন্য একই রকম। আর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অনেক উদ্বৃত্ত জিনিসও নষ্ট হয়। কোন বৌদ্ধ রাষ্ট্রও বাঙালী বৌদ্ধদের জন্য আলাদা কোন ব্যবসা সহায়তা দেয় না। (IFT-1)

অনেকে মনে করেন নতুন যারা ঢাকায় আসে তাদের জন্য বাসাবাড়ি, চাকরি পাওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের কাছে থাকতে হয় নানা সমস্যায় পড়তে হয়। অনেকে ঢাকায় এসে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং শিখে এরপর চাকুরি পেতে সমস্যা হয়না। (IMB-1)

এক্ষেত্রে মহিলাদের কাছে থেকে জানা যায় মার্কেটে গেলে পাহাড়ী দেখতে অনেকে কটু কথা বলেন। ভাষা ও দেখের গঠন নিয়েও কটু কথা শুনতে হয় তবে এতে ব্যবসায় তেমন সমস্য হয়না। অনেকে বলেন চাকরিক্ষেত্রে বেতন/পদে বৈষম্য হয়। তারা বলেন চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হলেও তারা চেষ্টা করেন বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তা মোকাবেলা করার। অপরদিকে ব্যবসা করতে গেলে পুঁজির সমস্যা, নিজেদের উদ্যোগের অভাব আর অনেকেই ঝুঁকি নিতে চান না। রামপুরায় বসবাসরত একজন যন্ত্র কৌশলী জানান তিনিও চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন। তবে বর্তমান সরকার বৌদ্ধদের সম্মান দিয়েছেন। তিনি এক সময় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরি করতেন এখন একটি প্রাইভেট ফার্মে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তিনি বলেন বর্তমান সকারের আমলে যদি তার চাকুরি থাকত তাহলে তাঁর পদোন্নয়ন হত। অনেকে মনে করেন মেয়েদের ব্যবসা না করাই উচিৎ। কারণ এখানে বেশিরভাগ মানুষ বৌদ্ধ নয়। তাই সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বিধর্মীদের সাথে উঠাবসা হবে যার ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ লোপ পাবে। (IFHW-1)

সারণি-৫.৬ বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

বাসস্থানের ধরণ	শতাংশ
ফ্ল্যাট/পাকা বাড়ি	৯৪.৬৭
আধাপাকা বাড়ি	৫.৩৩

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বর্তমান আবাসস্থল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ফ্ল্যাট/পাকা বাড়িতে বসবাস করেন শতকরা প্রায় ৯৪.৬৭ শতাংশ এবং আধা পাকা বাড়িতে বসবাস করেন শতকরা ৫.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ

সারণি-৫.৭ বাসস্থানের মালিকানার ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

বাসস্থানের মালিকানার ধরণ	শতাংশ
নিজস্ব বাড়ি	১৩.৩৩
ভাড়া বাড়ি	৮৩.৩৩
শেয়ারে মালিকানা	০.৬৭
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত	০.৬৭
অন্যান্য	২.০০

লেখচিত্র-৫.৭ বাসস্থানের মালিকানার ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

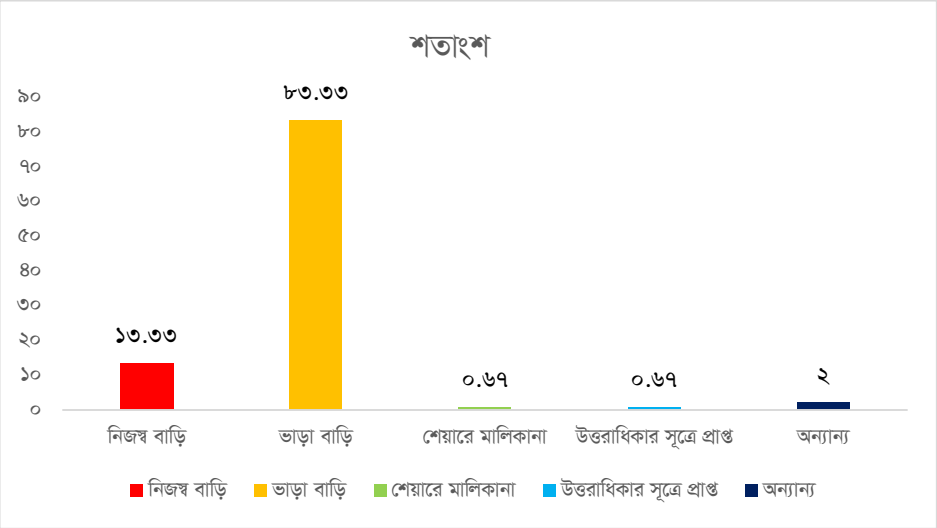

ঢাকায় অবস্থানরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থানের মালিকানার ধরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তাদের মধ্যে নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করেন শতকরা ১৩.৩৩ শতাংশ। অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতে দেখতে পাই যা শতকরা প্রায় ৮৩.৩৩ শতাংশ। শেয়ারে মালিকানা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাড়িতে বসবাস করেন শতকরা ০.৬৭ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য বাসস্থানে বসবাস করেন শতকরা ২.০০ শতাংশ বৌদ্ধ।

সারণি-৫.৮ পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

পরিবারের ধরণ	শতাংশ
একক পরিবার	৭৫.৩৩
যৌথ পরিবার	২৩.৩৩
অণু পরিবার	০.৬৭
অন্যান্য	০.৬৭

ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে ধর্মভিত্তিক বৌদ্ধ জনসংখ্যার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এখানে তাদের পরিবার কাঠামোতে একক পরিবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সংগৃহীত মোট উপাত্তের শতকরা ৭৫.৩৩ শতাংশ। অপরদিকে যৌথ পরিবার পরিলক্ষিত হয় শতকরা প্রায় ২৩.৩৩ শতাংশ। এছাড়া অণু পরিবার ও অন্যান্য পরিবার কাঠামোতে বসবাস করেন শতকরা ০.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধ।

সারণি-৫.৯ পারিবারিক পদবি সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

পারিবারিক পদবি	শতাংশ
বড়ুয়া	৮৮.০০
মুৎসুদ্দি	১.৩৩
তালুকদার	০.৬৭
চৌধুরী	২.০০
চাকমা	১.৩৩
দেওয়ান	০.৬৭
প্রযোজ্য নয়	৫.৩৩
তঞ্চঙ্গা	০.৬৭

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পারিবারিক পদবি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এক্ষেত্রে বড়ুয়া পদবিধারী বৌদ্ধের সংখ্যা সর্বাধিক যা শতকরা প্রায় ৮৮.০০ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য পদবির মধ্যে মুৎসুদ্দি, চৌধুরী, চাকমা ও না যাদের শতকরা হার যথাক্রমে ১.৩৩, ২.০০, ১.৩৩, ৫.৩৩ শতাংশ। এছাড়া তালুকদার, দেওয়ান ও তঞ্চঙ্গা পদবিধারী বৌদ্ধের সংখ্যা শতকরা ০.৬৭ শতাংশ।

সারণি-৫.১০ নৃতাত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

নৃতাত্ত্বিক অবস্থা	শতাংশ
চাকমা	২০.০০
মারমা	২.০০
ওড়াঁও	০.৬৭
অন্যান্য	৭৭.৩৩

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে তাদের নৃতাত্ত্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এদের মধ্যে চাকমা রয়েছেন শতকরা ২০.০০ শতাংশ। মারমা রয়েছেন শতকরা ২.০০ শতাংশ। ওঁড়াও রয়েছেন শতকরা ০.৬৭ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য নৃতত্ত্বের প্রায় ৭৭.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ রয়েছেন।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে জানা যায়, বৌদ্ধ যারা বাংলাদেশে আছে তারা সংখ্যায় কম হলেও নিজেরা কখনো নিজেদেরকে সংখ্যালঘু মনে করেন না। তারা স্বকীয়তায় ও মর্যদায় সবার মতই একজন মনে প্রাণে বাঙালি।

তবে অন্য সম্প্রদায় যদি তাদেরকে সংখ্যালঘু মনে করে সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ, সেটা ঢাকা হোক বা ঢাকার বাহিরে হোক। (IFT-1)

সারণি-৫.১০ জন্ম নিবাস সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

জন্ম নিবাস	শতাংশ
শহর	১১.৩৩
গ্রাম	৮৮.৬৭

ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্ম নিবাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায়, এখানকার শতকরা ১১.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধদের জন্ম নিবাস শহরে এবং শতকরা প্রায় ৮৮.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধদের জন্ম নিবাস গ্রামে।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে থেকে জানা যায় বাংলাদেশে বৌদ্ধরা মূলত চট্টগ্রাম (সমতলীয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম), কুমিল্লা, মিরসরাই, রংপুর বা উত্তরবঙ্গে কিছু বৌদ্ধ বাস করেন। তবে জীবনটাই চ্যালেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য বেশির ভাগ বৌদ্ধরা ঢাকায় আসেন। বৌদ্ধদের আদি জাতিসত্ত্বা চর্যাপদ, আরকান বৌদ্ধ ইতিহাস, বঙ্গীয় ইতহাস বৌদ্ধরা কিন্তু বাঙালি জাতিসত্ত্বার মূল অংশ। (IFT-1)

সারণি-৫.১১ পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তরদাতার সম্পর্ক

পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তরদাতার সম্পর্ক	শতাংশ
অন্য কোন সদস্য নেই	৫.৯৭
স্বামী	৮.২৩
স্ত্রী	১১.৫২
বাবা/শ্বশুর	১২.৭৬
মা/শ্বাশুড়ি	১৩.১৭
ভাই/দেবর	৬.৩৮
বোন/ননদ	৩.৫০
পুত্র	১৯.১৪
কন্যা	১৩.৭৯
পুত্রবধূ	২.৬৭
নাতী	০.৬২
নাতনী	০.৬২
বৌদি	০.৮২
পরিচালিকা	০.২১
অন্যান্য	০.৬৩

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্ক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৫.৯৭ শতাংশ বৌদ্ধদের পরিবারে অন্য কোন সদস্য নেই। এছাড়া অন্যান্য যে সকল পারিবারিক সদস্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা শতকরা যথাক্রমে, স্বামী ৮.২৩ শতাংশ, স্ত্রী ১১.৫২ শতাংশ, বাবা/শ্বশুর ১২.৭৬ শতাংশ, মা/শ্বাশুড়ি ১৩.১৭ শতাংশ, ভাই/দেবর ৬.৩৮ শতাংশ, বোন/ননদ ৩.৫০ শতাংশ, পুত্র ১৯.১৪ শতাংশ, কন্যা ১৩.৭৯ শতাংশ, পুত্রবধূ ২.৬৭ শতাংশ, নাতী ০.৬২ শতাংশ, নাতনী ০.৬২ শতাংশ, বৌদি ০.৮২ শতাংশ, পরিচালিকা ০.২১ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য সদস্য রয়েছে শতকরা প্রায় ০.৬৩ শতাংশ।

সারণি-৫.১২ মেয়েদের বৈবাহিক অবস্থা

মেয়েদের বৈবাহিক অবস্থা	শতাংশ
বিবাহিত	৫১.৯৬
অবিবাহিত	৪৭.৬৩
তালাকপ্রাপ্ত	০.২১
আলাদা	০.২১

লেখচিত্র-৫.১২ মেয়েদের বৈবাহিক অবস্থা

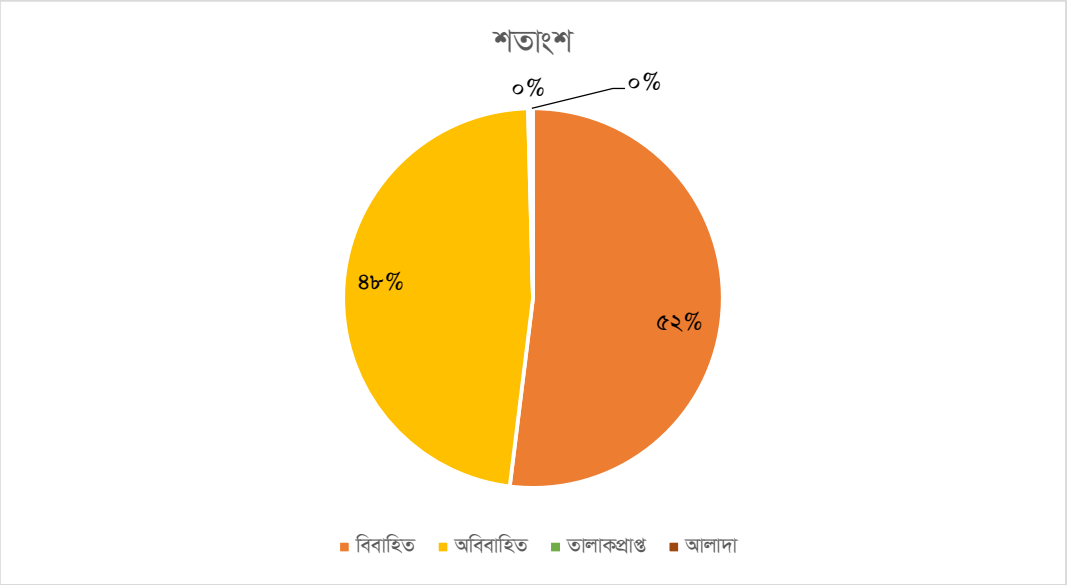

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ মেয়েদের বৈবাহিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এদের মধ্যে বিবাহিত শতকরা ৫১.৯৬ শতাংশ। অবিবাহিত শতকরা ৪৭.৬৩ শতাংশ। তালাকপ্রাপ্ত শতকরা ০.২১ শতাংশ। এছাড়া আলাদা থাকেন শতকরা ০.২১ শতাংশ বৌদ্ধ মেয়ে।

সারণি-৫.১৩ নারী শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

নারী শিক্ষা	শতাংশ
স্কুলে যাবার বয়স হয়নি	১০.০৯
নিরক্ষর	৪.৯৪
প্রাথমিক	১৮.৩১
মাধ্যমিক	২৪.০৭
উচ্চ মাধ্যমিক	৯.৮৮
ডিপ্লোমা	২.৬৭
স্নাতক	১৮.৫২
স্নাতকোত্তর	৯.৪৭
এম.ফিল/পিএইচ.ডি	১.৬৫
অন্যান্য	০.৪১

ঢাকায় অবস্থানরত নারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষার হার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নারীরাও শিক্ষায় সমানভাবে অগ্রসর। এক্ষেত্রে নিরক্ষর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারীর হার শতকরা ৪.৯৪ শতাংশ। এখনও স্কুলে যাবার বয়স হয়নি এমন নারী পাওয়া গেছে শতকরা ১০.০৯ শতাংশ। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে শতকরা ১৮.৩১ শতাংশ। মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেছে শতকরা ২৪.০৭ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেছে শতকরা ৯.৮৮ শতাংশ। ডিপ্লোমা শিক্ষায় আছেন শতকরা ২.৬৭ শতাংশ নারী। স্নাতক পর্যায়ে আছেন শতকরা ১৮.৫২ শতাংশ।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আছেন শতকরা ৯.৪৭ শতাংশ। এছাড়া এম.ফিল/পিএইচ.ডি পর্যায়ে আছেন ১.৬৫ শতাংশ এবং অন্যান্য শিক্ষায় সম্পৃক্ত আছেন শতকরা ০.৪১ শতাংশ নারী।

সারণি-৫.১৪ নারীদের পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

নারীদের পেশা	শতাংশ
শিক্ষার্থী	৭.৮৪
কৃষক	২.২৭
গৃহিণী	২৫.৫৭
দিন মজুর	০.৮২
ব্যবসায়ী	৬.৬০
সরকারী চাকুরিজীবী	২.৬৮
বেসরকারী চাকুরিজীবী	১১.৫৫
বেকার	৬.৮০
অবসর প্রাপ্ত	১.০৩
অন্যান্য	৩১.১৩
পরিচালিকা	১.২৪
শিশু	২.০৬
প্রবাসী	০.২১
ডাক্তার	০.২১

ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারীদের পেশা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তাদের মধ্যে শতকরা ৭.৮৪ শতাংশ ছাত্র, ২.২৭ শতাংশ কৃষক, ২৫.৫৭ শতাংশ গৃহিণী, ০.৮২ শতাংশ দিন মজুর, ৬.৬০ শতাংশ ব্যবসায়ী, ২.৬৮ শতাংশ সরকারী চাকুরিজীবী, ১১.৫৫ শতাংশ বেসরকারী চাকুরিজীবী এবং ০.২১ শতাংশ ডাক্তার। এছাড়া নারীদের মধ্যে বেকার শতকরা ৬.৮০ শতাংশ, অবসরপ্রাপ্ত শতকরা ১.০৩ শতাংশ, প্রবাসী শতকরা ০.২১ শতাংশ, পরিচালিকা শতকরা ১.২৪ শতাংশ। উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ২.০৬ শতাংশ শিশু এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন শতকরা প্রায় ৩১.১৩ শতাংশ নারী।

সারণি-৫.১৫ আয়ের খাতসমূহের বিন্যাস

আয়ের খাতসমূহ	গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
সঞ্চয়/পেনশন	১২৫০০	১০০০০	১৫০০০
সম্পত্তি ভাড়া (বাসা, দোকান, গাড়ি)	২৩০৬৬৬.৭	৫০০০	১৫০০০০০
ব্যবসা	২৫৬৯০৯.১	১০০০০	১০৮০০০০
কৃষি/খামার	৮১৫০০	২০০০০	৩৫০০০০
প্রযোজ্য নয়	৮২৪.৫৬১৪	০	৩০০০০

ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আয়ের খাতসমূহ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় এক্ষেত্রে সঞ্চয়/পেনশন হতে গড় আয় ১২,৫০০ টাকা যেখানে সর্বনিম্ন আয় পাওয়া যায় ১০,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ আয় ১৫,০০০ টাকা। সম্পত্তি

ভাড়া (বাসা, দোকান, গাড়ি) থেকে তাদের গড় আয় পাওয়া যায় ২৩০৬৬৬.৭ টাকা যেখানে সর্বনিম্ন আয় পাওয়া যায় ৫,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ আয় পাওয়া যায় ১৫,০০,০০০ টাকা। ব্যবসা থেকে ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের গড় আয় পাওয়া যায় ২৫৬৯০৯.১ টাকা যেখানে সর্বনিম্ন আয় ১০,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ আয় ১০,৮০,০০০ টাকা। কৃষি/খামার থেকে এক্ষেত্রে গড় আয় পাওয়া যায় ৮১৫০০ টাকা যেখানে আয় সর্বনিম্ন ২০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত। যে সকল উত্তরদাতার ক্ষেত্রে আয়ের খাত প্রযোজ্য নয় তাদের ক্ষেত্রে গড় আয় পাওয়া গেছে ৮২৪.৫৬১৪ টাকা এক্ষেত্রে আয় সর্বনিম্ন০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

সারণি-৫.১৬ পরিবারের মাসিক ও বাৎসরিক আয়ের তালিকা

পরিবারের মাসিক ও বাৎসরিক আয়ের তালিকা	গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
মাসিক আয়	৪৮৯১৮.৫	০	১০০০০০০
বাৎসরিক আয়	১১৩১০.৬৭	০	৫০০০০০

ঢাকায় বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পরিবারের মাসিক ও বাৎসরিক আয় সম্পর্কে জানা যায়, তাদের মাসিক আয়ের গড় ৪৮৯১৮.৫ টাকা যেখানে সর্বনিম্ন আয় ০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ আয় ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। অপরদিকে তাদের বাৎসরিক আয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করে জানা যায়, তাদের বাৎসরিক গড় আয় ১১৩১০.৬৭ টাকা যেখানে সর্বনিম্ন আয় ০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ আয় ৫০,০,০০০ টাকা পর্যন্ত।

সারণি-৫.১৭ পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং সদস্যদের বয়স

পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং সদস্যদের বয়স	গড়	সর্বনিম্ন	সর্বচ্চো
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	৪.০২	০	৭
পরিবারের সদস্যদের বয়স	৩০.৫৫৩৫	০	৮৫

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যার দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়, তারা সাধারণত ছোট পরিবার গঠনে আগ্রহী। এক্ষেত্রে তাদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা দেখতে পাই, ৪.০২ জন যেখানে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ০ জন থেকে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৭ জন পর্যন্ত দেখতে পাই। অপরদিকে পরিবারের সদস্যদের গড় বয়স পর্যালোচনা করে দেখতে পাই, তাদের গড় বয়স ৩০.৫৫৩৫ বছর যেখানে সর্বনিম্ন বয়স ০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৮৫ বছর বয়স পর্যন্ত।

সারণি-৫.১৮ ব্যয়ের খাতসমূহ(মাসিক)

ব্যয়ের খাতসমূহ(মাসিক)	গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে	৩৮৪১.৬১১	০	৮০০০০
প্রাতিষ্ঠানিক টিউশন ফি	২০২৬.৬৭৭	০	৩০০০০
ব্যক্তিগত টিউশন ফি	১২১৩.৩৩৩	০	১৬০০০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত	১৫৭৫.৬৬৭	০	১৭০০০
চিকিৎসা ব্যয়	৫৩৮৮	০	১০০০০০
চিত্ত বিনোদন	২০৭০.৬৬৭	০	২০০০০
খাদ্য	১৫৩২৪.৬৭	০	৬০০০০
যাতায়াত	৩৪৫১.৬৬৭	০	৫০০০০
অন্যান্য	৩৪৩৫.৩৩৩	০	৪০০০০

ঢাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলীম্বদের মাসিক ব্যয়ের খাতসমূহ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, তাদের শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে গড় ব্যয় ৩৮৪১.৬১১ টাকা যেখানে সর্বনিম্ন ব্যয় ০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ব্যয় ৮০০০০ টা পর্যন্ত। প্রাতিষ্ঠানিক টিউশন ফি প্রদানে গড় ব্যয় ২০২৬.৬৭৭ টাকা যেখানে সর্বনিম্ন ব্যয় ০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ব্যয় ৩০,০০০ টাকা। ব্যক্তিগত টিউশন ফি প্রদানে গড় ব্যয় ১২১৩.৩৩৩ টাকা যেখানে সর্বনিম্ন ০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ব্যয় ১৬,০০০ টাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সংক্রান্ত গড় ব্যয় ১৫৭৫.৬৬৭ টাকা। যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় পাওয়া যায় ১৭,০০০ টাকা। এছাড়া গড় চিকিৎসা ব্যয় ৫,৩৮৮ টাকা। এ খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় পাওয়া যায় ১০,০০০০ টাকা পর্যন্ত। চিত্ত বিনোদন ঢাকাস্থ বৌদ্ধদের গড় ব্যয় ২০৭০.৬৬৭ যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় পাওয়া যায় ২০,০০০ টাকা। খাদ্য খাতে গড় ব্যয় পাওয়া যায় সর্বোচ্চ ১৫৩২৪.৬৭ টাকা যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় পাওয়া যায় ৬০,০০০ টাকা। যাতায়াতের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় ৩৪৫১.৬৭৭ টাকা যেখানে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য খাতে গড় ব্যয় ৩৪৩৫.৩৩৩ টাকা যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় ৪০,০০০ টাকা।

সারণি-৫.১৯ ব্যয়ের খাতসমূহ (বাৎসরিক)

ব্যয়ের খাতসমূহ (বাৎসরিক)	গড়	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
গৃহ নির্মান, আসবাবপত্র	১৩২৫৫.০৩	০	৪০০০০০
শিক্ষা ব্যয় (বাৎসরিক, যা পূর্ব উল্লিখিত হয়নি)	৮১৬২.৪১৬	০	৮০০০০
বস্ত্র	৬৭৫৫.৭০৫	০	১৫০০০০
ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক আচারানুষ্ঠান	৬৭০৬.৭১১	০	১০০০০০
সামাজিক অনুষ্ঠান	৪২২৯.৭৩	০	৫০০০০
ভ্রমণ	৪০৮৭.২৪৮	০	৮৫০০০
ঋণ সংক্রান্ত ব্যয়/কিস্তি	১২২৭.৫৬৮	০	১০০০০০
অন্যান্য	৮২৫.৫০৩৪	০	৬০০০০

এদিকে ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাৎসরিক ব্যয়ের বিভিন্ন খাতসমূহ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরীতে তাদের গড় ব্যয় বছরে ১৩২৫৫.০৩ টাকা যেখানে সর্বোচ্চ ৪০,০০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে দেখা যায়। বাৎসরিক শিক্ষা ক্ষেত্রে (যা পূর্বে উল্লিখিত হয়নি) তাদের গড় ব্যয় ৮১৬২.৪১৬ টাকা

যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় পাওয়া যায় বছরে ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত। বস্ত্র ক্রয় বাবাদ বৌদ্ধদের বাৎসরিক গড় ব্যয় ৬৭৫৫.৭০৫ টাকা যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় হয় ১৫,০০০০ টাকা। ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক আচারনুষ্ঠান আয়োজনে গড় ব্যয় ৬৭০৬.৭১১ টাকা। এক্ষেত্রে বছরে সর্বোচ্চ ব্যয় পাওয়া যায় ১০,০০০০ টাকা। সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে বৌদ্ধদের গড় বাৎসরিক ব্যয় ৪২২৯.৭৩ টাকা যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় হয় বছরে ৫০,০০০ টাকা। এছাড়া ঢাকাস্থ বৌদ্ধদের ভ্রমণ সংক্রান্ত বাৎসরিক গড় ব্যয় ৪০৮৭.২৪৮ টাকা যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় করতে দেখা যায় ৮৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। ঋণ সংক্রান্ত বা কিস্তি প্রদান সংক্রান্ত বাৎসরিক ব্যয়ের গড় পাওয়া যায় ১২২৭.৫৬৮ টাকা যা সর্বোচ্চ ১০,০০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া অন্যান্য খাতে গড় বাৎসরিক খরচ ৮২৫.৫০৩৪ টাকা যেখানে সর্বোচ্চ ব্যয় ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত দেখা যায়।

সারণি-৫.২০ ঋণ নেয়া প্রয়োজন কিনা

ঋণ নেয়া প্রয়োজন কিনা	শতাংশ
হ্যাঁ	১৫.৩৩
না	৮৪.৬৭

ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাসিক ও বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ সম্পর্কে জানার পর তাদের কাছে জানতে চাই, তাদের কোন ধরনের ঋণ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। এক্ষেত্রে দেখতে পাই, শতকরা প্রায় ১৫.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এছাড়া বাকি ৮৪.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য স্বাবলম্বী এক্ষেত্রে তাদের ঋণ গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বলে তারা জানান।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে জানা যায়, অনেকে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তারা বলেন টাকা ঋণ দিলে ফেরত দিতে কম চায় এবং এতে উল্টো সমস্যায় পড়তে হয় তাদের। (IFHW-2)

লেখচিত্র-৫.২১ ঋণ নেয়া প্রয়োজন কিনা

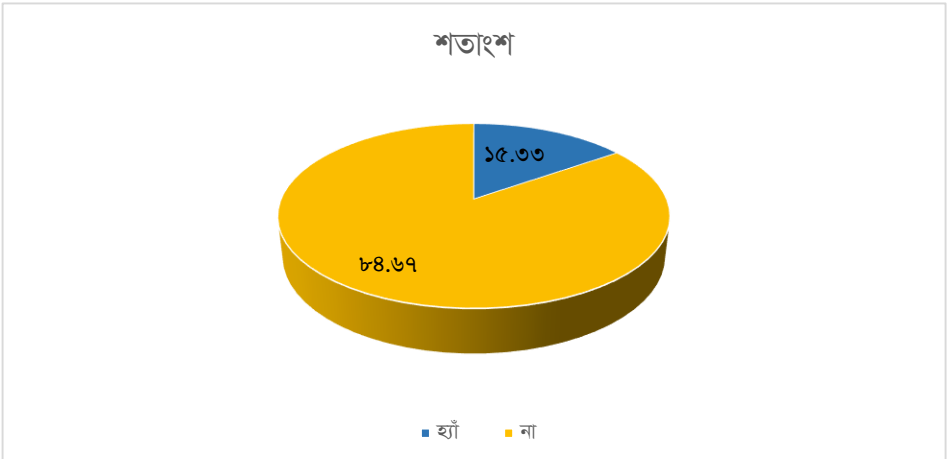

সারণি-৫.২২ ঋণ গ্রহণের উৎস

ঋণ গ্রহণের উৎস	শতাংশ
ব্যাংক	৪.৬৭
চাকুরি	০.৬৭
আত্মীয়	১.৩৩
সমতি/সমবায়সমিতি	৮.০০
কর্মস্থল	০.৬৭
প্রযোজ্য নয়	৮৪.৬৭

লেখচিত্র-৫.২২ ঋণ গ্রহণের উৎস

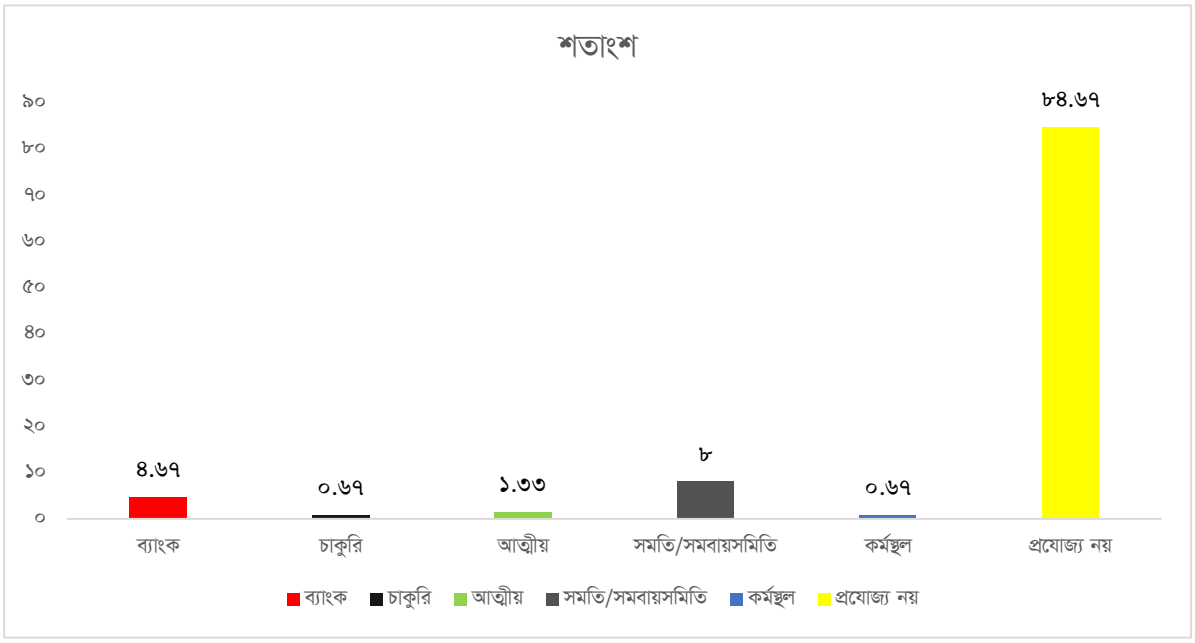

ঢাকাস্থ বৌদ্ধদের যাদের ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন তাদের ঋণ গ্রহণের উৎস সম্পর্কে জানা যায়, শতকরা প্রায় ৪.৬৭ শতাংশ লোক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করেন। চাকুরি হতে ঋণ গ্রহণ করেন শতকরা ০.৬৭ শতাংশ লোক। আত্মীয়

হতে ঋণ নেন শতকরা ১.৩৩ শতাংশ। তবে সবচাইতে বেশি লোক ঋণ গ্রহণ করেন সমতি/সমবায় সমিতি হতে যা শতকরা প্রায় ৮.০০ শতাংশ। এছাড়া কর্মস্থল হতে ঋণ গ্রহণ করেন ০.৬৭ শতাংশ লোক। তবে ঢাকাস্থ বৌদ্ধদের মধ্যে শতকরা ৮৪.৬৭ শতাংশের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই।

সারণি-৫.২৩ সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত আছেন কিনা

সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত আছেন কিনা	শতাংশ
হ্যাঁ	৩৬.০০
না	৬৪.০০

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায় ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধদের মধ্যে শতকরা ৩৬ শতাংশ লোক সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত এবং বাকি ৬৪ শতাংশ লোক কোন সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত নন।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে বৌদ্ধদের সমবায় সমিতিতে সংযুক্ত হবার ব্যপারে জানতে চাইলে অনেকে বলেন ব্যবসা করতে গেলে সহজে তারা সমিতি থেকে লোন পান না। (IMB-1)

সারণি-৫.২৪ কোন ধরণের সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত

কোন ধরণের সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত	শতাংশ
সঞ্চয় সমিতি	২৪.৬৭
পেশাদার সমিতি	০.৬৭
স্থানীয় সমবায় সমিতি	১০.৬৭
প্রযোজ্য নয়	৬৪

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধদের মধ্যে যারা সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত তারা কোন ধরণের সমবায় সমিতির সাথে সংযুক্ত আছেন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ বৌদ্ধ সঞ্চয় সমিতির সাথে সম্পৃক্ত যা শতকরা প্রায় ২৪.৬৭ শতাংশ। এছাড়া পেশাদার সমিতির সাথে সম্পৃক্ত শতকরা ০.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধ এবং স্থানীয় সমবায় সমিতির সাথে সম্পৃক্ত শতকরা ১০.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধ। তাছাড়া শতকরা প্রায় ৬৪ শতাংশ বৌদ্ধ কোন সমবায় সমিতির সাথে সম্পৃক্ত নন।

সারণি-৫.২৫ সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত হবার কারণ

সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত হবার কারণ	শতাংশ
ব্যবসায়িক কারণে	০.৬৭
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	৩.৩৩
সঞ্চয়	২৪
আয় বৃদ্ধি	০.৬৭
সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধন	২.৬৬
সমন্বয় সাধন ও ভবিষ্যৎ সচ্ছলতা	১.৩৪
প্রযোজ্য নয়	৬৭.৩৩

ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী যারা সমবায় সমিতিতে যুক্ত আছেন তাদের সমবায় সমিতিতে যুক্ত হবার নানাবিধ কারন দেখা যায়। তবে তাদের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতাই তাদেরকে মূলত সমবায় সমিতিতে যুক্ত করে বলে মনে হয়েছে এক্ষেত্রে সঞ্চয়ের জন্য সমবায় সমিতিতে যুক্ত হন শতকরা প্রায় ২৪ শতাংশ লোক। এছাড়া ব্যবসায়িক কারণে যুক্ত হয় ০.৬৭ শতাংশ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যুক্ত হন ৩.৩৩ শতাংশ, আয় বৃদ্ধির জন্য সংযুক্ত হন ০.৬৭ শতাংশ। তাছাড়া সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধন সৃষ্টির নিমিত্তে সমবায় সমিতিতে যুক্ত হন শতকরা ২.৬৬ শতাংশ বৌদ্ধ এবং সমন্বয় সাধন ও ভবিষ্যৎ সচ্ছলতা নিশ্চিতের জন্য সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত আছেন শতকরা প্রায় ১.৩৪ শতাংশ বৌদ্ধ।

সারণি-৫.২৬ পরিবারের যানবাহনের ধরণ

পরিবারের যানবাহনের ধরণ	শতাংশ
বাস	৯২.৩৭
রিক্সা	৩.৩১
মোটর সাইকেল	০.২৫
সাইকেল	০.২৫
সিএনজি/অটো	২.৫৪
প্রাইভেট গাড়ি	১.২৭

ঢাকায় বসবাসকারী বৌদ্ধরা পারিবারিকভাবে যে সকল যানবাহন ব্যবহার করে তার তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অধিকাংশ বৌদ্ধ নাগরিক তাদের দৈনন্দিন চলাচলের জন্য বাস ব্যবহার করেন যা শতকরা প্রায় ৯২.৩৭ শতাংশ। এছাড়া রিক্সা ব্যবহার করেন শতকরা ৩.৩১ শতাংশ। মোটর সাইকেল ব্যবহার করেন শতকরা ০.২৫ শতাংশ। সাইকেল ব্যবহার করেন শতকরা ০.২৫ শতাংশ। সিএনজি/অটো ব্যবহার করেন শতকরা ২.৫৪ শতাংশ। এছাড়া প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার করেন শতকরা প্রায় ১.২৭ শতাংশ বৌদ্ধ।

সারণি-৫.২৭ পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি

পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি	শতাংশ
বাড়ি/ফ্ল্যাট	৯৩.৬৪
জমি/সম্পত্তি	২.২৭
গাড়ি	১.৩৬
ব্যবসায়ীক সম্পত্তি	০.৯১
মূল্যবান সম্পত্তি (স্বর্ণালঙ্কার)	১.৮২

ঢাকায় বসবাসকারী বৌদ্ধদের পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ বৌদ্ধদের নিজস্ব পারিবারিক সম্পত্তির তালিকায় রয়েছে বাড়ি/ফ্ল্যাট যা শতকরা প্রায় ৯৩.৬৪ শতাংশ। এছাড়া জমি/সম্পত্তি রয়েছে শতকরা ২.২৭ শতাংশ বৌদ্ধের। গাড়ি রয়েছে শতকরা ১.৩৬ জনের। ব্যবসায়ীক সম্পত্তি রয়েছে শতকরা ০.৯১ শতাংশ লোকের। তাছাড়া মূল্যবান সম্পত্তি (স্বর্ণালঙ্কার) আছে শতকরা প্রায় ১.৮২ শতাংশ বৌদ্ধদের।

সারণি-৫.২৭ পরিবারের লোকেরা সামাজিক যে সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে

পরিবারের লোকেরা সামাজিক যে সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে	শতাংশ
ক্রীড়া	৯২.৩১
সাংস্কৃতিক	২.২০
আচারানুষ্ঠান	৪.৪০
অন্যান্য	১.১০

ঢাকাস্থ বৌদ্ধ পরিবারের লোকেরা সামাজিক যে সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে তা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তারা খেলাধুলার সাথেই অধিক সম্পৃক্ত। তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯২.৩১ শতাংশ লোক ক্রীড়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় শতকরা ২.২০ শতাংশ লোক। আচারানুষ্ঠানে অংশ নেয় শতকরা ৪.৪০ শতাংশ জন। এছাড়া অন্যান্য নানাবিধ সামাজিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন শতকরা প্রায় ১.১০ শতাংশ বৌদ্ধ।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে ঢাকাস্থ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের অনুভূতি সম্পর্কে জানা যায়:

কদমতলা, বাসাবোতে বসবাসরত ২১ বছর বয়সী একজন পুরুষ শিক্ষার্থী মনে করেন এখানে সামাজিক সকল কাজ করা যায় তবে সেটা ছোট পরিবেশে করতে হয়, নিজ বাড়িতে যেমন করা যায় এখানে কিছুটা নিয়মের ভিত্তিতে করতে হয়, বাড়িওয়ালার কিছু নিয়ম এবং ঢাকা শহরের নাগরিক পরিবেশের কারণে কিছু বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়, যা ঢাকার সকল ধর্মের মানুষের মানতে হয়। (IMS-1)

এ প্রসঙ্গে একজন নারী মনে করেন সকল সম্প্রদায় এর সাথে মিলে মিশে চলার অসম্প্রদায়িক চেতনা বৌদ্ধদের আছে। তারা ইদ, পূজা, পার্বণ সবার সাথে পালন করেন। নিজেদের উৎসবের সময়ও তাদের আনন্দ সবার সাথে শেয়ার করেন। অন্য সম্প্রদায়েরর সুখ-দুঃখেও তারা অংশগ্রহণ করেন, যেমন বিয়ে, মৃত্যু, জন্ম, মিলাদ, পূজা, বড়দিনের অনুষ্ঠানে, বৌদ্ধ পূর্ণিমা গুলোত মন্দিরে পবিত্রভাবে সব ধর্মের মানুষ যাতায়াত করতে পারেন। তবে মসজিদ মন্দিরে বাঁধা আছে বৈকি। বৌদ্ধদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথেই বিবাহ-সামাজিক কজন গুলো সীমাবদ্ধ অন্য সম্প্রদায়ের মতো। যদি ভাবা হয় যে, আমরা মানবধর্মে বিশ্বাসী তাহলে সব সম্প্রদায় একসাথে মিলেমিশে থাকতে কোন বাঁধা আসবে না। তা না হলেই বিভেদ তৈরি হতে থাকবেই। (IFT-1)

সারণি-৫.২৭: অবসরে যে কাজ করতে পছন্দ করেন

অবসরে যে কাজ করতে পছন্দ করেন	শতাংশ
টেলিভিশন দেখা	৯৩.৭৪
বইপড়া	১.৩৪
খেলাধুলা করা	০.৬৭
গল্প করা	০.৬৭
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা	১.১২
ঘুমানো	০.১১
ভ্রমণ করা	০.৩৪
পরিবারের/নিকটাত্মীয়ের সাথে সময় কাটানো	০.২২
ধর্মীয় আচার	১.২৩
সামাজিক আচারানুষ্ঠান করা	০.৪৫
অন্যান্য	০.১১

ঢাকাস্থ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী তাদের অবসর সময় কীভাবে অতিবাহিত করতে পছন্দ করেন তা পর্যালোচনা করে জানা যায়, অধিকাংশ বৌদ্ধগণ তাদের অবসর সময় টেলিভিশন দেখে অতিবাহিত করতে পছন্দ করেন যা শতকরা প্রায় ৯৩.৭৪ শতাংশ। তাছাড়া বই পড়ে অবসর সময় কাটান শতকরা ১.৩৪ শতাংশ, খেলাধুলা করে অবসর সময় কাটান শতকরা ০.৬৭ শতাংশ, গল্প করে সময় কাটান শতকরা ০.৬৭ শতাংশ। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে অবসর পার করেন শতকরা ১.১২ শতাংশ, অবসরে ঘুমাতে পছন্দ করেন ০.১১ শতাংশ। অবসরে ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন শতকরা ০.৩৪ শতাংশ, পরিবার/নিকটাত্মীয়ের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করেন ০.২২ শতাংশ, ধর্মীয় আচারে সময় কাটাতে পছন্দ করেন ১.২৩ শতাংশ এবং সামাজিক আচারানুষ্ঠান করে অবসর সময় কাটান শতকরা ০.৪৫ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে অবসর সময় পার করেন শতকরা ০.১১ শতাংশ বৌদ্ধ।

কে.আই.আই থেকে জানা যায়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাঝে অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখার কাজটি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৌদ্ধ শিক্ষার্থী মনে করেন,

ঢাকার বৌদ্ধদের নিজেদের কালচারাল এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করা হয়ে ওঠে না সবসময়। আর ঢাকার বাইরের বৌদ্ধদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে লড়াই করে চলতে হয়। ((IFS-2)

সারণি-৫.২৮ অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে সম্পর্ক

অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে সম্পর্ক	শতাংশ
বন্ধুত্বপূর্ণ	৯৯.৩৩
নিষ্ক্রিয়	০.৬৭

ঢাকাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে সম্পর্ক কেমন তা পর্যালোচনা করে দেখতে পাই, শতকরা প্রায় ৯৯.৩৩ শতাংশ ক্ষেত্রে তা বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ০.৬৭ শতাংশ ক্ষেত্রে তা নিষ্ক্রিয়।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে ঢাকাস্থ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে সম্পর্ক নিয়ে জানা যায়। কদমতলা, বাসাবোতে বসবাসরত ২১ বছর বয়সী একজন পুরুষ শিক্ষার্থী মনে করেন ঢাকায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্ক ভালো। ধর্ম নিয়ে এখানে তাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর মতে অন্যান্য এলাকার বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকলেও নিজ এলাকায় ধর্মীয় আচরানাদি পালনে তিনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন নি, এক্ষেত্রে প্রশাসনের দিক হতেও সুবিধা দেয়া হয় তবে ফানুস উড়ানোর ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করা হয় বিশেষ কারণবশত। তিনি মনে করেন ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈষম্য নির্ভর করে সকল মানুষের উপর। সকলের বোধশক্তি একই হওয়া আর কোনটা করলে অন্যজন কষ্ট পাবে সেটা উপলব্ধির বিষয়ে। এজন্য ধর্মবাণীর প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন তিনি সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি বিশ্বাস রাখেন কেননা সকল ধর্মেই মানব জগতের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। (IMS-1)

একজন নারী মনে করেন বৌদ্ধরা সমাজে সবার সাথে মিলেমিশে চলতে ভালোবাসে। সম্প্রদায়ের সাথে তাদের আন্তরিকতা সৌভ্রাত্বের বন্ধন আছে। বৌদ্ধরাও অন্যদের মতো সামাজিক জীব। অন্য সমাজবদ্ধ মানুষের যে অসুবিধা বা বাঁধা ঠিক তেমনি বৌদ্ধদের ঠিক একই বাঁধা সাধারণত। ঢাকায় বৌদ্ধদের আলাদা কোন কমিউনিটি বা সমাজ গড়ে তোলে নাই যে আলাদা কোন বাঁধার সম্মুখীন হবে। সামাজিক অনুশাসন, সামাজিক দায়বদ্ধতা বৌদ্ধরা মেনে চলে। তবে, বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশে, যা বৌদ্ধ প্রতিরূপ অঞ্চলে বৌদ্ধদের সামাজিক রীতি-নীতি, চলাফেরা, খাদ্যাভাসগুলো পালন করা হয়তো বেশি সহজ যা ঢাকায় অত স্বাধীনভাবে করা যায়না বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অনায়াসে চলাফেরা বা রীতিনীতি পালন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে। তিনি বলেন প্রত্যেক ধর্মকেই শ্রদ্ধা করা উচিত। প্রত্যেক ধর্মের মূল্যবোধের প্রতি আস্থাশীলতা আমাদের সম্প্রীতিকে মজবুত করে। তিনি জানান অন্য ধর্মের মর্মবাণীগুলো নিজে লালন করে উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি প্রত্যেক ধর্মীয় উৎসবে সামিল হন এবং তাতে কোন বাঁধার সম্মুখীন তিনি হননি। তিনি নিজে তার ধর্ম পালনের পাশাপাশি

অন্যান্য ধর্মের উৎসবে যোগ দেন, শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রত্যেক ধর্মের গরীব দুঃস্থদের উৎসবে দান করেন। মসজিদ, মন্দির নির্মাণে সাধ্যমতো দান-দক্ষিণা দেখাতে চেষ্টা করেন এবং এভাবেই একে অপরের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ আমাদের সম্প্রীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্পর্ক অবশ্যই বন্ধুত্বসুলভ এবং বিশ্বাসযোগ্য। তবে সামাজিক বাঁধাগুলো আসে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে, বলাবাহুল্য যে খাদ্যাভাস থেকে শুরু করে অনেকগুলোর বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। কেউ বলেন তিনি তার নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী তাই মনে করেন সকলে যার যার ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী। তাই অন্য ধর্মের প্রতিও বিশ্বাস রাখেন। এক্ষেত্রে সকল ধর্মের প্রতি সম্মান রাখা এবং ধর্মের সাথে ধর্মের তুলনা না করা এভাবেই বৈষম্য দূর করা সম্ভব। কেউ কেউ বলেন যে তারা সবার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এমনকি গরুর মাংসসহ সকল মাংস খান। (IFT-1)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী বলেন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণ। অপর একজন উত্তরদাতা জানান অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও খুব ভালো সম্পর্ক রাখেন। তিনি জানান অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও অনেকে খুব বিনয়ী। অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর বিশ্বাস কেমন এমন প্রশ্নের উত্তরে একজন উত্তরদাতা জানান, বিশ্বাস নয়, আস্থা রাখেন। বিশ্বাস বলে কোন কিছু করেন না। কোন নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কাউকে নির্ভর করার নামই আস্থা। (IMS-4)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৌদ্ধ শিক্ষার্থী জানান, যেহেতু এদেশে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটে তাই অন্য ধর্মের প্রতি এতটা বিশ্বাস তিনি অর্জন করতে পারেননি। (IMS-5) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের একজন বৌদ্ধ শিক্ষার্থী জানান যে তার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার পরও তাদের সাথে তার সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। (IFS-3) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের বৌদ্ধ শিক্ষার্থী জানান তিনি সকল ধর্মের বন্ধুদের সাথেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন। সবার সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। (IMS-5)

সারণি-৫.২৯ কোন বিহারে যান

কোন বিহারে যান	শতাংশ
বাংলাবাজার বৌদ্ধ বিহার	৯.৩৪
শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার	১২.০০
আশুলিয়া বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র	১.৩৪
বাংলাদেশ মহাবিহার, উত্তরা	২.০০
ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, বাসাবো	৩২.৬৭
আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, মেরুল বাড্ডা	৩৫.৩৫
নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার	১.৩৩
প্রজ্ঞানন্দা বৌদ্ধ বিহার, নদ্দা	৬.০০

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ কোন বিহারে যাতায়াত করেন তাদের ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালনে সে সম্পর্কে জানা যায়, এখানকার অধিকাংশ মানুষ মূলত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার যা মেরুল বাড্ডায় অবস্থিত এবং ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, যা বাসাবোতে অবস্থিত এ দুটি বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াত করেন। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে যান শতকরা প্রায় ৩৫.৩৫ শতাংশ বৌদ্ধ এবং ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াত করেন শতকরা প্রায় ৩২.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধ। এছাড়া অন্যান্য যে সকল বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধরা যাতায়াত করেন তার নাম ও শতকরা হার যথাক্রমে, বাংলাবাজার বৌদ্ধ বিহার ৯.৩৪ শতাংশ, শাক্যমুণি বৌদ্ধবিহার ১২.০০ শতাংশ, আশুলিয়া বৌধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র ১.৩৪ শতাংশ, বাংলাদেশ মহাবিহার উত্তরা ২.০০ শতাংশ, নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার ১.৩৩ শতাংশ এবং প্রজ্ঞানন্দা বৌদ্ধ বিহার, নদ্দা ৬.০০ শতাংশ।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে জানা যায়, ঢাকায় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ যারা থাকেন তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করতে বাহিরের বৌদ্ধদের তুলনায় বেশি সমস্যা পোহাতে হয়। কারণ এখানে বিহার পর্যাপ্ত নেই তাছাড়া যেগুলো আছে সেগুলো অনেক দূরে। সেখানে যাওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ। এছাড়া আরও জানা যায় যে, তাদের বিহার পর্যাপ্ত নেই ও দূরে থাকার কারণে উপোসথ পালন করা বা উপসম্পাদা গ্রহণ করা হয়ে উঠে না। (IFHW-3)

ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারে একজন বলেন তিনি প্রায় ৩৫ বছর ঢাকাতে থাকেন এবং তার পরিবার থাকেন চট্টগ্রামে। ৩৫ বছর আগে ঢাকাতে বৌদ্ধরা খুব কম বসবাস করত। তখন রাস্তাঘাট চিনতে খুব কষ্ট হত। মন্দির ছিল ২-১টা। আস্তে আস্তে সংখ্যাটা বাড়তে থাকে। (IMB-1)

একজন গৃহিণী বলেন ঢাকার মন্দিরে প্রার্থনা করতে যাওয়া ঝামেলা, কোন অনুষ্ঠান থাকলে যাওয়া হয়। গ্রামের বিহারে যেতে কোন প্রস্তুতি লাগে না, ঢাকার মন্দিরে যেতে প্রস্তুতি লাগে , ঢাকার মন্দিরে যেতে হলে জামা কাপড় পরিবর্তন করাটা কষ্টদায়ক। বাসা ও বাচ্চা সামলিয়ে প্রাত্যাহিক প্রার্থনাটা ঢাকার গৃহিণীদের পালন করা হয় না। কিন্তু গ্রামের সবাই যেকোন সময় এমনকি সন্ধ্যায় প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন। (IFHW-1)

বাসাবোতে বসবাসকারী একজন উত্তরদাতা জানান তিনি ৪২ বছর যাবত ঢাকায় বসবাস করেন। ঢাকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ৫০% পরিচিত না। গ্রামে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে কটাক্ষ করত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে। এসব পরিবর্তন করেছেন বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, শুদ্ধানন্দ মহাথের ও ধর্মসেন মহাথের। কেউ কেউ বলেন বিহার অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। তাছাড়া বুদ্ধ পূর্ণিমা ছাড়া কোন ছুটি পাওয়া যায়না। অনেকক্ষেত্রে বিহারে যাওয়ার মতো ইচ্ছুক সঙ্গী পাওয়া যায়না।

সারণি-৫.৩০ ধর্মীয় কারণে কখনও বিরূপ পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছেন কিনা

ধর্মীয় কারনে কখনও বিরূপ পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছেন কিনা	শতাংশ
হ্যাঁ	০.৬৭
না	৯৯.৩৩

এদিকে ঢাকায় বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কারনে কখনও কোন বিরূপ পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয়েছেন কিনা এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে দেখতে পাই, শতকরা প্রায় ৯৯.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ যারা ঢাকায় বসবাস করেন তারা কোনরূপ ধর্মীয় সহিংসতার স্বীকার হননি। অপরদিকে শতকরা প্রায় ০.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধ এক্ষেত্রে জানিয়েছেন যে তারা বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সহিংসতার স্বীকার হয়েছেন।

এক্ষেত্রে কে.আই.আই এর মাধ্যমে ধর্মীয় বিরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। সেখানে অনেকে মতামত দেন, বাংলাদেশ অসম্প্রদায়িক দেশ, এখানে বৌদ্ধদের ধর্মীয় আচারণাদি পালনে কোন বাঁধা নেই। তবে পারস্পরিক সহযোগিতা অন্য ধর্মাবলম্বীদের করতে হয়। যেমন: আযানের সময় বা নামাজের সময় কোনো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীয় উৎসব চললে তা বন্ধ রাখতে হয়, যাতে নামাজে বা অন্যদের ধর্মপালনে ব্যাঘাত না ঘটে। এটা বাঁধা নয় পারস্পরিক সহযোগিতা। সব ধর্মীয় উৎসবে সকল ধর্মের মানুষের সাথে পালন করতে বৌদ্ধরা সৌভ্রাত্বের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে। বৌদ্ধ বিহার বা মন্দির গুলোতে সকল ধর্মের মানুষ পবিত্রভাবে যেতে কোন বাঁধা নেই। তবে মন্দির, মূর্তি ভাংচুর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্যাতন কিছু বিচ্ছন্ন ঘটনা ঘটে। থাকলেও সেটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অংশবিশেষ, তাতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বা রাষ্ট্রের কোন হাত নেই। এটা সকলে মিলে কঠোর হাতে দমন করতে সবাই সহযোগিতা করে। আরও বলেন, দেশে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে হলে যে যার ধর্মে বিশ্বাসীতে হতেই হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের চেতনাকে বিকশিত করে। তবে কিছু কুসংস্কার, গোড়াঁমী, ধর্মান্ধতা বৈষ্যমের সৃষ্টি করে। সেটা কমাতে হলে প্রত্যেককে নিজ ধর্মের মর্মবাণী জানতে হবে, বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। সাথে সাথে অন্য ধর্ম বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সকল ধর্মেই মানুষের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। পারস্পরিক সহানুভূতি, মানবিকতার কথা বলা হয়েছে। তাই বৈষম্যে কমাতে হলে প্রত্যেককে নিজ ধর্ম ছাড়াও অন্য ধর্মকেও জানতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস এর উপর বৈষম্য তখনই কমবে যখন সকল মানুষ

মনে করবে মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম। কেউ কেউ বলেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার চ্যালেঞ্জ আমাদের নিজেদের তৈরী করা। (IFHW-1)

লেখচিত্র-৫.৩০ ধর্মীয় কারণে কখনও বিরূপ পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছেন কিনা

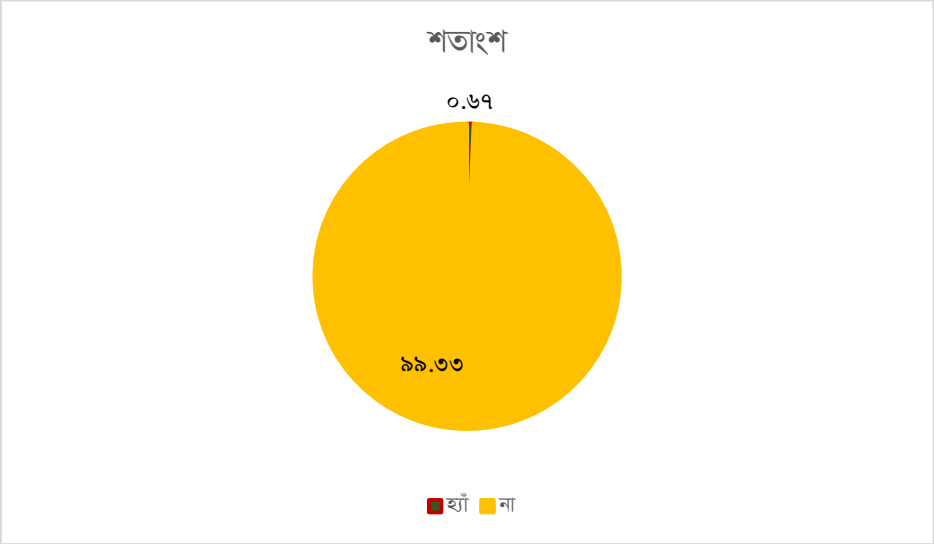

কে.আই.আই থেকে জানা যায়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাঝে কেউ কেউ মনে করেন সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে টিকে থাকাই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ এবং সব দেশেই এটা অভিন্ন সমস্যা। তবে ব্যক্তিগত ভাবে কখনও তারা সমস্যার স্বীকার হননি। তারা বলেন ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রধান অন্তরায় ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ও মৌলবাদ এবং এ দেশে এটা দূর করার চিন্তা অবাস্তব। এক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর বিশ্বাস এটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, সকলের উপর বিশ্বাস এর মাত্রা সমান নয়। তবে কাজের জায়গায় কখনও কখনও তারা বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানান। (IMS-2)

অনেকে এক্ষেত্রে বলেন, ধর্মীয় আচারাণাদি পালনে বাঁধা আসে সেটা অনেকটাই ঠিক তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োজিত থাকে বিধায় তেমন বাঁধা বা দুর্ঘটনা লক্ষ্য করা যায় না যেমনঃ রামু বিহারে হামলা। এক্ষেত্রে তারা বলেন ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর বৈষম্য কমানোর জন্য সরকারের পদক্ষেপ নিতে হবে। নানা ধরনের সেমিনার, র‍্যালি করতে হবে যাতে করে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা স্থাপন করতে পারে। তারা মনে করেন অন্যান্য ধর্মের অশোভন আচরন এবং অযৌক্তিকতার কারনে বিশ্বাসটুকু হারিয়ে যায়। যার ধর্ম সে পালন করুক কেউ যাতে অন্য ধর্মকে ছোট করে না দেখে ধর্মীয় প্রতিযোগীতায় না নেমে এতে করে হিংসা কমবে না বরং বাড়বে। অন্য ধর্মের সম্মান রেখে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রেখে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর উপর আস্থা স্থাপনের কথা বলেন তারা। (IMS-3)

একজন নারী বলেন বৌদ্ধদের প্রধান চ্যালেঞ্জ তারা সংখ্যালঘু। হাতে শাখা, সিঁদুর পরিহিত থাকলে অনেকে হিন্দুভাবে। তখন মার্কেটে বা বাসে গেলে দিদি, বৌদি ডাকে। এমনও হয়েছে যে মার্কেটিং যাওয়ার আগে শাখা খুলে সিঁদুর মুছে যেতে হয়েছে। এছাড়া আযানের সময় বিহারের প্রোগ্রামের মাইক বন্ধ করে দিতে হয়, এটা কষ্টদায়ক। মুসলিমদের বাসা ভাড়া নিতে গেলে, প্রথমত বলা হয়, মোমবাতি, আগরবাতি সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ। হিন্দুদের ঘন্টা, শঙ্খ বাজাতে নিষেধ করা হয়। শুটকি খায় নাকি? জিজ্ঞেস করা হয়। বাসার মুসলিম বুয়ার সামনে শূকরের মাংস লুকিয়ে রাখতে হয়। স্কুলে নামাজের সময় বৌদ্ধ বাচ্চাদের অনেক সময় মাথায় টুপি পড়ার নির্দেশ দেয়া হয় নামাজ পড়তে বলা হয়। চাকুরীস্থলে ও স্কুলে বড়ুয়া নামে ডাকা হয়, পুরো নামে ডাকা হয় না, এটাও আক্ষেপের বিষয়। তারা আরও বলেন ভান্তেদের দাওয়াত দেয়া হলে তাঁরা যখন আসেন অলিতে গলিতে ভান্তেদের দেখলে হাসাহাসি করা হয় এবং তাদের চুল কেন ফেলে দেয়া হয়। তারা মনে করেন এক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, পারিবারিক সুশিক্ষা, ছোট-বড় ভেদাভেদ বন্ধ রাখতে হবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলিমরা আসতে চায় না। অনেক মুসলিম বাচ্চারা বাসায় এসে প্রার্থনারত অবস্থায় দেখলে তারা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তারা বলেন ঢাকা বৌদ্ধ গৃহিণীদের কাজ বা চাকুরীর একটা প্লাটফর্ম প্রয়োজন। (IFHW-2)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী বলেন, তাদের নিজদের খাবার, ভাষা এবং পোশাক পরিধানে বিভিন্ন অপ্রীতিকর মন্তব্য এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তবে সরাসরি কোন বাঁধার সম্মুখীন এখনও হননি। এদিকে অপর একজন উত্তরদাতা আক্ষেপ নিয়ে জানান নিজস্ব জাতিগত পোশাক পড়তে ইতস্তত লাগে, কে কী বলবে এই ভেবে বছরে কেবল মার্মা ছাত্রদের বড়সড় সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় সাংস্কৃতিক কাপড় পরিধান করেন। আর ভাষাগত একটা ব্যাপার আছে। নিজের মাতৃভাষা চর্চা কম করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের একজন শিক্ষার্থীও জানান তিনিও ধর্মীয় কারণে নানান সময় বিরূপ পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ে কম আলোচনা করার চেষ্টা করেন এবং অসহিষ্ণুদের এড়িয়ে চলেন। তিনি বলেন আমাদের উচিৎ সকল ধর্মের জ্ঞান রাখা এবং সহিষ্ণু হওয়া। (IMS-1)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েল একজন বৌদ্ধ শিক্ষার্থী বলেন, বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে তিনি যতটুকু পারেন ধর্মের সংবেদনশীল কথাগুলো বলা থেকে বিরত থাকেন এবং ধর্ম প্রসংগ আসলে ধর্মের ভালো দিকগুলো আলোচনা করেন। তিনি বলেন বৌদ্ধ ধর্মীয় অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান প্রবারণা পূর্ণিমায় যে ফানুস উত্তোলন করা হয় তা বিভিন্ন শহরে নিরাপত্তার কারনে তা উত্তোলন করতে দেয়া হয়না। কিন্তু ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মন্দিরে দেয়া হয় সেখানকার ধর্মীয় গুরুদের বিশেষ প্রভাবের কারনে। (IMS-4) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের একজন শিক্ষার্থী বলেন, বৌদ্ধ শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি কলেজে থাকা অবস্থায় বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন। তার বন্ধু তাকে বলেছিল ইসলাম ধর্মই ভালো। অনেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেখলে হেও করে আবার অনেকে মর্যাদা দেন। (IMS-3)

সারণি-৫.৩১ ধর্মীয় উস্কানির কারণে নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটেছে কিনা

ধর্মীয় উস্কানির কারনে নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটেছে কিনা	শতাংশ
হ্যাঁ	২.৬৭
না	৯৭.৩৩

ধর্মীয় নানাবিধ উস্কানির কারণে কখনো তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে কিনা ? এক্ষেত্রে, শতকরা প্রায় ৯৭.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ মনে করেন ধর্মীয় উস্কানির কারণে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। আপরদিকে শতকরা ২.৬৭ শতাংশ বৌদ্ধ মনে করেন ধর্মীয় উস্কানিতে বিভিন্ন সময় তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে ধর্মীয় উস্কানির কারনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটেছে কিনা সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে একজন উত্তরদাতা জানান, তিনি এমন কোন বাঁধার সম্মুখীন হননি। এক্ষেত্রে বাঁধা আসলে তিনি প্রতিবাদ করতেন বলে জানান কেননা আমাদের সংবিধানের চারটি মূলনীতির মধ্যে একটি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৌদ্ধ শিক্ষার্থী জানান, হয়ত ভালো কোন প্রতিষ্ঠানে আছেন তাই এ ধরণের আচরনের স্বীকার হননি। অনেকে সামাজিক সম্প্রীতি রোধের কারণ হিসেবে রামুর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। (IMS-4)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের একজন বৌদ্ধ শিক্ষার্থী বলেন, আমরা যেমন নিজ ধর্মকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি তেমনি আমাদের উচিত অন্য ধর্মের প্রতিও সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রাখা। প্রত্যেক মানুষ তার নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রাখে এই চেতনা যদি আমরা ধারণ করি তবে ধর্মীয় বৈষম্য অনেকখানি কমে যাবে। তিনি বলেন, তিনি সর্বদা অন্য ধর্মাবলম্বীদের শ্রদ্ধা করেন। আমাদের সবার উচিত মানুষকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিচার না করা এতে ধর্ম নিয়ে হানাহানি ও হিংসাত্বক মূলক কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে। (IFS-3)

সারণি-৫.৩২ উস্কানির কারনে নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটে থাকলে তা কাটিয়েছেন কীভাবে

উস্কানির কারনে নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটে থাকলে তা কাটিয়েছেন কীভাবে	শতাংশ
২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রামু ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সমাধান	০.৬৭
চলমান	০.৬৭
স্থানীয় সরকার	০.৬৭
সামাজিক প্রতিরোধ	০.৬৭
প্রযোজ্য নয়	৯৭.৩৩

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাদের বিভিন্ন সময় নানা রকম উস্কানির কারনে নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটেছে তাদের কাছে জানতে চেয়েছি, তারা সে সময় কীভাবে সে সময়কালীন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান

করেছিলেন। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখতে পাই, এদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয়েছে শতকরা ০.৬৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে তারা ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরে ঘটে যাওয়া রামু ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া স্থানীয় সরকারের হস্তক্ষেপে সমাধান হয়েছে শতকরা ০.৬৭ শতাংশ। সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমে সমাধান হয়েছে শতকরা ০.৬৭ শতাংশ। এদের মধ্যে এখনও চলমান আছে ০.৬৭ শতাংশ। তাছাড়া শতকরা ৯৭.৩৩ শতাংশ বৌদ্ধ যারা ঢাকায় বসবাস করে তারা এরূপ সমস্যার মুখোমুখি হননি।

কে.আই.আই এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক বৌদ্ধ দাবি জানান ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে যেসব হামলা চালানো হয়েছে তার প্রত্যেকটির সুষ্ঠু তদন্ত করে তা বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। সেই সাথে সম্প্রীতি বাড়াতে সরকারকেই আরও বেশি পদক্ষেপ নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৌদ্ধ ছাত্রী (রোকেয়া হল) শিক্ষার্থী জানান ধর্মীয় আচরণাদি পালনে তাদের বেশি বাঁধার সম্মুখীন হতে হতো যদি না বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর হতো। এতোটা তৎপরতার পরও ভিন্ন ধর্মীয়দের অনুষ্ঠানে অনেক সময় হামলার খবর পাওয়া যায়। (IFS-3)

সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা

ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধদের নানান অনুভূতি ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা চিত্র অনুধাবনের জন্য কে.আই.আই এর মাধ্যমে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে নানান প্রশ্নের উত্তর জানা যায়। সে সকল উত্তরমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ঢাকায় বসবাসের অনুভূতি

কদমতলা, বাসাবোতে বসবাসরত ২১ বছর বয়সী একজন পুরুষ শিক্ষার্থী মনে করেন তুলনার দিক থেকে চট্টগ্রামে যেমন একটা স্বাধীনতার অনুভূতি হয় ঢাকায় তেমন অনুভূতি হয় না, ঢাকাতে প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়া গেলেও, বৌদ্ধধর্মের অনেক নিয়ম রয়েছে, যেগুলো নগর অঞ্চলে পালন করা কঠিন। যেমন: ধ্যান বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার জন্য নিরিবিলি পরিবেশের দরকার হয়। যা ঢাকা শহরের মতো ব্যস্তময় শহর এবং পরিবেশ না থাকার কারণে সম্ভব হয় না। (IMS-1)

একজন শিক্ষার্থী বলেন, রাস্তায় চলাকালে পাহাড়ি দেখলে মানুষ তাঁদের বৌদ্ধ মনে করে এবং রোহিংগা ইস্যুকে ব্যবহার করে উষ্কানিমূলক কথা বলে। এ ধরনের আচরণের বেশি স্বীকার হয় যখন রোহিংগা প্রসঙ্গ বেশি চলমান থাকে। ঢাকার সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলেন, সব জায়গায় বিহার না থাকার কারণে বেশি সংখ্যক লোক ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর নিজ সম্প্রদায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা হ্রাস পাচ্ছে। ঢাকায় বসবাসের সামাজিক বাঁধাগুলি নিয়ে তিনি বলেন, বাংলা ভাষার উচ্চারণ সঠিকভাবে বলতে না পারা, বৈষম্য দেখা যায় মার্কেটে গেলে। (IMS-3)

একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বলেন: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আনুমানিক দশ সহস্রাধিক আদিবাসী বৌদ্ধ অবস্থান করেন। তারা অধিকাংশ নানা অধিকাংশই সরকারী বেসরকারী গার্মেন্টস ও এনজিও সেক্টরে কাজ করেন। বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজটিকে কেন্দ্র করে কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর উদ্দেশ্যে শ'দুয়েক আদিবাসী বৌদ্ধ পরিবার অবস্থান করেন। ঢাকা শহরের আদিবাসী বৌদ্ধদের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা এবং তাদের নিজস্ব ঘর-বাড়ি নেই, ভাড়া থাকতে হয় ৯৯%। সাধারন মানের ঘর-বাড়ি ১৫-২০ হাজার ঢাকা। অতএব উপাজর্নের সিংহভাগ ঘর ভাড়ায় ব্যয় হলে সংসার, প্রজন্মের শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ করা কষ্টের হয়ে যায়। (IMM-1)

কোটা ব্যবস্থা

কোটা ব্যবস্থা নিয়ে নানারূপ মন্তব্য জানতে পারি গবেষণা করতে গিয়ে। কোটা প্রথার কথা উল্লেখ করে তারা বলেছেন তারা কোটা প্রথাকে সমর্থন করেন। তবে তাদের মতে কোয়ালিটি অফ ল এন্ড রাইটস থাকলে কোটা প্রথার দরকার হয়না। অনেকে আক্ষেপ নিয়ে জানান বাঙালি বৌদ্ধদের কোন ক্ষেত্রেই কোটা নেই। শিক্ষা, চাকুরি সবক্ষেত্রেই তারা অন্য সবার মতো প্রতিযোগিতা করেই নিজের যোগ্যতায় উর্ত্তীণ হয়। বৌদ্ধরা কোন আদিবাসী নয়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে কিছু মারমা, চাকমা সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আছে। তাদেও আদিবাসী কোটা আছে কেনো কোনো ক্ষেত্রে। তাদের সাথে বাঙালি বৌদ্ধদের কোন সামাজিক-সংস্কৃতিকগত মিল নেই। কোন সামাজিক যেমন-বিবাহ, এরকম কোন বন্ধনও নেই। (IMS-3)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বৌদ্ধ আদিবাসী শিক্ষার্থী মনে করেন, যখন কোন একটা জাতি পিছিয়ে পরে তবে তার ক্ষেত্রে কোটার প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন বৌদ্ধদের বৃহৎ অংশ পড়াশুনা করে পার্বত্য অঞ্চলে যা কিনা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পিছিয়ে পরা। এক্ষেত্রে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেটে পড়াশুনা করা পাহাড়ের ছেলে-মেয়েদের তুলনা করলে ঠিক হবেনা। তিনি বলেন পড়াশুনার ক্ষেত্রে পাহাড়ের ছেলে-মেয়েরা বই কম পায়। কিছু কারণে কোটা রাখা যুক্তিযুক্ত। যেমন: সুবিধাবঞ্চিত বৌদ্ধ ছেলে-মেয়েদের জন্য কোটা প্রথা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন কোটা রাখার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য আলাদা বৌদ্ধ সংগঠন দরকার, যা গরিব বৌদ্ধ ছেলে-মেয়েদের ভালো গাইড-লাইন দিবে। টেন মিনিট স্কুলের মতো একটি স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্মের কথা বলেন তারা। বলেন, কোটা আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে তাই নিজেদেরই যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। অনেকে কোটা ব্যবস্থা বৌদ্ধদের জন্য আছে কিনা তাও জানেননা বলে জানান। (IMS-5)

আদিবাসীদের যে কোটা সিস্টেম ছিল তা তুলে দেয়া কিছুটা যৌক্তিক মনে করেন না। কারন যারা এখনো তাঁদের ৫% কোটা পূরণ করতে পারেনা সেখান থেকেই বোঝা যায় তাঁরা মূল শ্রেণির জনগোষ্ঠির সাথে প্রতিযোগিতায় কতটা প্রস্তুত। বৌদ্ধদের কোটা ব্যবস্থার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মালম্বীরা আদিবাসী যারা পাবর্ত্য জেলার অনেক দূর্গম অঞ্চলে বাস করে। আর সেখানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এখনো তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন হয়নি। তাই সেসব পিছিয়ে পরা মানুষকে সুযোগ প্রদান হেতু কোটা বহাল রাখা জরুরি। (IFS-1)

ঢাকা শহরের এক বিহারের আবাসিক ভিক্ষু বলেন: যদিও পাকিস্তান আমলে বৌদ্ধদের জন্য কোটা ব্যবস্থা ছিলো কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই কোটা ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। তিনি মনে করেন বর্তমানে কোটা ব্যবস্থা রাখা ভালো। (IMM-1)

ভিক্ষুদের প্রতি আচরণ

কে.আই.আই এর মাধ্যমে ভিক্ষুদের প্রতি অন্যান্যদের আচরণ সম্পর্কে জানা যায়। সেখানে জানতে পাই, ঢাকাতে প্রায় ৪৫ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু রয়েছেন। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ জগত সম্পর্কে তেমন ধারণা থাকে না। রাস্তায় বের হলে অলৌকিক আজব প্রাণির মত করে দেখতে থাকে । অনেক সময় দেখার জন্য দৌঁড়ে চলে আসে । আবার অনেকে জিজ্ঞেস করে আপনারা কি এবং কি করেন? গাড়ি ষ্টেশন, ট্রেন ষ্টেশন দাঁড়ালে দেখতে ঘিরে ধরে গোল হয়ে যায়। আপনাদেরকে কি বলে এভাবে নানা প্রশ্ন করে। (IMM-2)

সৎকার বা সমাহিত করার ব্যবস্থা

ঢাকা শহরে কোনো বৌদ্ধ মারা গেলে তাকে সমাহিত করার কোনো সরকারী ব্যবস্থাপনা নেই। কিন্তু সাভারের আশুলিয়াতে বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কিছু সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। তবে ঢাকা শহরের অধিকাংশ বৌদ্ধরা মারা গেলে তাদের মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে যেতে হয়। এদিকে সব থেকে সমস্যা হয় বিদেশি বৌদ্ধ মৃত্যু হলে। উল্লেখ্য যে, রাজারবাগ শশ্মানে অনুমোদন থাকলেও তেমন সুযোগ-সুবিধা বৌদ্ধরা ভোগ করতে পারে । (IMM-3)

ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী খোঁজা

বৌদ্ধদের বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী খোঁজা দিন দিন কঠিনরূপ ধারণ করছে। ঢাকা শহরে বৌদ্ধদের অবস্থান কম হওয়াতে এককজনের বাসস্থান একটি চেয়ে একটু দূরে হওয়ার অনেকটা কঠিন অবস্থা হয় পাত্র-পাত্রী খুঁজে পেতে। তবে আত্মীয় স্বজনের আসা-যাওয়া ও যোগাযোগ থাকে অনেকজনের কাছে তাতেও কিছুটা পাত্র-পাত্র খুঁজতে অসুবিধা হয় না। একই সাথে আরো উপায়ের মাধ্যমে পাত্র-পাত্র খুঁজতে সুবিধা হয় সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্পাদনের মাধ্যমে অবিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক তৈরি সুযোগ ঘটে, তাছাড়াও বিহারে বিভিন্ন বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও বৌদ্ধদের সন্তানের জন্য পাত্র-পাত্রীর দেখার সংযোগ তৈরি হয়। (IMM-3)

ঢাকা শহরে উপাসনালয়ের নিরাপত্তা

বর্তমানে সময়ে ঢাকা শহরে বৌদ্ধ উপাসনালয় ও বিহারগুলো নিরাপত্তা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। উগ্র ও কিছু জঙ্গী তৎপরতার কারনে ঢাকা শহরে বৌদ্ধ উপাসনা অনেকটা নিরাপত্তা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্বাধীনভাবে চলাচল ও ধর্মীয় কর্মসম্পাদনে কিছু ব্যাঘাত ঘটে। কারণ বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারনে ধর্মীয় গাম্ভীর্যতা অনেক সংরক্ষণ যথাযথ হয় না। মাঝে

মধ্যে ধর্মীয় উস্কানী, অসেচতনতার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়, তাই বৌদ্ধদের বিহার বা উপাসনাগুলো নিরাপত্তা দিতে হচ্ছে। (IMM-3)

বৌদ্ধদের ঢাকা শহরে ধর্মান্তর হওয়া

ইদানিং সময়ে ধর্মান্তর বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুবই স্বল্প সংখ্যক বৌদ্ধ বসবাস। ঢাকা বৌদ্ধদের বসবাসগুলো একতাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে; তারই ফলশ্রুতি বৌদ্ধদের সন্তানগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্তানদের সাথে উঠা-বসা, চলাফেরা কারণে সম্পর্ক তৈরি হয়, তাতে ধর্মান্তরিত হতে দেখা যায়। একইসাথে বলা যায় পারিবারিক ধর্মীয় সচেতনতার অভাব দেখার কারণেও ধর্মান্তরিত হয়। উঠতি বয়সী নারী-পুরুষের স্কুল-কলেজে পড়া ও ধর্মীয় পাঠদানের অভাবে কারণেও ধর্মান্তরিত হয় । (IMM-3)

ঢাকা শহরে বৌদ্ধ সংগীত-শিল্পচর্চা

ঢাকা শহরে বৌদ্ধ সংগীতের শিল্পচর্চা অনেকটা দূরূহ ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা শহরের অবস্থানরত বৌদ্ধগণ সাধারণ সংগীত চর্চা অনুশীলন করতে উৎসাহিত হয়, তাতে ধর্মীয় সংগীতের চর্চা তেমন হয় না। তাই ঢাকা শহরের বৌদ্ধ সংগীত শিল্প চর্চা তেমন বেশি দেখা য়ায় না। তবে ঢাকার বিহার গুলোতে বিশেষ উৎসবে বৌদ্ধ কীর্তনের আয়োজন দেখা যায়। (IMM-3) বৌদ্ধ কীর্তন হলো বুদ্ধের যশোকথা এবং বিভিন্ন রকম গুণাদি কিংবা মহিমার বর্হিপ্রকাশকে বুঝায়। বৌদ্ধ কীর্তন হলো তিন প্রকার: নামকীর্তন, পালা কীর্তন এবং পাল্টাকীর্তন। (তথ্যসূত্র: নীরু বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি: কীর্তন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, পৃ. ৮৩)

ঢাকা শহরের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙ্গালি বৌদ্ধদের মধ্যে সম্পর্ক

ঢাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙ্গালিদের বৌদ্ধদের সর্ম্পক প্রক্রিয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় চর্চার দিক দিয়ে নৃগোষ্ঠী বৌদ্ধদের কোনো বাঁধা হয় না। কিন্তু নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে স্বীয় গোত্র ও জাতির অভ্যন্তরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করলে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। বিয়ে, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো মুলত বাঙ্গালি বৌদ্ধদের সাথে মিল থাকে না। তাই সম্পর্ক এতো বেশি শক্তিশালী হয় না। নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী মনে করে স্বজাত্য ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বেশি প্রাধান্য থাকে, তেমনিভাবে দেখা বাঙ্গালি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে তেমনই দেখা যায়। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সম্পাদনের ক্ষেত্রে যৌথ মেলনবন্ধন দেখা যায়। তবে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং প্রথার দিক দিয়ে কিছু ভিন্ন আছে।

তবে সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে বাঁধা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়। তবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে মেলবন্ধন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমূহ পরিলক্ষিত হয়। (IMM-3)

ঢাকায় অবস্থিত বৌদ্ধদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বসবাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সামষ্টিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা যায়। চট্টগ্রামের স্থানীয় বৌদ্ধরা যেভাবে নিজের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও নিয়ম মেনে নিরিবিলি পরিবেশে ধর্মপালন স্বাধীনভাবে করতে পারে, ব্যস্ত শহরে সেই সুবিধা ও সুযোগ কম। জনবহুল শহরে সংখ্যায় কম হওয়ায় বৌদ্ধরা সংঘবদ্ধ হতে পারে না। ব্যস্ত শহরের সংস্কৃতি, ভাষা ও ব্যয়বহুলতার সাথে টিকে থাকা এই বৌদ্ধদের জন্য চ্যালেঞ্জ। বৌদ্ধ শিক্ষার ঘাটতি, আর্থ-সামাজিক সংকট, প্রতারণার শিকার, সাধারণ মানুষের সাথে সংস্কৃতির মিশ্রণ ও ধর্ম শিক্ষার অভাবে স্বকীয়তা লোপ পাওয়া ইত্যাদি কারণে বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার সংখ্যাও কম নয়। উচ্চ শিক্ষা ও কিছু চাকরিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (উপজাতি)-দের জন্য কোটা সংরক্ষিত থাকলেও সমতলের বৌদ্ধরা কোটা সুবিধা পায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ শিক্ষার্থীরা ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত পিছুটানের কারণে মেধাবী বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া রোধ করতে কোটার সমর্থন করে। ঢাকায় বৌদ্ধদের আরেকটি বিব্রতকর অনুভূতি হলো, বাইরে চলাচলের সময় সাধারণ মানুষ তাদেরকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখে নানান প্রশ্ন করে। মারা গেলে আশুলিয়ার বোধিজ্ঞান ব্যতিত মৃতদেহ সৎকারের জন্য ব্যবস্থা সীমিত। তখন গ্রামে নিয়ে যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়না। জনবহুল ঢাকা শহরে বৌদ্ধরা সংখ্যায় কম হওয়ায় অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বিহার ও উপাসনালয়ে অনিরাপত্তার শঙ্কা, ধর্মান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঢাকা শহরে থাকছেন বৌদ্ধরা। বিহারগুলোতে ধর্মীয় কীর্তন ও সংগীত চর্চা হলেও শহরের সংস্কৃতির প্রভাবে এটা ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যাপক নয়। ঢাকা শহরের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে বাঙালি বৌদ্ধদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। নৃগোষ্ঠীদের সাথে বাঙালি বৌদ্ধদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ, প্রথা ও ঐতিহ্যের দিক থেকে একটু ভিন্ন হয়। তারা স্বজাতির মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এসব চ্যালেঞ্জ নিয়েই ঢাকায় বৌদ্ধদের বসবাস। সর্বোপরি বলা যায় সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা সেটা মেনেই সকল সম্প্রদায়ের লোক মর্যাদার সাথে ঢাকায় বসবাস করছে।

উপসংহার

বাংলাদেশে কখন থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হয়েছে এ নিয়ে অনেক মতবাদ থাকলেও বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোকে বলা যায়, তথাগত গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য স্বয়ং বাংলাদেশে এসেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনিতে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন এবং সমতটে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। শুধু তাই নয় এ উদ্দেশ্যে তিনি সমতটে (দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গ) সাত দিন এবং কর্ণসুবর্ণে (বর্তমান মুর্শিদাবাদে) সাত দিন মোট চৌদ্দ দিন ধর্মপ্রচার করেন। সম্রাট অশোকের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হয়েছিল যা প্রমাণ ঢাকার ধামরাই গ্রাম। এখানে সম্রাট অশোকের নির্মিত ভগ্নাংশ অদ্যাবধি বর্তমান। এ কথা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য যে, ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবিজরিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহে অশোক স্মারক চিহ্ন হিসেবে অশোকস্তম্ভ ও স্তূপ প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। ঢাকার অদূরে ধর্মরাজিক বা ধর্মরাজিয়া বা ধামরাই স্তম্ভ এসব স্মারক চিহ্নের অন্যতম। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যতীন্দ্র নাথ বসু তাঁর *'ঢাকার ইতিহাস'* নামক গ্রন্থে এর পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। একে বিশেষভাবে স্মরণীয় করার জন্য বর্তমান ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহারকে 'ধর্মরাজিক' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অশোকের পরবর্তী গুপ্তযুগ, পালযুগ, খড়গবংশ, চন্দ্রবংশ ও দেববংশযুগ ইত্যাদির স্তর পেরিয়ে নানা বিবর্তন ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশের পূর্ব সীমানায় তার অস্তিত্ব অক্ষুন্ন করে রেখেছে।

ঢাকা শহরে বৌদ্ধ সমাজে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মে সামাজিক পরিবর্তনও চোখে পড়ার মতো। বলতে গেলে সভ্যতার বিকাশে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আধুনিক যুগে ঢাকা শহরে বৌদ্ধসমাজ ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে মিল রেখেই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। বৌদ্ধদের সামাজিক দিক নির্দেশনাকারী বৌদ্ধ বিহার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঢাকা শহরে প্রায় ৮ টি স্থায়ী ও কয়েকটি অস্থায়ী বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। ঢাকা জেলায় রয়েছে ৭ টি বিহার। নিশ্চয়ই ঢাকা শহরের বৌদ্ধদের জন্য এটা আর্শীবাদ। বৌদ্ধ সমাজে শিক্ষার অগ্রগতির ফলে অর্থ উপাজর্নের চিত্র পাল্টে গেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে আসীন হয়ে বৌদ্ধ সমাজে মুখ উজ্জ্বল করে আছেন অনেকেই। এছাড়া উচ্চ শিক্ষা এবং নানা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

ঢাকা শহরের বৌদ্ধ তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধদের বিশ্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ও তাঁর শিষ্য শুদ্ধানন্দ মহাথেরো এবং প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরোর ভূমিকা অগ্রগণ্য। এদিকে ধর্মরাজিক মহাবিহার, শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহার ও জ্যোতিবিদ্যা নিকেতন বৌদ্ধ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশাল আশ্রয়স্থল। বিগত দিনে শত শত বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রী ঐ সমস্ত স্থান হতে শিক্ষা নিয়ে দেশ-বিদেশে অবস্থান করছেন। নিজের উন্নতি ও ধর্ম প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। এটা বৌদ্ধ সমাজের জন্য অত্যন্ত শুভমুহূর্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধরা সাধারণত শান্ত ও মৈত্রী পরায়ণ। তাঁরা বুদ্ধের দেশিত আদেশ পালনে সচেষ্ট থাকেন। অধিকন্তু তাঁদের অন্যতম গুণ হচ্ছে সব ধর্মের মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারেন। সুতারাং সকল পরিবেশে সবাই মানিয়ে চলতে পারার ক্ষমতা বৌদ্ধদের মাঝে দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হলো বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী এদেশের আদিবাসী এবং তাঁরা বুদ্ধের অহিংসা নীতির ধারক। ফলে ঢাকা শহরের বৌদ্ধ সমাজ যদি একত্রে মিলেমিশে থাকে তাহলে তাদের আরো উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণায় মূলত ঢাকা শহরের বসবাসরত সংখ্যালঘু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে গুরুত্বারোপ করা হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতির ক্ষেত্রে কে.আই.আই এর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরদিকে পরিমাণগত পদ্ধতিতে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকায় বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্য হতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, উত্তরদাতাগণ তাদের বসবাসরত এলাকায় গড়ে দশ বছর যাবত বসবাস করে আসছেন। গবেষণালব্ধ তথ্য হতে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে নিজস্ব সম্প্রদায়ের মানুষদের মাঝে বসবাসের প্রবণতা রয়েছে। শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অবস্থান সন্তোষজনক পাওয়া যায়। গুণগত গবেষণায় পাওয়া যায় পাহাড়ে ও অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় শহরে বসবাসকারীগণ অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। এসকল তথ্যের পাশাপাশি পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা এখানে চাকুরিজীবী। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সাথে ঢাকায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এবং বৌদ্ধরা নানা সামাজিক জাতীয়, সচেতনতা মূলক নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেন এবং তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এ সকল অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সর্বসাধরনের জন্য নানা সামাজিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখে।

অনুসন্ধানে দেখা যায় যে ঢাকা শহরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেয় তাদের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলক উন্নত। এতদসত্ত্বেয়ও, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ ধর্মীয় কারণে নানাবিধ সামাজিক বৈরিতার শিকার হন যা তারা সহজে বলতে চাননা। যদিও শহরে বসবাসকারী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্মীয় আচার পালনে সরাসরি বাধার সম্মুখীন হননা তবে তারা নানাবিধ আকস্মিক কটূকথার শিকার হন। তাই তাঁরা তাঁদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য এবং নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচারাদি পালনের জন্য নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছাকাছি বসবাস করে থাকেন। গবেষণায় দেখা যায় যে উত্তরদাতাগণ ধর্মীয় কারণে তাদের পেশা, শিক্ষা, ব্যবসা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কোনরূপ বৈষম্যের স্বীকার হননি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলতে চাই, বাংলাদেশে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঢাকা শহরের ইতিহাস, ঢাকা শহরে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর আবর্তন-বিবর্তন, তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারতা এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য পাঁচটি অধ্যায়ে খুব সহজ-সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করে গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়েছে। আশাকরি অভিসন্দর্ভটি দ্বারা গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পাঠক সমাজ উপকৃত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বই

অনুপম বড়ুয়া সম্পা., পবিত্র ত্রিপিটক, ১ম সংস্করণ (চট্টগ্রাম: ২০২১, বোধিদর্পণ প্রকাশনী)

অশোক বিশ্বাস, *বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: ২০০৫, বাংলা একাডেমি)

অম্বিকাচরণ ঘোষ ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ (২০১৮: ঢাকা, বইপত্র প্রকাশনী)

অমরনাথ ঘোষ ও ঋতেন্দ্রকুমার রায়, *শিক্ষাবিজ্ঞান*, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা: ১৯৮৭, ব্যানার্জি পাবলিকেশন)

আবদুল করিম, অনুবাদক মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, *মোগল রাজধানী ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি)

আমাতুল খালেক বেগম, *আমার দেখা ঢাকা শহর*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১১, জোৎস্না পাবলিশার্স)

আহমেদ মীর্জা খবীর, *শতবর্ষের ঢাকা*, প্রথম সংকলন (ঢাকা: ১৯৯৫, কমন পাবলিকেসন্স)

আবুল এহসান, *শিক্ষাক্রম উন্নয়ন নীতি ও পদ্ধতি* (ঢাকা: ২০১৭, ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি)

আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন)

আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম, শেখবাজ রিয়াদ, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, ৪র্থ সংস্করণ (ঢাকা: ২০১৪, র‍্যামন পাবলিশার্স)

ইফতিখার-উল-আউয়াল সম্পাদিত, *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৩, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর)

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (দ্বিতীয় খন্ড)*, ষষ্ঠ মুদ্রণ (কলিকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী)

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (পঞ্চম খন্ড*, পঞ্চম মুদ্রণ (কলকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী)

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (প্রথম খন্ড)*, ষষ্ঠ মুদ্রণ (কলকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী)

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক (তৃতীয় খন্ড)*, চতুর্থ মুদ্রণ (কলকাতা: আষাঢ় ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী)

এম. এ ওহাব মিয়া, *শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৪, বাংলা একাডেমি)

এস.এম রফিকুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, *সেন যুগ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০১, বাংলা একাডেমি)

কাবেদুল ইসলাম, *প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠী*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৪, উত্তরণ)

কে. মউদুধ ইলাহী ও মো: কামরুজ্জামান, *জনসংখ্যা শব্দকোষ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী)

Dhaka University Institutional Repository

কাদের মাহমুদ, *বৌদ্ধত্ব পরিচয়* (ঢাকা: ২০১৭, নভেল পাবলিশিং হাউস)

খুরশীদ আলম, *সমাজ ও সম্প্রদায় পরিচিতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ (ঢাকা: ২০০৩, মিনার্ভা পাবলিকেশন্স)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, লেজিসটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি)

জগন্নাথ বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমিকা* (খুলনা: ২০১৭, গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট)

জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি)

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বিদর্শন ধ্যান*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৩, অন্যধারা)

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *ধ্যান: সুখী জীবনের চাবিকাঠি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৪, বাংলা একাডেমি)

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরঃ জীবন ও কর্ম*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৬, ময়নামতি প্রকাশনা)

জয়নাল হোসেন, *মানবপুত্র গৌতম ধর্ম ও জীবনাচার* (ঢাকা: ২০১৩, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন)

তোফায়েল, *বরেণ্য বাঙ্গালী*, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা: ১৯৮৯, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)

দীপক বড়ুয়া (সৃজন), *হাজার বছরের বাঙালী বৌদ্ধ*, ১ম খণ্ড (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন)

দিলীপ কুমার বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, অনুপম বড়ুয়া (সম্পাদিত), *সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের-এর স্মৃতিকথা সংকলন*, প্রথম প্রকাশ *(ব্যক্ত হোক জীবনের জয়-গ্রন্থের আলোকে)* (ঢাকা: ২০১৮)

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম: ২০১৭)

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম: ২০০৭, বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি)

নতুন চন্দ্র বড়ুয়া, *চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস* (চট্টগ্রাম: ১৯৮৬)

নাজির হোসেন, *কিংবদন্তী ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ (ঢাকা: ১৯৭৬, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)

নীরু বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বাঙালি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি: কীর্তন* (২০১৬: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দভ)

নীরু কুমার চাকমা, *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন*, প্রথম অবসর প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৭, অবস্র প্রকাশনা সংস্থা)

Dhaka University Institutional Repository

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, *বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস* (চট্টগাম: ২০০৮)

প্রিয়ানন্দ মহাথের ও এস. ধর্মপাল মহাথের, *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ১৯৮০, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা, নবপণ্ডিত বিহার)

প্রণব কুমার বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি)

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, *বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস* (২০০৮: চট্টগ্রাম)

প্রবীর মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা (প্রথম ভাগ*, প্রথম প্রকাশ (কলিকাতা: ১৪০৩, দীপায়ন)

পঞ্চানন মণ্ডল, *চিঠিপত্র সমাজচিত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রথম প্রকাশ (কলিকাত: ১৯৫৩)

প্রণব কুমার বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্য ও সমাজ জীবন*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ২০০৬)

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০২০, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন)

বোধিমিত্র বড়ুয়া, *বড়ুয়া বৌদ্ধদের আদিকথা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট*, প্রথম প্রকাশ (কক্সবাজার: ২০১০)

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাঙালি বৌদ্ধ লোকসংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংস্থা)

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০২০, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন)

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভৌগোলিক ও জনমিতিক অবস্থা* (ঢাকা: ২০১৬, আবিষ্কার প্রকাশনী)

'বাংলাদেশ আদমশুমারি রিপোর্ট', বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০১

ভৈরবনাথ বন্দোপাধ্যায়, *মহাভারত আদিপর্ব* (কলিকাতা: ১৯১১, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী)

মোঃ খালেকুজ্জামান, *বিজন জনপদ থেকে রাজধানী ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০২, দিব্য প্রকাশ)

মোহাম্মদ মুমিনুল হক, *বাংরার ইতিবৃত্ত*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৬, গতিধারা প্রকাশনী)

মাহবুবুর রহমান, *বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৩, মেরিট ফেয়ার)

মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *আবাহমান বাংলা* (ঢাকা: ফাল্গুন ১৩৯৯)

মোঃ মোশারফ হোসেন, ড. নীরু শামসুন্নাহার, *সেই ঢাকা এই ঢাকা শহর ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৯, র‍্যমন পাবলিশার্স)

মো. আজহারুল ইসলাম, *বিক্রমপুর: ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব (৩য় খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৫, সুলেখা প্রকাশনী)

মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা: ১৯৮৮, বাংলা একাডেমি)

Dhaka University Institutional Repository

মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, অখণ্ড (ঢাকা: ২০১৩, অন্যান্য)

মনোয়ার আহমেদ, *ঢাকার পুরনো কথা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৩, মাওলা ব্রাদার্স)

মো. নুরুল ইসলাম, *জনবিজ্ঞান ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা*, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা: ২০০৬, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স)

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার, *জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা উন্নয়ন* (ঢাকা: ২০০৩, ফেমাস পাবলিকেশন্স)

মোঃ শের আলী, *"শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণমূলক একটি সমীক্ষা ফেনী জেলা শহর প্রেক্ষিত"* (ঢাকা: ২০১৩, অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০২, আফসার ব্রাদার্স)

মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০১, অন্যান্য প্রকাশনী)

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, *সুশিক্ষক*, প্রম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১১, চারুলিপি প্রকাশ)

মো. আখতার হোসেন, *বৌদ্ধ দর্শনে আধ্যাত্মিক ভাবনা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৬, সমাচার)

যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খন্ড, প্রথম দে'জ সংস্করণ (কলকাতা: ১৯১২, দে'জ পাবলিশিং)

রণধীর বড়ুয়া, *মহামানব বুদ্ধ* (চট্টগ্রাম: ১৯৮৫)

রক্তিম বড়ুয়া, *বড়ুয়া জাতির আত্মপরিচয়* (চট্টগ্রাম: ২০১৯)

সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশ পালি ও বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চা একটি সমীক্ষা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১৬, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন)

সিরাজুল ইসলাম সম্পা., *বাংলাপিডিয়া*, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা: ২০০৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি)

সুনীথানন্দ, বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমি)

শরীফ উদ্দিন (প্রধান সম্পাদক), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল, নগরায়ন ও নগর উন্নয়ন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০১২ এশিয়াটিক সোসাইটি)

সুকোমল চৌধুরী, সম্পাদিত, *মহামানব গৌতম বুদ্ধ* (কোলকাতা: ২০০৮, মহাবোধি বুক এজেন্সি)

সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, *বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ২০০৮, বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভা)

শরীফা খাতুন, *দর্শন ও শিক্ষা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি)

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিক সং, একাদশ খণ্ড

শিমুল বড়ুয়া, *বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম: ২০১২, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী)

সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ: ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর*, দ্বিতীয় সংস্করণ (ঢাকা: ২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন)

Dhaka University Institutional Repository

সুদর্শন বড়ুয়া, *সদ্ধর্ম শিক্ষানীতি*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম: ২০০১)

সুকোমল চৌধুরী, *বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলিকাতা: বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৮০ সারস্বত লাইব্রেরি)

সুকোমল বড়ুয়া, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পূর্বাপর, প্রথম প্রকাশ* (ঢাকা: ২০১৭, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন),

শিমুল বড়ুয়া, *বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রাম: ২০১২, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী)

সৈয়দা নওয়ারা জাহান, ঢাকা শহরের জনসংখ্যার ধরণ : একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৯৭, এম.এস থিসিস, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ)

হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা পঞ্চাশ বছর আগে*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: ১৯৯৫, বাংলা একাডেমি)

বাংলা অভিধান

মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: ২০১১, বাংলা একাডেমি)

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, *পালি-বাংলা অভিধান দ্বিতীয় খণ্ড, (প থেকে হ পর্যন্ত)* (ঢাকা: ২০০৮, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট)

পত্রিকা ও ম্যাগাজিন

কৃষ্টি

কলা অনুষদ পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, খন্ড ৪, সংখ্যা ৬, জুলাই ২০১০-জুন-২০১১

প্রথম আলো

চারুলতা

দীপঙ্কর

বৈশালী

সৌম্য

সৌগত

সম্বোধি

Dhaka University Institutional Repository

English Books

Bangladesh Bureau of Statistics, 1991

Dilip Kumar Barua, Shantu Barua, Yusho Wakahara, Kensuke Okaoto, *Directory of Buddhist Monasteries In Bangladesh* (A Provisional Edition) (Japan, 2014, Research Centre for Buddhist Cultures in Asia)

Davies, Ivor K. (1976) *Objectives in Curriculum Design*, London: McGraw Hill Book Co. Dr. Taraknath Pan (Reviewer)

History of Education in India, Directorate of Distance Education, 2016, Tripura University, pg.10-21

KAMAL SIDDIQUI, JAMSHED AHMED, KANIZ SIDDIQUE, SAYEEDUL HUQ, ABUL HOSSAIN, SHAH NAZIMUD-DOULA AND NAHID REZAWANA, *Social Formation in Dhaka*, 1985-2005, *A Longitudinal Study of Society in a Third World Megacity* (Routledge Taylor & francis Group LONDON AND NEW YORK: 2010)

R.C.Mojumder, *The History of Bengal, Vol.1*

English Dictionary

Robert L.Barker, *The Social Work Dictionary* (1995: NASW Press, Washington DC)

Internet

http://www.dhaka.gov.bd

http://www.thebuddhisttimes.com/

https://archive1.ittefaq.com.bd

http://index.org.bd/index/printarticle/evolution-of-buddhism-in-ancient-bengal:-a-historical-review

https://www.citypopulation.de

http://bn.banglapedia.org

https://www.kalerkantho.com

https://bd.usembassy.gov>sites

https://web.archive.org/web/20110706132048/http://www.banbeis.gov.bd/bd_pro.htm

Bangladesh,

http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhistworld/bangladesh-txt.htm.

https://banglatribune.com

https://www.dailynayadiganta.com

https://www.ekushey-tv.com

https://banglanewsmag.blogpost.com

Dhaka University Institutional Repository

https://www.bhorerkagoj.com

https://www.jumjournal.com

https://www.tathagataonline.com

https://prothomalo.com

https://bibartanonline.com

https://nivvanatv.net

https://www.banglatribune.com

https://www.dailynayadiganta.com

https://www.jugantor.com

'Atish Dipankar অতীশ দীপঙ্কর' ফেসবুক পেজ

https://samakal.com

https://www.banglanews24.com

https://www.risingbd.com

https//:m.dainiksiksha.com

https//:www.dascoaching.in

https//:millioncontent.com

https//:Sojasapta.com

ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, উপ বিহারাধ্যক্ষ, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, বাড্ডা ঢাকা এর ফেসবুক

Dhaka University Jum Literature and Culture Society এর ফেসবুক পেজ

মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো Mahasanghanayaka Vishuddananda Mahathera ফেসবুক পেজ

সুজাতা বন্দনা পরিষদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর ফেসবুক পেজ

http://www.amader-kotha.com

সাক্ষাৎকারসমূহঃ

IMS-1-5

IFT-1

IME-1

IFS-1-3

IMB-1

IFHW-1-3

IMM-1-3

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

প্রশ্নমালার নাম্বারঃ

বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা শহর

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। 'বৌদ্ধদের আর্থ সামাজিক অবস্থাঃ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা শহর' গবেষণা কার্যক্রমটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ কর্তৃক এম.ফিল গবেষণার জন্য পরিচালনা করা হচ্ছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণে এই গবেষণা কার্যক্রমটি সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

	প্রশ্ন		কোড
১.	নামঃ		
২.	মোবাইল নাম্বারঃ		
৩.	বয়সঃ		
৪.	বৈবাহিক অবস্থাঃ	১. বিবাহিত ২. অবিবাহিত ৩.তালাকপ্রাপ্ত	
৫.	লিঙ্গ	১. পুরুষ ২.মহিলা	
৬.	শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ	১. নিরক্ষর ২. প্রাথমিক ৩. মাধ্যমিক ৪. উচ্চ মাধ্যমিক ৫. ডিপ্লোমা ৬. স্নাতক ৭. স্নাতকোত্তর ৮. এম.ফিল/পি.এইচডি ৯. অন্যান্য.....	
৭.	পেশা	১. কৃষক ২.গৃহিণী ৩.দিন মজুর ৪.ব্যবসায়ী ৫.সরকারী চাকুরিজীবী ৬.বেসরকারী চাকুরিজীবী ৭.বেকার ৮. অন্যান্য	
৮.	মাসিক আয়ঃ		

Dhaka University Institutional Repository

৯.	বর্তমান ঠিকানাঃ		
১০.	স্থায়ী ঠিকানাঃ		
১১.	আপনার আবাসস্থলের ধরনঃ	১. ফ্ল্যাট ২. পাকা বাড়ি ৩. আধাপাকা বাড়ি ৪. কাচা বাড়ি ৫. বস্তি ৬. নির্দিষ্ট বসতভিটা নেই ৭. অন্যান্য	
১২.	আপনি / আপনার পরিবারের বসবাসকৃত বাড়িটির সাথে আপনাদের সংশ্লীষ্টতাঃ	১. নিজস্ব বাড়ি ২. ভাড়া বাড়ি ৩. শেয়ারে মালিকানা ৪. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ৫. অন্যান্য	
		সেকশন- বিঃ পারিবারিক তথ্য	
১৩.	বর্তমান ঠিকানায় আপনি/আপনার পরিবার কত বছর যাবত আছেন?		
১৪.	আপনার পরিবারের ধরণ কি?	১. একক পরিবার ২. যৌথ পরিবার ৩. অণু পরিবার	
১৫.	আপনার পারিবারীক উপাধি কি ছিলো?	১. বড়ুয়া ২. মুৎসুদ্দি ৩. তালুকদার ৪. চৌধুরী ৫. সিংহ ৬.অন্যান্য	
১৬.	আপনারা আদিবাসীদের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত?	১. চাকমা ২. মারমা ৩. ওঁরাও ৪. চাক ৫. ম্রো ৬.তঞ্চগ্যা ৭. রাখাইন ৮. অন্যান্য	
১৭.	আপনার জন্মস্থান এলাকার ধরন কেমন ছিলো?	১. শহর ২. গ্রাম	

১৮.	আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন?		

Dhaka University Institutional Repository

১৯.	আপনার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে নিম্নের তথ্যগুলো পূরণ করুনঃ	১.উত্তরদাতার সাথে সর্ম্পক	২. বয়স	৩. বৈবাহিক অবস্থান	৪. শিক্ষা	৫. পেশা	৬. আয়
		১.					
		২.					
		৩.					
		৪.					
		৫.					
		৬.					
		৭.					
		৮.					
		৯.					
		১০.					
	১. স্বামী ২. স্ত্রী ৩.বাবা/শ্বশুর ৪. মা/শ্বাশুড়ি ৫. ভাই/ দেবর ৬. বোন/ননদ ৭. চাচা/মামা/ফুফা ৮. দাদা/নানা ৯.দাদি/নানি অন্যান্য	১. বিবাহিত ২.অবিবাহিত ৩. তালাকপ্রাপ্ত ৪. আলাদা		১. নিরক্ষর ২. প্রাথমিক ৩. মাধ্যমিক ৪. উচ্চ মাধ্যমিক ৫. ডিপ্লোমা ৬. স্নাতক ৭. স্নাতকোত্তর ৮. এম.ফিল/পিএইচ.ডি ৯.অন্যান্য		১. কৃষক ২. গৃহিণী ৩. দিন মজুর ৪. ব্যবসায়ী ৫. সরকারী চাকুরিজীবী ৬. বেসরকারী চাকুরিজীবী ৭. বেকার ৮. অন্যান্য
২০.	আপনার পরিবারের সদস্যদের আয় ব্যতীত অন্যান্য উৎস হতে আয় সম্পর্কে নিচের বক্সটি পূরণ করুনঃ	১.উৎস		২. আয়ের পরিমান			
		১. সঞ্চয়/ পেনশন					
		২.সম্পত্তি ভাড়া (বাসা, দোকান, গাড়ি					
		৩. ব্যবসা					
		৪. কৃষি/খামার					
২১.	আপনার পরিবারের সর্বমোট আয়ের পরিমাণ কত?						
২২.	আপনার পরিবারের মাসিক ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যগুলো দিন:	১. ব্যয়ের খাত		২. ব্যয়ের পরিমাণ			
		১. শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে					
		২. প্রাতিষ্ঠানিক টিউশন ফি					
		৩. ব্যক্তিগত টিউশন ফি					
		৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত					
		৫. চিকিৎসা ব্যয়					
		৬.চিত্ত বিনোদন					
		৭.খাদ্য					
		৮.যাতায়াত					

Dhaka University Institutional Repository

		৯.অন্যান্য		
২৩.	আপনার পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যগুলো দিন:	১.ব্যয়ের খাত	২.ব্যয়ের পরিমাণ	
		১. গৃহ নির্মাণ, আসবাব পত্র		
		২. শিক্ষা ব্যয় (বাৎসরিক) (যা পূর্বে উল্লিখিত হয়নি)		
		৩.বস্ত্র		
		৪. ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক আচারনুষ্ঠান		
		৫. সামাজিক অনুষ্ঠান		
		৬. ভ্রমণ		
		৭. ঋণ সংক্রান্ত ব্যয়/কিস্তি		
		৮. অন্যান্য		
২৪.	পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আপনাকে কী কোনো ধরণের ঋণ করতে হয়?	১.হ্যাঁ ২.না	২.ঋণের পরিমাণঃ	
২৫.	যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে উল্লেখ করুন সাধারণত আপনি কোথা থেকে এই ঋণ সুবিদা পেয়ে থাকেন?			
২৬.	আপনি কি ঢাকাতে কোন সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত আছেন?	১.হ্যাঁ ২.না		
২৭.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে উল্লেখ করুন সেটি কি ধরণের সমিতি? (সমিতির নাম লিখুন)	১.সঞ্চয় সমিতি ২. পেশাদার সমিতি ৩. স্থানীয় সমবায় সমিতি ৪.অন্যান্য		

২৮.	প্রাথমিকভাবে আপনার উক্ত সমিতিতে যোগ দানের কারণ কি কি ছিলো?			
২৯.	আপনার পরিবারের সদস্যরা সাধারণত কি ধরনের পরিবহনে যাতায়াত করেন	১.বাস ২.রিক্সা ৩. মোটরসাইকেল ৪.সাইকেল ৫.সিএনজি/অটো ৬.প্রাইভেট গাড়ি অন্যান্য		
৩০.		সম্পত্তির ধরণ		

Dhaka University Institutional Repository

	আপনাদের পরিবারের মালিকানাধীন সম্পত্তির বিষয়ক নিচের তথ্যগুলো দিন?	১.বাড়ি/ফ্ল্যাট		
		২.জমি/সম্পত্তি		
		৩.গাড়ি		
		৪.ব্যবসায়ীক সম্পত্তি		
		৫.মূল্যবান সম্পত্তি (স্বর্ণলঙ্কার)		
		অন্যান্য		
৩১.	আপনার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোন সামাজিক কার্যক্রম অধিক প্রচলিত?	সামাজিক কার্যক্রমের ধরণ	নাম	
		১.ক্রীড়া		
		২.সাংস্কৃতিক		
		৩.আচারানুষ্ঠান		
		৪.অন্যান্য		
৩২.	আপনার পরিবারের সদস্যরা অবসর কোন কাজটি করতে অধিক পছন্দ করেন?	১. টেলিভিশন ২. বইপড়া ৩. খেলাধুলা করা ৪. গল্প করা ৫. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার ৬. ঘুমানো ৭. ভ্রমণ করা ৮. পরিবারের/নিকটাত্মীয়ের সাথে সময় কাটানো ৯. ধর্মীয় আচার ১০. সামাজিক আচারনুষ্ঠান করা ১১. অন্যান্য		

Dhaka University Institutional Repository

৩৩.	ঢাকায় বসবাসকালীন সময়ে অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?	১.বন্ধুত্বপূর্ণ ২.বিদ্বেষপূর্ণ ৩.নিষ্ক্রিয় অন্যান্য		
৩৪.	ধর্মীয় রীতি, নীতি পালনের জন্য আপনি বা আপনার পরিবার সাধারণত কোন বিহারে যান?			
৩৫.	ধর্মীয় কারণের আপনি বা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য বিরূপ পরিস্থিতির/সমস্যার স্বীকার হয়েছিলেন কখনো?	১. হ্যাঁ ২. না		
৩৬.	যদি হ্যাঁ হয়, তবে কেমন বিরূপ পরিস্থিতির/সমস্যার স্বীকার হয়েছিলেন?			
৩৭.	ধর্মীয় উস্কানির কারণে আপনাদের নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা হয়েছিলো কি?	১. হ্যাঁ ২. না		
৩৮.	যদি হয়ে থাকে, তবে উল্লেখ করুন আপনার সেটি কিভাবে কাটিয়ে উঠেছিলেন?			
৩৯.	উপরোক্ত আলোচনা/এবং সমস্যার প্রেক্ষিতে আপনার মতে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান গুলো আপনাদের উন্নয়নে আরো কী কী ভূমিকা রাখতে পারে?			
১.	সরকার			
২.	আইনশৃঙ্খলা বাহিনী			
৩.	বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও)			
৪.	অন্যান্য			

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:

তারিখ:

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।